ভোলানাথের ভুল

শ্রীতারকনাথ সাধু

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
ফাল্গুন—১৩২৯
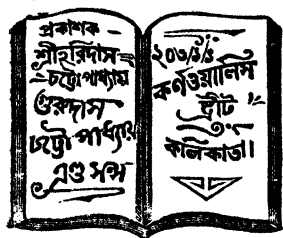
মূল্য ২৲ দুই টাকা

উৎসর্গ

যিনি নিঃস্বার্থভাবে দেশের ও দশের কার্য্যে

জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন

যিনি নিজ জীবনের অমূল্য সময়

জাতীয় অভ্যুদয়ের জন্য

সমর্পণ করিয়াছেন

ধর্ম্মে যাঁহার অশেষ অনুরাগ

অধর্ম্মে যাঁহার বিশেষ বিরাগ

সেই জনশ্রেষ্ঠ বিচারকপ্রবর

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

এই পুস্তকখানি অর্পণ

করিলাম।

শ্রীতারকনাথ সাধু

ভূমিকা

এই পুস্তক কেন লিখিলাম ?

ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান দেশ। ইহার আর একটি নাম হিন্দুস্থান। সময় ছিল, যখন এই হিন্দুস্থানে প্রধান রাজারা হিন্দু ছিলেন। তখন হিন্দুধর্ম্মের প্রচার যথেষ্ট ছিল। হিন্দুবালকেরা বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা করিত। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা করিত; ধর্ম্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষা দুইটির স্বতন্ত্রতা ছিল না। হিন্দুরাজাদের রাজত্বকালে আমাদের ছাত্রজীবন এমন ভাবে গঠিত হইত যে, প্রত্যহই ধর্ম্মশিক্ষা জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য ছিল। ধর্ম্মশিক্ষা হইতে স্বতন্ত্র কোন শিক্ষাই ছিল না। যখন ছাত্রজীবন শেষ করিয়া হিন্দুসন্তান সংসারক্ষেত্রে অবতরণ করিত, তখন তাহার ধর্ম্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষা তাহাকে সংসারক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করিত। ধর্ম্মশিক্ষা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সরল পথেই লইয়া যাইত। সে ধর্ম্ম ছাড়িয়া কোন কর্ম্ম করিতে পারিত না; কর্ম্মজীবনে ধর্ম্মকর্ম্মই করিত। তখন লোকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিত; তখন জীবনের প্রধান পণ ধর্ম্মরক্ষা, জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্মজীবন-রক্ষা। ধর্ম্ম প্রথমে, ধর্ম্ম পরে, ধর্ম্ম সর্ব্বসময়ে। ধর্ম্ম ইহজীবনে কর্ম্মের সাহায্য করিত, পুণ্যের নিদান হইয়া জীবকে সুখী করিত, আর পরজীবনে সুখের আকর হইত। ধর্ম্ম ইহজীবন ও পরজীবন দুই জীবনে সুখশান্তির মূলভিত্তি। ধর্ম্মপালনেই জীবের সুখ ও মুক্তি।

ক্রমে সময়ের পরিবর্ত্তন হইল। হিন্দুরাজগণ চলিয়া গেলেন, তাঁহাদের স্থানে বিধর্ম্মী রাজা ভারতে রাজত্ব আরম্ভ করিলেন। হিন্দুগণ যূথভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। রাজা বিধর্ম্মী বলিয়া হিন্দুধর্ম্ম আচরণে বিশেষ সাংসারিক উন্নতির সুবিধা হইত না। ধর্ম্মশিক্ষা শিথিল হইয়া পড়িল, ধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগের বিশেষ সাংসারিক উন্নতি হইল না, লোকে ধর্ম্ম ছাড়িয়া অর্থের পূজা করিল; উপযুক্ত ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে সমাজে অর্থকে ধর্ম্মের উপর স্থান দিল। ইহার বিষময় ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। দেশে মুসলমান রাজা ছিল, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে ও হিন্দুকে সহ্য করিতে পারিতেন না। ফলে ধর্ম্মযাজন ও ধর্ম্মজীবন-পালন সাংসারিক উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাড়াইল। মুসলমানগণের মধ্যে যাঁহারা ভাল ছিলেন, তাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাঁহাদের হস্তে হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বনকারীদিগকে কোনরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহারা "তুমিও বাঁচ আর আমিও বাঁচি" "বাঁচ ও বাঁচিতে দাও" এই মন্ত্রের সাধনা করিয়াছিলেন। ফলে মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম্মজীবন পালন করিয়া সাংসারিক উন্নতির সুবিধা একেবারেই ছিল না। শেষে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে ধর্ম্ম ও অর্থ দুইটির অর্জ্জন একসঙ্গে হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল।

ধর্ম্ম ও মোক্ষ চাও ত, অর্থ ও কামের আশা করিও না; আর অর্থ ও কাম চাও ত, ধর্ম্মমোক্ষ চাহিও না। সেই সময়ে ধর্ম্মযাজকেরা রাজার সাহায্য ত পাইলেনই না; পরন্তু অনেক সময়ে তাহাদের রোষাগ্নিতে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন। ফলে হিন্দুসাধারণের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিল। কিন্তু তখনও হিন্দুর দৈনিক কার্য্যকলাপে ধর্ম্মশিক্ষার বীজ উপ্ত ছিল, হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে ধর্ম্মের সংস্রব ছিল। ধর্ম্মকার্য্য

করিতে হইলেই ধর্ম্মশিক্ষার সহায়তা করিতে হইত। বহুপূর্ব্বে যাগ-যজ্ঞ ছিল, তাহাতে ধর্ম্মশিক্ষা হইত। ঋষিদের আশ্রমে, মুনিদের তপোবনে, ধর্ম্মশিক্ষা হইত; জনসাধারণের ধর্ম্মশিক্ষার সাহায্য হইত। বহু পরে, মুসলমানদের রাজত্বকালে কথকতা, মহাভারত ও রামায়ণ-গান, লোক সাধারণের ধর্ম্মশিক্ষার প্রধান স্তম্ভস্বরূপ হইল। রামায়ণগান, মহাভারতগান, কথকতা হিসাবে রামায়ণের চরিত্রব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, মহাভারতের চরিত্রব্যাখ্যা, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, শ্রীকৃষ্ণজীবন-তত্ত্ব, লোক সাধারণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিত। জনসাধারণের উন্নতির নিমিত্ত এই সব শিক্ষাপ্রণালীতে হিন্দুসন্তান ভাল হইতে মন্দকে পৃথক্ করিতে শিখিতেন, ধর্ম্ম হইতে অধর্ম্মকে বিভিন্ন করিতে শিখিতেন, আর শিখিতেন—ধর্ম্মে জয়, পাপে ক্ষয়; শিখিতেন—ধর্ম্মপথ কণ্টকময়; সে পথ অনুসরণে কষ্ট আছে, কিন্তু শেষে জয় অবশ্যম্ভাবী। পাপপথ আশুসুখপ্রদ, কিন্তু পরিণামে বিষময়। পাপপুণ্য-প্রত্যেকের স্ব স্ব প্রভাব, জলন্ত উদাহরণ-দ্বারা হিন্দুসন্তান-হৃদয়ঙ্গম করিতেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মময় জীবনে কর্ত্তব্যপালনের সুখ ও রাজা দুর্য্যোধনের পাপকর্ম্মের বিষম পরিণাম, রামের কর্ত্তব্যপরায়ণতা, কৈকেয়ীর ও মন্থরার অমানুষিকতা এই সমস্ত উজ্জ্বল উদাহরণ দ্বারা "ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয়" এই মহামন্ত্র শিক্ষা করিতেন।

তাঁহারা তখনও শিখিতেন, অর্থের প্রয়োজন, ধর্ম্মকার্য্য করিবার সাহায্যের জন্য। অর্থের নিজস্ব কোন সার্থকতা নাই। অর্থের দ্বারা ধর্ম্মকার্য্যের সুবিধা হয়, অর্থ দ্বারা পরদুঃখমোচন, ধর্ম্মকার্য্যযাজন, তীর্থ-পর্য্যটন, জনসাধারণের উপকার সাধন, অভুক্তকে অন্নদান, রোগার্ত্তকে পথ্য ও ঔষধ দান, বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান, ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্যদান এই সব সৎকার্য্য-সাধন হয়। এই কারণে অর্থের সার্থকতা; অর্থের নিজস্ব কোন

উপকারিতা নাই। ইহা অনেক সময় সৎকার্য্যের সহায় ও সোপান-স্বরূপ। সেই জন্য পূর্ব্বে লোকে অর্থের আরাধনা করিত। কারণ অর্থ উপার্জ্জন করিলে ধর্ম্ম উপার্জ্জনের সুবিধা হইবে; অর্থ ই যে ধর্ম্মজীবনের সোপান-স্বরূপ। অর্থকে অর্থের জন্য কেহ চাহিত না। অর্থ দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জনের সুবিধা হয়, সেইজন্য লোকে অর্থ উপার্জ্জন করিত, আর অর্থের উপাসনা করিত। ধর্ম্মার্জ্জনের সুবিধা ভিন্ন ইহার স্বতন্ত্র সার্থকতা কিছু ছিল না।

ক্রমে মুনিদের আশ্রম, ঋষিদের তপোবন, পণ্ডিতগণের চতুষ্পাঠী কমিয়া যাইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই স্থানের ধর্ম্ম-শিক্ষার লোপ হইতে লাগিল। মুনি, ঋষি, পণ্ডিতেরা রাজার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন; তাঁহাদের ধর্ম্মযাজন ও ধর্ম্মশিক্ষাকার্য্য ক্রমে স্থগিত হইতে লাগিল; ফলে দাঁড়াইল ধর্ম্মশিক্ষার অভাব। জনসাধারণের ধর্ম্মশিক্ষার সোপানগুলি সরিয়া যাইতে লাগিল। ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে, ধর্ম্মবন্ধন ও সমাজবন্ধন শিথিল, ধর্ম্মে জনসাধারণের অনাস্থা; আর অধার্ম্মিকের হস্তে পড়িয়া ধর্ম্মের বিশেষ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও প্রাণহীন ব্যবহার; শেষে ধর্ম্মের ভানকারীদের হস্তে ধর্ম্মশিক্ষার ভার পড়িয়া ধর্ম্মের অশেষ দুরবস্থা। যাহার জীবন অধর্ম্মে পূর্ণ, তাহারই হস্তে ধর্ম্মযাজন ও ধর্ম্মকার্য্যের ভার। অনেক স্থলে শিক্ষাহীন, দীক্ষাহীন, ধর্ম্মাভিমানী মূর্খেরা ধর্ম্মশিক্ষার গুরু হইলেন। ফল যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহাই হইল। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম হইতে লাগিল, তীর্থস্থানে অধর্ম্মস্রোত বহিতে লাগিল, ধর্ম্মের ভানে অধর্ম্ম আচরণ হইতে লাগিল। লোকে বংশাভিমানে ও জাত্যভিমানে গর্ব্বিত—শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, আছে কেবল পূর্ব্বপুরুষদের বংশাভিমান। চরিত্রহীন, ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, প্রাণহীন, ঘোর আত্মাভিমানী শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোকের হস্তে ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মযাজনের ভার পড়িল। যাঁহারা নিজে কখনও শিক্ষা

করেন নাই ও পান নাই, তাঁহারাই অপরকে শিক্ষা দিবার ভার লইলেন। ফল যাহা হয় তাহাই হইল; অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইলে যাহা হয় তাহাই হইল, পথপ্রদর্শক ও তাহার অনুগমনকারী উভয়েই গর্ত্তে পতিত হইল।

যখন হিন্দুসমাজের এইরূপ অবস্থা তখন ইংরাজবণিক ভারতের রাজত্ব-ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা অন্যধর্ম্মাবলম্বী। যে ধর্ম্মে তাঁহাদের আস্থা নাই, সে ধর্ম্মের উন্নতির জন্য তাঁহারা মাথা ঘামাইবেন কেন? প্রথমে তাঁহারা বিশেষভাবে রাজ্যস্থাপনেই ব্যস্ত। তখন ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম ছাড়া আরও অনেক ধর্ম্ম বিশেষভাবে ভিত্তি গাড়িয়া বসিয়াছে। কাজেই ধর্ম্ম-বিশেষের সাহায্য করিতে গেলে, পাছে প্রকারে অপর ধর্ম্মানুরাগীদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হয়; তুলাদণ্ড ধরিয়া রাজত্ব করিতে গেলে, রাজার সে কার্য্য করণীয় ও স্পৃহনীয় নয়। তাই তাঁহারা প্রথম হইতেই জাহির করিলেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহারা কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবেন না, কোন ধর্ম্মেরই বিশেষভাবে সাহায্য করিবেন না। প্রজাপুঞ্জ তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মের উন্নতির জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহা নিজে নিজেই করিবে। সমাজ ও ধর্ম্ম প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি, তাহারা যেরূপভাবে ইচ্ছা শাসন ও যাজন করিবে; রাজা তাহাতে কোনরূপ সাহায্য করিবেন না বা বাধাও দিবেন না। তাঁহারা সাধারণ প্রজাবৃন্দের জন্য রাজ্য পরিচালনের এক সাধারণ আইন করিয়া দিলেন। প্রজাগণ সেই আইন পালন করিলেই হইল। কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত তাঁহারা কোন সমাজের বা ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। পাছে এক ধর্ম্মের সাহায্য করিলে অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা রাজার পক্ষপাতিত্ব দোষ দেন, সেইজন্য ইংরাজরাজ ধর্ম্মশিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের হস্তেই রাখিয়া দিলেন। ইংরাজরাজ বিদ্যাশিক্ষার ভার লইলেন, কিন্তু

ধর্ম্মশিক্ষার নয়। ফলে বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা হইতে স্বতন্ত্র বিদ্যাশিক্ষা হইতে লাগিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষা, অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা। বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া গেল, ধর্ম্মশিক্ষার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক রহিল না। প্রত্যেক স্বতন্ত্র সমাজের হস্তে সরকার বাহাদুর ধর্ম্মশিক্ষা ও সমাজশিক্ষা ন্যস্ত করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। হিন্দু-সম্প্রদায়ের উপর হিন্দুধর্ম্মশিক্ষা ও হিন্দুর সমাজরক্ষার ভার ন্যস্ত হইল।

তখন পরিবর্ত্তনের কাল। সকলে অর্থকরী বিদ্যা লইয়াই ব্যস্ত। বিদ্যালয়ের ধর্ম্মহীন অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিলে, অর্থাগমের বিশেষ সুবিধা হয়; আর সেই সঙ্গে সাধারণ বিপ্লব সময়ে ধন্য ও মান্য হওয়া যায়। কাজেই এই অর্থকরী ধর্ম্মহীন বিদ্যাশিক্ষার চাকচিক্যে লোকে মোহিত হইয়া গেল—সখাত সলিলে ডুবিয়া মরিল। যে সমাজের উপর ধর্ম্মশিক্ষার ভার, সে সমাজ ধর্ম্মহীন বিদ্যার চাকচিক্যে আর আশু সুবিধাহেতু ধর্ম্মশিক্ষা উপেক্ষা করিল। মনে করিল তাহাতে কিছু ক্ষতি হইবে না, কিন্তু ফল বিশেষ বিষময় হইল। লোকে ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা একেবারে ভুলিয়া গেল। সমাজ তাহার কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা করিল। ধর্ম্মশিক্ষার ভার এ সময়ে যাহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাহাদের নিজেরই ধর্ম্মশিক্ষা হয় নাই, ত, অপরকে শিখাইবে কি? ফলে উকিলের দালাল যিনি আদালতে দালালি বা মুহুরিগিরি করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার হাতে অনেক শিক্ষিত লোকের গুরুমন্ত্র দিবার ভার পড়িল। গুরুর নিজের শিক্ষা নাই, সে অপরকে কি শিক্ষা দিবে? তাহার নিজের সৎশিক্ষার ও ধর্ম্মশিক্ষার অভাব, সে অপরকে কি ধর্ম্মশিক্ষা দিবে? পুলিশের দারোগা গুরুবংশে জন্মহেতু, ধর্ম্মশিক্ষা, যাজকতা শিক্ষা, শাস্ত্রশিক্ষা না থাকিলেও, মন্ত্রগুরু হইলেন। ফলে ধর্ম্মযাজকদের ও দীক্ষাগুরুর প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অশ্রদ্ধা হইতে লাগিল। অনেক

উপগুরুরও উদ্ভব হইল। তাহারা আবার "দাদার বাবা"—অর্থ সংগ্রহ বিষয়ে খুব পারদর্শী, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মযাজনে রত।

ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে, শাস্ত্রশিক্ষার অসুবিধাহেতু, অধিকাংশ লোকেরই ধর্ম্মহীন শিক্ষা হইতে লাগিল। তাহাদের প্রধান শিক্ষা, কোনরূপে, কোন প্রকারে এক জায়গায় অর্থ সংগ্রহ করা। অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য, ধার্ম্মিকগণ যে কারণে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তাহা নয়, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা ধর্ম্মের জন্য অর্থ চাহে না, অর্থের জন্যই অর্থ চাহে; ধর্ম্ম অর্জ্জনের সোপানস্বরূপ অর্থ উপার্জ্জন করে না, অর্থের জন্যই অর্থ আহরণ করে। অর্থ নিজের সুখ সোয়াস্তির জন্য—মনুষ্য-সমাজের হিতের জন্য নয়, ধর্ম্ম অর্জ্জনের জন্য নয়, নর-নারায়ণের সেবার জন্য নয়, আর্ত্তের ঔষধের জন্য নয়, ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য নয়। কাজেই তাহারা ভাবে—অর্থসঞ্চয় যখন ধর্ম্মসঞ্চয়ের জন্য নয়, তখন যেরূপ উপায়েই হউক অর্থ সঞ্চয় করা যাইতে পারে। অর্থ হইলে নিজের আরাম হয়, পরের উপর প্রভুত্ব চলে, নিজে যাহা ইচ্ছা করিতে পারা যায়, আশু সুবিধা হয়। কাজেই যেমন ক'রে হউক অর্থ উপার্জ্জন করা চাই; ধর্ম্মপথে হয় ভালই। মোট কথা, অর্থ চাই, অর্থ চাই, অর্থ চাই। ধর্ম্মশিক্ষা না পাওয়ায় লোকে অধর্ম্মপথে চলিয়াও অর্থ উপার্জ্জনে ব্যস্ত, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই অর্থ সংগ্রহেই উন্মত্ত। ফল বিষময়। অর্থ অনুসরণে দুঃখ, অর্থ আহরণে দুঃখ, অর্থ সংরক্ষণে দুঃখ, যদি সে অর্থ দ্বারা ধর্ম্মসঞ্চয় না হয়। ধর্ম্মহীন শিক্ষাহেতু পাপের আশ্রয়ে অর্থার্জ্জন হয়, পাপের প্রশ্রয়ে তাহা ব্যয়িত হয়। তাহাতে নিজস্ব লাভ—পাপানুসরণ, পাপপরিপোষণ, পাপার্জ্জন ও জীবন অশান্তিময় করণ। আশু সুখের আশায় পাপ পথ অবলম্বন করিয়াও লোকে বিপুল অর্থার্জ্জনের চেষ্টা হইতে বিমুখ হয় না। ফলে পাপজনিত দুঃখ ত পায়ই, পাপলব্ধ অর্থও

পাপকার্য্যেই ব্যয়িত হয়। পাপলব্ধ অর্থ বন্যার জলের ন্যায় প্রবল বেগে ক্ষিপ্র গতিতে আইসে বটে; কিন্তু পূর্ব্বের সংগৃহীত জল পর্য্যন্তও লইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই বাহির হইয়া যায়। পাপলব্ধ অর্থ, সকল দুঃখের আকর, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দুঃখময়। পাপলব্ধ অর্থ কেহ কখনও ভোগ করিতে পারে না। ইহা আনিতে দুঃখ, রাখিতে দুঃখ, যাইতে দুঃখ। ইহার ভোগ সেরেফ দুঃখময়। পাপে সুখ হয় না, হইবার নয়।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আমি উক্ত ধ্রুব সত্যটুকু ফুটাইবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যদি কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়া থাকি, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক। ষাঁড়াষাঁড়ি বানের স্রোতের ন্যায় আজকাল পুস্তক-লিখনের ও মুদ্রাঙ্কনের স্রোত বহিতেছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলে সেই খরস্রোতে এই এক বিন্দু জল ফেলিতাম না। উদ্দেশ্য, ধর্ম্মহীন শিক্ষার পরিণাম প্রদর্শন। তাহাতে যদি কৃতকার্য্য হইয়া থাকি, তবেই আমি সফলমনোরথ হইব।

বাল্যকাল হইতেই মাতৃভাষা সেবা করিবার স্পৃহা ছিল, প্রথম যৌবনে যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিয়াছিলাম। কিন্তু ব্যবহারাজীবির পেশার বিশেষ পেষণে আজ ২৫ বৎসর কাল সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। সম্প্রতি দুইমাস অবসর গ্রহণ করিয়া আমার মধুপুরস্থ "সাধু-সঙ্ঘ" আশ্রমে গাছপালার সেবা করিয়াছি, কত স্বভাবের শোভা দেখিয়াছি। আর গত ২৫ বৎসর ধরিয়া পেশা হিসাবে যাহা দেখিয়াছি—মনুষ্য জীবনে পাপের চূড়ান্ত নিদর্শন যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি—তাহাই সমাজসেবার উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিলাম। জীবনে কখনও চুপ করিয়া থাকিতে পারি নাই, দুই মাসের অবসর সময়েও তাহাই হইয়াছে। তাই সে সময়ের কতক অংশ এই পুস্তক লিখিয়া কাটাইয়াছি।

অবশেষে একটা বিশেষ কথা না বলিয়া এই ভূমিকা শেষ করিতে পারি না। আমি যখন এই দুই মাস কাল কি করিয়া কাটাইব ভাবিতেছিলাম, আমার নিকটাত্মীয় বন্ধুপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সাধু আমাকে আমার ২৫ বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতাপ্রসূত একখানি পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার সমীচীন উৎসাহ না পাইলে হয় ত আমি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। আমার প্রিয়-বন্ধু লেখকপ্রবর ডাক্তার—চিকিৎসাবিদ্যায় নয়—শ্রীযুক্তবাবু অবিনাশচন্দ্র দাস এম-এ-বি-এল পি এইচ-ডি, গন্ধবণিকের অন্যতর সম্পাদক, প্রিয়বন্ধু ও সমব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বাবু সৌরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভারতীর অন্যতম সম্পাদক, ও প্রিয় সুহৃদ্ শ্রদ্ধাস্পদ কনিষ্ঠপ্রতুল মেধাবী লেখক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল, অর্চ্চনার অন্যতম সম্পাদক—এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করেন। তাঁহাদের উৎসাহে ও অভ্যর্থনায় আমি পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হই। তাঁহাদের আন্তরিক উৎসাহেই এই পুস্তক রচিত হইল। আমি অন্য পুরস্কার চাহি না; মাতৃভাষা সেবার পুরস্কার মাতৃভাষা সেবা।

সাধুসঙ্ঘ, মধুপুর
২৬ শে ডিসেম্বর ১৯২২
১১ই পৌষ ১৩২৯।

শ্রীতারকনাথ সাধু।

ভোলানাথের ভুল

প্রথম পরিচ্ছেদ

রামনারায়ণপুর

রামনারায়ণপুর একটি গণ্ডগ্রাম। ইহা ভাগীরথীর উপকূলে স্থাপিত। এই গ্রামে অনেক ঘর ভদ্রলোকের বাস—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও গন্ধবণিক। গ্রামটিতে স্বভাবের সৌন্দর্য্য বিশেষ পরিমাণে বিদ্যমান। যে কোন লোক নদীবক্ষে যাইবার সময় গ্রামের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। গঙ্গার উপকূলের উপরেই বিস্তৃত রাজপথ; গ্রামবাসীরা এই রাজপথে সান্ধ্যভ্রমণকালে পলায়নপর সূর্য্যকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেন। সূর্য্যদেব সারাদিন রামনারায়ণপুরে কার্য্য করিয়া সন্ধ্যার সময় রোষ-কষায়িত-লোচনে সর্ব্বশরীর রক্তিম রাগে রঞ্জিত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ ভাগীরথীর অপর পারে ডুবিয়া রামনারায়ণ-পুরবাসীর কটাক্ষ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতেন। আর গ্রামবাসীরা তাহার তিরোধানে, অদর্শনে ব্যথিত হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারের আক্রমণের পূর্ব্বে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। যে অল্প সংখ্যক লোক গঙ্গাগর্ভগামী সূর্য্যদেবের পুনরাবর্ত্তনের অপেক্ষায় অন্ধকারে তাঁহার জন্য উৎসুকচিত্তে ভ্রমণ করিতেন, তাঁহারা ভগবানের আলোকের পরিবর্ত্তে মানুষের আলোর, অনেক পরে, দর্শন পাইতেন।

কিন্তু সে আলোতে আলো জ্বলিতেছে, ইহা ছাড়া আর কিছু দৃষ্ট হইত না। অনেক সময় এই মনুষ্যদত্ত আলোর বোধগম্যের জন্য দ্বিতীয় আলোর প্রয়োজন হইত। ভগবানের সৃষ্ট পদার্থের কাছে, মানুষের সৃষ্ট পদার্থ সকল সময়ে সকল দেশেই এইরূপ। তবে বাঙ্গালা দেশে ইহাদের পার্থক্য বিশেষ পরিমাণে লক্ষ্য হয়।

বাঙ্গালার যৌথ কার্য্যের ফল অনেক সময়েই এইরূপ। সাধারণ প্রজা-পুঞ্জকে কর দিতে হইবে। সেই একত্রিত কর একজন বা দুইজন বা দশজনের করকবলিত হয়। যাহা ব্যয়িত হয় তাহা করদাতাদের বিশেষ কোন উপকারে আসে না। রাস্তাঘাটের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। তবে যেরূপ খরচের বহর তাহার তুলনায় রাস্তাঘাটের অবস্থা আরও অনেক ভাল হওয়া উচিত।

আমাদের দেশে একজনের কর্ত্তৃত্বে কাজ এক রকম চলে। দশজনের দশ মতে দশ হস্তে তাহার দশমাংশের একাংশ কার্য্যই হইয়া থাকে। যত প্রভু তত ব্যয়াধিক্য, তত কার্য্য-স্বল্পতা ও কার্য্যের অসুবিধা। আমাদের, দশে মিলিয়া কার্য্য করিবার শিক্ষার এই প্রথম স্তর। শিক্ষা কার্য্যকরী হইতে সময় লাগিবে। সময়ে এই দশে-মিলি-কার্য্য বিশেষ চেষ্টায় ফলবতী হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে মিউনিসিপাল সভাগৃহের কেবল সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনকারী কমিশনারগণের পরিবর্ত্তে যদি কতকগুলি কার্য্যনিপুণ কমিশনার রামনারায়ণপুরের মিউনিসিপাল কাউন্সিলে যোগ দেন, তাহা হইলে হয় ত ভবিষ্যতে সূর্য্যদেবের অন্তর্ধানের পর অনারারী হাকিমদের ন্যায় চন্দ্রদেবের সুবিধামত কার্য্যক্ষেত্রে আগমনের পূর্ব্বে কমিশনারদের আলোতে রাস্তা দেখা গেলেও যেতে পারে।

রামনারায়ণপুরের রাস্তার একটি বেশ সুবন্দোবস্ত। রাস্তার দুইপার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী রোপিত, প্রত্যেক পার্শ্বে একটি করিয়া সুমিষ্ট ফলের গাছ ও

অপরটি সুগন্ধি ফুলের গাছ। সুমিষ্ট ফলের গাছের মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি আর ফুলের গাছের মধ্যে বকুল, চাঁপা, চন্দন, শেফালিকা ইত্যাদি। মধ্যে মধ্যে অশ্বত্থ ও বট। যখন সূর্য্যদেব সরাগে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রামনারায়ণপুরের উপর আপন প্রখর কিরণজাল বিস্তার করেন, তখন রামনারায়ণপুরের পথিকগণ তাহার নিকট হইতে পলাইয়া এই সব অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

গ্রামের বাহিরে সব চাষের জমি। ধানের চাষ, মুগ, কলাই অরহর ও অপরাপর ডাল মটরের চাষ, তরিতরকারীর চাষ। প্রত্যেক গ্রামবাসীর বাটীর সংলগ্ন অনেকটা করিয়া ফাঁকা জমি আছে; এই জমিখণ্ডে প্রত্যেক রন্ধনশালার প্রয়োজনীয় তরিতরকারী উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতেই গাভী আছে; প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ হয় এবং দুগ্ধ হইতে ঘি, ছানা, নবনী ও রসনা-তৃপ্তিকর মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। গ্রামের মাঝে মাঝে গোচারণের মাঠ আছে, সেই মাঠগুলিতে গ্রামবাসীদের গরু, বাছুর, বলদ, ছাগ, মহিষাদি ঘাস খাইয়া পরিতৃপ্ত হয়। প্রত্যেক গ্রামবাসীর বাটীতে অনেকগুলি কলার গাছ আছে, তাহা হইতে মোচা, থোড়, কলা—পাকা ও কাঁচা,—কলার পাতা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বাটীর পুরুষেরা বাগানের কাজ ও গরুর সেবা জানে ও করে এবং গৃহিণীরা গৃহকার্য্য, বাগানের কাজ ও গরুর সেবা জানে ও করে।

গ্রামে ডাক্তার ও কবিরাজ আছেন, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প এবং পেশাও খুব জোরে চলে না। তবে খুব জোরে না চলিলেও তাঁহারা বিশেষ অসুখী নন। খাঁটি দুগ্ধ, গব্যঘৃত, সদ্যমথিত নবনীত, সদ্যজাত ফল মূল, সদ্য আহৃত তরকারী ও শাক সবজী সবই টাট্‌কা, সবই সুমিষ্ট। এই সমস্ত মুখরোচক ও পুষ্টিকর ভক্ষ্যদ্রব্য প্রত্যেক গ্রামবাসীর ভোগ্য।

শুইবার ও বসিবার ঘরগুলি সব পাকা, রন্ধনশালা ও গোশালা দুই

একটি ব্যতীত সবগুলিই কাঁচা। কিন্তু কাঁচা হইলে কি হয়, গোবরে ও মাটিতে এরূপভাবে নিকায়িত যে পরিচ্ছন্নতায় ও স্বাস্থ্যে পাকা ঘরকে ও ঝকমারে। পাঠক যদি সাঁওতাল পরগণার অবস্থাপন্ন সাঁওতালদের মাটির ঘর দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, অনেক সময় কাঁচা-ঘর পাকাঘরের অপেক্ষায় কোন অংশে কম মন-আকর্ষণকারী ও কম স্বাস্থ্যজনক নহে।

যদিও রামনারায়ণপুর ভাগীরথীর উপকূলে অবস্থিত, তথাপি এই গ্রামে অনেকগুলি সুদীর্ঘ পুষ্করিণী আছে। তবে অধিকাংশ গ্রামবাসী স্নান ও পানের জন্য গঙ্গাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গ্রামে মানুষকে যথার্থ মানুষ করিবার অভিপ্রায়ে অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত সম্পূর্ণরূপে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। কারণ এ বিদ্যালয়গুলি ধর্ম্মশিক্ষাহীন বিদ্যালয়। ধর্ম্মহীন শিক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষাপদ বাচ্যই নয়। কেবল দশখানা পুস্তক পড়িলে বা পাঁচটা ভাষা শিখিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। কেবল ভাষাশিক্ষা পশুপক্ষী বা বনমানুষের শিক্ষা হইতে পারে, অসভ্যকে সভ্য করিতে পারে, কিন্তু মানুষকে খাঁটি মানুষ করিতে পারে না। তাহার জন্য ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন। ইহার অভাবে আমরা সৎপুত্র, উত্তম পিতা, উপযুক্ত ভ্রাতা, শ্রেষ্ঠ দেশবাসী হইতে পারি না। ক্ষিপ্র হস্ত, দ্রুতগামীপদ, তীব্র নাসিকা, প্রখর মুখ, ক্ষুদ্র চক্ষু আর লম্বা জিহ্বা থাকিলে মনুষ্য মনুষ্য পদবাচ্য হয় বটে। কিন্তু যত-দিন না ধর্ম্মশিক্ষা হয়, যতদিন না সেই হস্ত পদ নাসিকা মুখ চক্ষু ও জিহ্বা ধর্ম্মশিক্ষায় শোধিত হয়, ততদিন কেবল হস্ত পদ নাসিকা মুখ জিহ্বা বিশিষ্ট মনুষ্য যথার্থ মনুষ্য হয় না। যেমন সুবর্ণ অগ্নি দ্বারা শোধিত না হইলে তপ্তকাঞ্চন হয় না, তেমনি মনুষ্য ধর্ম্মশিক্ষায় শোধিত না হইলে যথার্থ মনুষ্য পদবাচ্য হয় না।

আমাদের দেশে এখন সেই ধর্ম্মশিক্ষারই অভাব, কাজেই ফলও তদ্রূপ। তাই মানুষ ভাষায় শিক্ষিত হইতেছে। যেমন পক্ষী পড়ে কিন্তু বোধগম্য করে না, তেমনি মনুষ্য ধর্ম্মশিক্ষা বিহীনে জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে না, কাজেই জীবনও সার্থক হয় না। চিরজীবন অর্থের পূজা করে, পাপের পূজা করে, অধর্ম্মের পূজা করে। পুণ্য বোঝে না, পুণ্যের স্বাদ পায় না, ধর্ম্ম বোঝে না ধর্ম্মের স্বাদ পায় না। ঈশ্বর বোঝে না, কেন না ধর্ম্মশিক্ষা ব্যতীত ঈশ্বর বোধ হয় না। তাই ধর্ম্মহীন জীবন যাপিয়া পুণ্য পূজে না, ধর্ম্ম পূজে না, ঈশ্বরের পূজা করে না। ধর্ম্মহীন প্রাণহীন জীবন, মলমূত্র পূরিত পচ্য রক্তমাংসের সমষ্টিমাত্র। ইহাতে ভোগের কিছুই নাই, দুঃখভোগ ও কর্ম্মভোগের অনেক উপকরণ আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরের ধনে পোদ্দারী
লোকে বলে লক্ষেশ্বরী

ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফল যাহা হয়, রামনারায়ণপুরে ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামে তাহাই হইয়াছিল। সকলেই 'যেন তেন প্রকারেণ' অর্থ উপার্জ্জনের জন্য বিশেষ লোলুপ ও আগ্রহান্বিত। তাহার ফলে 'পরের ধনে পোদ্দারী' এই মহাবাক্যের অনুসরণে ও অনুকরণে অনেকগুলি যৌথ-কারবারের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেশটাকে জ্বালাইয়া দিয়াছিল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত রামনারায়ণপুরে,—জ্বালাইয়াছিল সমস্ত বাঙ্গালা দেশ। আর এই অগ্নিশিখা বাঙ্গালার বাহিরেও গিয়া পড়িয়াছিল এবং নিজকার্য্য সাধনও করিয়াছিল।

গ্রামের যুবক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ মিলিয়া অনেকগুলি ধ্বংসশীল যৌথকারবার আরম্ভ করিয়াছিল; "নিখিল ভারত বিশুদ্ধ হরিনাম সত্য কোঃ লিমিটেড", "পাঁচলাখ রুপিয়া দেলাইদে রাম লিমিটেড", "যেন তেন প্রকারেণ অর্থসঞ্চয় লিমিটেড", "বৃত্ত উৎপাদন ও সঞ্চয়ন লিমিটেড", "অল ইণ্ডিয়া গুড় কোম্পানি লিমিটেড", "অল ইণ্ডিয়া ঘি কোম্পানি লিমিটেড" "অল ইণ্ডিয়া ভেজিটেবল কোম্পানি লিমিটেড", "অল ইণ্ডিয়া তীর্থযাত্রা লিমিটেড"। গ্রামের যত অকৃতবিদ্য যুবক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ মিলিয়া উক্ত কোম্পানিগুলি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাদের আর কোন গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, পরের টাকা নিজের হাতে আনিতে তাহারা সিদ্ধহস্ত। এই সব

জল বুদ্‌বুদ্‌বৎ স্বল্পকাল স্থায়ী যৌথ কারবারের হেড আফিস রামনারায়ণপুরে আর ব্রাঞ্চ আফিস কলিকাতায়। প্রত্যেক কোম্পানি বাৎসরিক শতকরা ২৪৲ টাকা লাভ স্থির নিশ্চয় করিয়া দিয়াছিলেন। যে সব লোকে মাসে ২০৲ টাকা সাধারণ উপায়ে অর্জ্জন করিতে অক্ষম, তাহারাই যৌথ কারবারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হইয়া দেশের ও দশের কার্য্যে সামান্য মাসিক বেতন ৫০০৲ লইয়া তাহাদের অমূল্য সময় সস্তায় লুটাইয়া বিকাইয়া দিতেছিলেন।

প্রত্যেক যৌথকারবারের মূলধন একলক্ষ হইতে দশলক্ষ টাকা। প্রত্যেক কোম্পানির মূলধনের অর্দ্ধেক টাকা তাহার মেনেজিং ডিরেক্টরের অচল অস্থায়ী লোকসানি ব্যবসার ক্রেয় মূল্যের জন্য ব্যয়িত হইত। যদি তাহার নিজের কোন ব্যবসা পূর্ব্বে না থাকে, তবে তাহার কোন আত্মীয় বা বন্ধুর অচল লোকসানি চলিত ব্যবসায়ের মূল্যস্বরূপ দেওয়া হইত। এই সব স্বল্পমূল্য ও লোকসানি ব্যবসাগুলি অগ্নিমূল্যে যৌথ কারবারের মূলধন হইতে খরিদ করিয়া, বালুরাশি মধ্যে প্রোথিত ভিত্তিতে যৌথকারবারের রাজহর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইতে লাগিল। এইরূপ ভিত্তিস্থিত যৌথ কারবারের পরিণাম আর কি হইবে—অতিশয় অল্পস্থায়ী ও ক্ষণ ভঙ্গুর। অল্পদিন মধ্যেই ভূমিশায়ী হইল। অংশীদারদের টাকা কোথায় উড়িয়া গেল। এই সব কারবারে ক্ষতিগ্রস্ত হইল সকলেই; ধনবান হইল কেবল ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর তাহার আত্মীয় বন্ধু ডিরেক্টর দল। অনেকগুলি দেশের ধন্য মান্য গণ্য ব্যক্তির নাম এই সব কোম্পানির ডিরেক্টার দলের নামের তালিকা ভুক্ত ছিল; কিন্তু হয় তাহারা খাতিরে নাম দিয়াছিলেন, নয়ত মনে করিয়াছিলেন তাহারা এই সব কোম্পানির কার্য্য কলাপ পর্য্যালোচনা করিবেন; কিন্তু সময়াভাবে তাহা পারেন নাই। অনেক লোক এইসব দিগ্বিজয়ী পুরুষের নাম দেখিয়া অংশনামা খরিদ করিয়াছিলেন। কিন্তু

সময়াভাবে সেই ধুরন্ধরেরা কোম্পানির কোন তত্ত্বাবধান করেন নাই। তাঁহারা এই অবিমৃশ্যকারিতার জন্য দুঃখিত। কিন্তু গরীব অংশীদারের বা পলিশি হোল্ডারদের ক্ষতিপূরণ করিতে তাঁহারা একেবারেই অনিচ্ছুক ও অপারগ। তাঁহারা কি করিবেন, তাঁহারা ত গরীব অংশীদারের টাকা মারেন নাই। তাঁহাদের নামের দোহাই দিয়া অবিশ্বাসী, অধার্ম্মিক, দুর্ব্বৃত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও বন্ধুবর্গ টাকা মারিয়াছে, ভবিষ্যতে তাঁহারা সাবধান হইবেন এবং তাঁহাদের স্ত্রীর আত্মীয় স্বজন বা জ্ঞাতি কুটুম্ব কোন কোম্পানি পত্তন না করিলে তাঁহারা তাঁহাদের নাম ভবিষ্যতে আর ব্যবহার করিতে দিবেন না।

"নিখিল ভারত বিশুদ্ধ হরিনাম সত্য কোম্পানি লিমিটেড্" এর জন্ম ও কার্য্যের ইতিহাস এইরূপ;—জন্মেজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, একটি বিখ্যাত মেডিক্যাল কলেজ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। সংসার সমুদ্রের জল অগাধ, তিনি সেই অগাধ জলে ডুবিলেন। কুল-কিনারা কিছুই পান না; ভাসিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই ভাসিতে পারেন না। চাল, ডাল, নুন, তেল, ঘি ইত্যাদির সরবরাহকারী মুদী, তাহার ভাড়াটীয়া বাসা বাটীর জমিদারের সরকার, কাপড়ওয়ালা, দরজী, বইওয়ালা ইত্যাদি অনেক হাঙ্গর কুম্ভীর, তাগাদার ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি ত্রাহি মধুসূদন রব ছাড়িতে লাগিলেন। পশারের সুবিধার জন্য তিনি তাঁহার বাটীর একতালার একটি ক্ষুদ্র ঘরে বিশুদ্ধ হরিনাম সত্য সভা স্থাপিত করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, বহুলোকের সমাগম ও তাহাদের সহিত জানা শুনা ও পশারের সুবিধা। এত করিয়াও কিন্তু কিছুই হইল না। মানুষের চেষ্টা সব সময়ে ফলবতী হয় না।

এই সময়ে পাড়ার সর্ব্বেশ্বর বাখালী আসিয়া খবর দিল, ডাক্তারবাবু হরিহর মুখুজ্যে অনেক বিষয় সম্পত্তি ও একমাত্র বিধবা স্ত্রীকে রাখিয়া

স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। হরিহরের সহধর্ম্মিণী জ্ঞানদা সাধ্বী ও হরিভক্তিপরায়ণা। তাহাকে আমাদের সভায় যোগ দেওয়াইতে পারিলে আমাদের সভার আর্থিক উন্নতির বিশেষ সুবিধা হয়। এই খবর পাইয়া ডাক্তার বাবু আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। তিনি সেইদিন হইতে হরিহর মুখুজ্যের বিধবা স্ত্রীর খবরাখবর লইতে আরম্ভ করিলেন। আহা! তাহার স্বামী নাই, পুত্র নাই, কোন নিকট আত্মীয় স্বজনও নাই। তাহাকে দেখাই যথার্থ সৎকার্য্য ও পরোপকার। স্বামিপুত্রহীনা সঙ্গতি-সম্পন্না নিরাশ্রয়া মুখুজ্যেপত্নীর প্রত্যহই খবর লইতে লাগিলেন, আর সামান্য মাথা ধরিলে বিনা ভিজিটে দিনে তিনবার করিয়া দেখিয়া আসেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, ভদ্রলোকের কার্য্যই ত এইরূপ, অনাথাকে সাহায্য করাই ত ভগবানের অভিপ্রেত কার্য্য, অনাথের সেবাই ত ভগবানের সেবা। এই ডাক্তারবাবু আরও বিনা ভিজিটে দেখেন, তাহার প্রতিষ্ঠিত হরিসভার কতকগুলি পাণ্ডাকে তিনি ভিজিট না লইয়া চিকিৎসা করেন, আর তাঁহারাও তাহার প্রত্যুপকারে বিনা ভিজিটে তাঁহার সুনাম সংকীর্ত্তন করেন। এইরূপ আদান প্রদানের সমন্বয়ে ডাক্তারবাবুর ডাক্তারির ও ধর্ম্মনিষ্ঠার যশঃসৌরভ সমস্ত রামনারায়ণপুর ও তাহার নিকটস্থ গ্রাম সমুদায়কে সুগন্ধময় করিয়া তুলিল।

এইরূপে প্রায় অষ্টাদশ মাস কাটিল। একদিন সর্ব্বেশ্বর বাখালী মুখুজ্যে পত্নীর কাছে আসিয়া উপস্থিত। সর্ব্বেশ্বর বলিল—"মা, কেমন আছ গো?"

জ্ঞানদা। এস বাবা এস, তুমি কেমন আছ, ছেলে পুলে সব ভাল আছে ত?

সর্ব্বেশ্বর। "হাঁ মা, তোমার আশীর্ব্বাদে সব ভাল। তবে তোমার বৌয়ের অসুখ করিয়াছিল, তা আমাদের জন্মেজয় ডাক্তারের অনুগ্রহে ও

বিনা ভিজিটে সুচিকিৎসার ফলে এ যাত্রা আরোগ্যলাভ করিয়াছে। দেখুন, আমরা গরীব মানুষ যাই জন্মেজয় ডাক্তার এদেশে আছেন তাই আমরা বেঁচে আছি।

জ্ঞানদা। হাঁ, জন্মেজয় ডাক্তার লোকটি ভাল; বেশ পরোপকারী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং গরীবদের মা বাপ। ওবাটীর জগদম্বা দিদিও জন্মেজয়ের অনেক সুখ্যাতি করিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন যে, তাহার হরিসভায় দেশের অনেক উপকার হইতেছে। তিনি লোকের উপকারের জন্য হরিনাম ও ঔষধ দুই বিলাইতেই বিশেষ ব্যস্ত। তিনি বলেন, মানব-সমাজের হিতের জন্যই তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আহা, এরকম লোক আজকাল অতি বিরল। ভগবান তাহার মঙ্গল করুন।

সর্ব্বেশ্বর। তা মা, ডাক্তারবাবু ত গৃহস্থ মানুষ। বিশেষতঃ বিপুল ধন সম্পত্তি তাহার নেই। পেশাই ভরসা, তাও তিনি অনেকস্থলে বিনা ভিজিটে দেখেন। হরিসভার সংকীর্ত্তনের ও হরিরলোট ইত্যাদির খরচ-পত্র আছে। তবুও বেচারি অম্লানবদনে খরচ চালাইয়া যাইতেছে। ধন্য তাহার বদান্যতা, ধন্য তাহার ধর্ম্মনিষ্ঠা।

জ্ঞানদা। হাঁ তা সত্য, আমার অসুখ বিসুখের সময় তিনি চিকিৎসা করেন, ঔষধ দেন, আমি ভিজিট বা ঔষধের দাম দিতে গেলে বলেন, মা আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, তাহাই যথেষ্ট। আপনাকে মা বলিয়াছি আপনার কাছ হইতে পয়সা নিতে পারিব না। তা লোকটী বেশ; আজকালকার দিনে এরকম লোক সংখ্যায় অতি অল্প।

ইহার কিছুদিন পরে জ্ঞানদার জ্বর বিকার রোগ হইল, জীবন সংশয়। জন্মেজয় ও তাহার স্ত্রীর প্রাণপণ চেষ্টা ও শুশ্রূষায় তিনি আরোগ্য হইলেন। আরোগ্যের পর তাহার ধন সম্পত্তির প্রতি একটা সাময়িক বিতৃষ্ণা জন্মিল। ভাবিলেন, এই ত আমি মরিতে বসিয়াছিলাম, মৃত্যুর হাত হইতে একচুল

তফাতে ছিলাম, ভগবানের কৃপায়, ও ডাক্তারবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর শুশ্রূষায় ও সাহায্যে এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি। কে জানে কোনদিন পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে হইবে, অতএব আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে আমার আবশ্যক ও প্রয়োজনীয় কিঞ্চিৎ সম্পত্তি রাখিয়া বাকি সমস্তই ভগবানের অর্থ ভগবানের কার্য্যে ব্যয় করা কর্ত্তব্য। ইহার বন্দোবস্ত, সময়ে না করিলে আমার এই ত্যক্ত বিত্ত পাপ কার্য্যে বা বৃথা শৃগাল কুকুর ভোজনে ও পোষণে ব্যয়িত হইতে পারে।

এই সঙ্কল্প করিয়া একদিন তিনি জন্মেজয় ডাক্তারকে সকল কথা বলিলেন, জন্মেজয় সকল কথা শুনিলেন, শুনিয়া তাঁহার শুভ সঙ্কল্পের প্রশংসাবাদ করিলেন। আর মনে মনে তাঁহার যে বহুকাল পূর্ব্বে রোপিত বীজের ফল এতদিন পরে ফলিয়াছে, তাহার জন্য আত্ম-প্রশংসা করিতেও ভুলিলেন না। প্রকাশ্যে নির্লিপ্ত ভাবে বলিলেন 'আচ্ছা, আপনার যেরূপ অভিরুচি সেইরূপই হইবে।' আর তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে বিশেষ মনোযোগের সহিত কার্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন। সকলের চেষ্টার ফলে জ্ঞানদা জন্মেজয় ডাক্তারের ধর্ম্মনিষ্ঠার ও পরোপকারিতার বহুল প্রশংসা শুনিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎ দিনের মধ্যে তাহার সম্পত্তি ঈশ্বর সেবায় ও জন সেবায় ব্যয়িত হইবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রস্তাব করিলেন।

এই সব আলোচনা ও প্রস্তাবনার ফলে "নিখিল ভারত হরিনাম সত্য কোম্পানি লিমিটেড্" এর জন্ম হইল। এই কলিযুগে "হরিনামৈব কেবলম্" হরিনাম ছাড়া মানুষের আর উদ্ধারের উপায় নাই। এই সুধামাখা হরিনামের প্রচারের জন্য, সকল পাপী তাপী উদ্ধারের জন্য, তাহার নিজের ও জনসাধারণের উদ্ধারের জন্য, সমস্ত বাঙ্গালা দেশের উদ্ধারের জন্য, সমস্ত ভারতবর্ষের উদ্ধারের জন্য, চীন জাপান ইয়োরোপ আফ্রিকা ও আমেরিকার অন্ধকার পূর্ণ লোক পুঞ্জের উদ্ধারের

জন্য ডাক্তারবাবু এই কোম্পানির সৃষ্টি করিলেন। এই কার্য্যের কেন্দ্র (nucleus) ত অগ্রেই বিদ্যমান, তাঁহার "বিশুদ্ধ হরিনাম সত্য" সভা। তবে বিশেষভাবে হরিনাম প্রচার করিতে হইলে তাহার শাখাপ্রশাখার প্রয়োজন, আবার সেই কার্য্যের জন্য বহুল অর্থের প্রয়োজন। তিনি নিজেই সব করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন জ্ঞানদাদেবীর একান্ত ইচ্ছা তাঁহার অর্থ শুভ কার্য্যে ব্যয়িত হয়, তিনি তাঁহার সদিচ্ছায় ব্যাঘাত দিবেন না, তাঁহার মনোরথ পূরণে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবেন না তাঁহার অর্থ এই সৎকার্য্যে ব্যয়িত করিবেন, তাঁহাকে এই পুণ্যের অংশীদার করিবেন, ভগবান এই কার্য্যের জন্য মনে বল দিন।

"বিশুদ্ধ হরিনাম সত্য" সভা, বিশুদ্ধ নিখিল ভারত "হরিনাম সত্য" কোম্পানি লিমিটেড্ নামে পরিবর্ত্তিত হইল। আর নিখিল ভারত বিশুদ্ধ হরিনাম সত্য কোম্পানি লিমিটেডের ১০০০০ অংশ নামা (শেয়ারে) বিভক্ত হইল। প্রত্যেক শেয়ারের দাম কোং ১০৲ টাকা। ডাক্তারবাবু খবর লইয়াছিলেন জ্ঞানদাদেবীর ৫০ হাজার টাকা আছে। অতএব ঠিক হইল, জ্ঞানদাদেবীর ৫০০০ হাজার শেয়ার কিনিবেন অর্থাৎ ৫০০০০ হাজার টাকা দিবেন আর ৫০০০ হাজার শেয়ারের মধ্যে আড়াই হাজার শেয়ার ডাক্তারবাবু লইবেন, আর বাকি ২৫০০ শেয়ার সাধারণের গ্রহণের জন্য বাজারে বিক্রীত হইবে। ডাক্তারবাবু বিশুদ্ধ হরিনাম সত্য সভার মূল্য নিজ ক্ষতি স্বীকার করিয়া ৫০,০০০ টাকা ধরিলেন। তিনি যে পঁচিশ শত শেয়ার লইলেন, তাহার দরুণ ২৫০০০৲ টাকা, জ্ঞানদাদেবীর দেয় ৫০,০০০৲ টাকা হইতে তিনি লইলেন ২৫০০০৲ টাকা নগদ, বাকি ২৫০০০৲ টাকা নগদ ও পঁচিশ শত শেয়ার এই মূলধন বিশুদ্ধ হরিনাম সত্য সভার ভিত্তির উপর নিখিল ভারত বিশুদ্ধ হরিনাম সত্য কোম্পানি লিমিটেড্ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সভার কার্য্য হরিনাম প্রচার, ডাক্তারবাবু ম্যানিজিং ডিরেক্টর। সভার উদ্দেশ্য,

স্ত্রীলোককে সমান স্বত্ব দেওয়া। সেই কারণে জ্ঞানদাদেবী, সর্ব্বেশ্বর বাখালী, ও অপর একজন নির্ব্বাচিত ভদ্রমহোদয় ও জন্মেজয় ডাক্তার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রেষ্ঠতর সভ্য হইয়া নিখিল ভারত বিশুদ্ধ হরিনাম সত্য কোম্পানি লিমিটেডের ডাইরেক্টর হইলেন। জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির রেজিষ্ট্রার ষ্টেদার হেল সাহেবের আফিসে কোম্পানী রেজেষ্ট্রি হইল। লেখার কড়ি কি আর বাঘে খায়?

পূর্ব্বতন বিশুদ্ধ হরিনাম সত্য সভার সভ্যেরা বলিতে লাগিলেন, জ্ঞানদাদেবীর মনোরথ পূরণের জন্য ডাক্তার বাবু লোকসান করিয়া নিজস্ব হরিসভাটি জ্ঞানদা দেবীকে ও দশের ও দেশের উপকারের জন্য নিখিল ভারতকে দান করিলেন। কিন্তু সকল দেশেই ভালমন্দ দুই রকম লোকই আছেন। কুলোকে বলিতে লাগিল, জন্মেজয় ডাক্তার এ যাত্রা কিছু মারিয়া দিলেন। কোন্ পক্ষ সত্য তাহা না বলাই ভাল। তবে ইহা স্থির নিশ্চয়, ডাক্তার বাবু মুদী, বাড়ীওয়ালার সরকার, কাপড় ওয়ালা, জামাওয়ালা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাওনাদারের হাত হইতে সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন, আর তার ব্যাঙ্কে জমা-বাকীর দিকে অনেক টাকা জমিয়া গেল। তবে ও ধ্রুব সত্য এদেশে ধর্ম্মপ্রাণ একেবারে ধুক্ ধুক্ করিতেছে, প্রায় থামিয়া যাইবার যোগাড়। তাই তাহার দু একটি বিশেষ বাধ্য রোগী, ২।১ খানা শেয়ার কেনা ভিন্ন আর কেহই ইহার অংশ নামা কিনিল না। বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমিতে হরিনামের আদর নাই, গেয়ো যোগী ভিখ্ পায় না, তাই ডাক্তারবাবুর হরিনাম সত্য কোম্পানির শেয়ার বেশী বিক্রয় হইল না। তবে শেয়ার বিক্রয় হউক আর নাই হউক সভার কার্য্য খুব জোরে চলিতে লাগিল। হরিনামের মাহাত্ম্য ছাপা হইয়া বিতরিত হইতে লাগিল। তাহাতে হরিনামের মাহাত্ম্য ও জ্ঞানদাদেবীর মাহাত্ম্য, দুয়ের মাহাত্ম্যই প্রবলবেগে প্রচারিত হইতে লাগিল। প্রচুর পরিমাণে

প্রসাদ বিতরণ হইতে লাগিল, তবে সেই সব ডিরেক্টরদের বাটীতেই বেশী পরিমাণে যাইতে লাগিল।

ডাক্তারবাবুর ডাক্তারখানায় প্রচুর পরিমাণে নূতন নূতন ঔষধ আসিতে লাগিল। আর গ্রাম্য সেকরার দোকানে ডাক্তারবাবু, গৃহিণীর অঙ্গ সৌষ্টব্যের জন্য এতদিন পরে প্রচুর পরিমাণে অলঙ্কার প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। লোকে কানাঘুষা কিছু বলিলে ডাক্তারবাবুর লোকেরা বলিতে লাগিলেন, এতদিন তিনি গহনাতে টাকা আটকাইয়া রাখা, অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী অন্যায় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বুঝিয়াছেন সেকরাদের মজুরী দিলে দেশের টাকা দেশেই থাকে। তাই তিনি এই কার্য্যে রাজি হইয়াছেন। আর গরীব সেকারাও কিছু পাইবে।

এইরূপ ধরণের স্বেচ্ছাত্যাগে গঠিত আরও কয়েকটি কোম্পানি গঠিত হইয়াছিল, তাহাদের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

জন্মেজয় ডাক্তার ও অপর ডিরেক্টরগণ হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, শেয়ার হোল্ডাররা (অংশ নামাধারীরা) শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে বাৎসরিক ডিভিডেণ্ট পাইবেন।

হিসাবের তালিকা।

ব্যয়ের হিসাব

১০০০০ হাজার শেয়ারের দাম ১০০০০০৲

তাহার ডিভিডেণ্ট শতকরা ২৫৲ হিসাবে	২৫০০০৲
বৎসরের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পারিশ্রমিক ও ডিরেক্টরদের ফি	২৪০০০৲
অফিসের খরচা	১০০০৲
মোট—	পঞ্চাশ হাজার ৫০০০০৲

আয়ের হিসাব

হরিসভায় ভক্তদের দেওয়া সিন্নি বাতাসা, মিষ্টান্ন, চিনি, গরদ, তসর, সোনারূপা জহরৎ ইত্যাদি।

বৎসরে ৩৬৫ দিন, তাহাতে ঘণ্টা হিসাবে ৩৬৫ × ২৪ = ৮৭৬০, আর ৬০ মিনিটে একঘণ্টা ; তবেই ৮৭৬০ × ৬০ = ৫২৫৬০০ মিনিট। মিনিটে ন্যূনকল্পে দুই আনা করিয়া আয় ধরিলেও ৬৫৭০০৲ টাকা। হিসাবের কড়ি কি বাঘে খায় ?

আজকাল লোকের ধর্ম্মকর্ম্মে মতি নাই। কালের প্রভাবে হরিনামে আস্থা নাই, তাহা হইলেও ভারতবর্ষে অনেক ধর্ম্মপ্রাণ লোক আছেন। মিনিটে দুই আনা করিয়া দিলেও বৎসরে ৬৫৭০০৲ টাকা আয় হইবে তাহা হইলে শতকরা ২৫৲ টাকার বেশী ডিভিডেণ্ট দেওয়া স্থির নিশ্চয়। অতএব এইরূপে ধর্ম্ম অর্থ দুয়েরই সেবা করা হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সরল প্রাণ বনাম কুটিল মন

এই আধুনিক রামনারায়ণপুরের এক শত বৎসর পূর্ব্ব অবস্থায় ভোলানাথের পিতামহ ভূতনাথ রায় বাল্যক্রীড়া করেন। পরে ব্যবসা বাণিজ্যদ্বারা ভূতনাথ প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়েন। ভূতনাথের তিন ভ্রাতা ও দুই ভগ্নী। তিনি নিজ পরিশ্রম-অর্জ্জিত অর্থে তাহার ভ্রাতা ভ্রাতৃজায়া ও তাহাদের সন্তানসন্ততি, নিজ সন্তানসন্ততির সহিত সমভাবে লালন পালন করেন; তাহার নিজের ও ভ্রাতাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজ উপার্জ্জিত অর্থ সমভাবে ব্যয় করেন। কোনরূপ তারতম্য করেন নাই। বংশমর্য্যাদায় তিনি খুব উচ্চ, তবে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পুরুষ অপেক্ষাকৃত অর্থহীন হইয়া পড়েন।

ভূতনাথ জ্যেষ্ঠ। যখন ভূতনাথের বয়স ১৬ বৎসর, তাহার পিতা তাহাকে ও তাহার মাতাকে অপর পুত্র কন্যার লালন পালন ও ভরণ-পোষণের ভার দিয়া স্বর্গারোহণ করেন। এই গুরুভারের সহিত সম্পত্তি-ভার কিছুই দিয়া যান নাই। তবে মৃত্যুর পর লোকে তাহার পিতাকে সত্যবাদী, শিষ্টপ্রকৃতি, ধর্ম্মভীরু ভদ্রলোক বলিয়াই আখ্যাত করেন। তাহা যদি সম্পত্তি হয় তবে, তাহার পিতা তাহাদের জন্য সেই সুনাম-সম্পত্তি, রাখিয়া গিয়াছিলেন।

তাহার মধ্যম ভ্রাতার পত্নী—রূপবতী অত্যন্ত মুখরা, ক্রূরস্বভাবা ও ঈর্ষা পরায়ণা ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে ক্রোধবশে বলিতেন—তাহার

শ্বশুরের এক মামা প্রভূত অর্থ মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়া মারা পড়েন। আর ভূতনাথ সেই অর্থ খুঁড়িয়া লয়েন। তাহা হইতেই সংসারের সমস্ত খরচপত্র নির্ব্বাহ হইত। তিনি নিজে বিশেষ কিছু উপার্জ্জন করেন নাই। তবে যখন তাঁহার নিকট আত্মীয়েরা বলিতেন যে, ভূতনাথের মামাই ছিল না, তখন রূপবতী বলিতেন, তিনি এ কথা বিশ্বস্ত সূত্রে পাড়ার ঠান্‌দিদির কাছ থেকে শুনিয়াছেন। ঠান্‌দিদি নিশ্চয়ই সত্যবাদী। তবে যদি নিজের মামা না হয় ত দূর সম্পর্কে মামা হইবেন।

ভূতনাথের বাটী ভাগীরথীর তীর হইতে অল্প দূরে। অনেক ভদ্রসন্তান তাঁহার বাটীর সম্মুখ দিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন। তাঁহারা সকলেই ভূতনাথ রায়ের বাটীতে তৈল-মর্দ্দন করিতেন। ভূতনাথ তাঁহাদিগকে বলিতেন, ভায়া হে, অনেকক্ষণ তৈল মাখিয়া থাকিলে 'ঊর্দ্ধক' হয়। আমার বাটী গঙ্গার নিকটে,—এইখানেই আসিয়া তৈল মর্দ্দন করিও,—তাহাতে ত' তোমাদের কিছু অসুবিধা বা মানের লাঘব হইবে না। তদুত্তরে 'আজ্ঞে না' 'আজ্ঞে না' বলিয়া অনেকেই সেই অবধি তাহার বাটীতেই তৈল মর্দ্দন করিতেন। অনেক দাস-দাসী থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে আগন্তুক ভদ্রলোকদের জন্য তামাকের বন্দোবস্ত রাখিতেন; স্বহস্তে হুকাগুলির জল ফিরাইয়া দিতেন এবং বসিবার স্থানটি ও বেঞ্চিখানি নিজ হস্তে পরিষ্কার করিতেন।

তাঁহার বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকায় প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ, বৃহদাকার পাঁচ-খিলানে পূজার দালান এবং বাটীর সম্মুখে ও পশ্চাতে বৃহৎ বৃহৎ উদ্যান। এই সমস্ত উদ্যানে সকল রকমের ফুলের ও ফলের বৃক্ষ রোপিত। বহির্বাটীর বাগান পুরুষদের জন্য, আর পশ্চাতের বাগান রমণীদের জন্য। বাটীর সম্মুখে দুইটি ঘর,—একটি বড়, অপরটি ছোট। বড় ঘরটি বৈঠকখানা, ও ছোট ঘরটিতে একটি সেকরার দোকান।

ভদ্রলোকের জমায়তের জন্য এই ঘরটি একটি স্বর্ণকারকে বিনা ভাড়ায় দোকান করিতে দেওয়া ছিল।

এই দুই ঘরের মধ্য দিয়া অন্দরে যাইবার পথ। পথটি ঢাকা ও প্রশস্ত। এই পথপার্শ্বস্থিত একটি বেঞ্চে আগত ভদ্রলোকগণ তৈল মর্দ্দন করিতেন। প্রত্যেক দিন প্রাতে অনেক লোকের সমাগম হইত। গরীব গৃহস্থ প্রতিবেশীর জন্য স্নানান্তে গুড় ও ছোলার বন্দোবস্ত ছিল। তিনি লোকদিগকে বলিতেন, স্নানান্তে কিছু মুখে না দিয়া অনেক দূর চলিলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়। তাই তাঁহারা যদি দুটো ছোলা ও একটু গুড় খাইয়া যান, তাহা হইলে পিত্তের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। তিনি এরূপ ঐকান্তিকতার সহিত এই সব প্রস্তাব করিতেন যে, কেহই তাহাতে "না" বলিতে পারিতেন না। তিনি নিজেই বাটীর সদর দরজা ও তাহার নিকটস্থ স্থান পরিষ্কার করিতেন। লোকে যখন বলিত, তাঁহার এত লোকজন সত্ত্বেও কেন তিনি নিজ হাতে সে স্থানটি পরিষ্কার করেন, তাহার উত্তরে ভূতনাথ বলিতেন, এখনাকার পথ পরিষ্কার করিলে ও রাখিলে, পরকালের পথও পরিষ্কার থাকিবে। এরূপ সরল ভাবে কথাগুলি বলিতেন যে, তাহাতে লোকে তাঁহার সরল বিশ্বাসের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

তিনি পাড়ার সকল লোকেরই সংবাদ লইতেন; কাহারও অসুবিধা হইতেছে জানিলে তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। পাড়ায় কোন মামলা মোকর্দ্দমা বা মনোবিবাদ হইলে, তিনি আরও দুই একটি প্রতিবেশীকে সঙ্গে লইয়া, শালিসির দ্বারা সেই মামলা মোকর্দ্দমা ও মনোবিবাদ মিটাইয়া দিতেন। সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত, আর তিনিও সকলকেই মান্য করিতেন। তিনি অকাতরে পরের দুঃখ-মোচনে চেষ্টা করিতেন এবং তাঁহার চেষ্টা, যত্ন ও কার্য্যের বিনিময়ে আর্ত্তের

আশীর্ব্বাদ ও শুভ-কামনা অর্জ্জন করিতেন। যদিও তিনি খুব বড় দরের ধনী ছিলেন না, তথাপি, তাঁহার জীবনে কোন দুঃখ ও কষ্ট ছিল না। তিনি সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অনেকগুলি পুত্র, কন্যা, নাতি নাতনী, বন্ধু বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষী রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

তিনি চারি পুত্র রাখিয়া যান। তন্মধ্যে রাধানাথ তৃতীয় পুত্র; তিনি শিক্ষিত। বাঙ্গালা, ইংরাজি ও সংস্কৃত ত' ভাল রকম জানিতেনই, তদ্ব্যতীত লাটিন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, স্পাণিস, ইটালিয়ান আদি অনেকগুলি ভাষা জানিতেন। শিক্ষাই তাহার জীবনের প্রধান ব্রত। তিনি লোক মন্দ ছিলেন না,—উদার প্রকৃতি, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী ছিলেন। ইঞ্জিনিয়রিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী চাকরী লন। বাল্যাবস্থায় খুব মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল ও আত্মীয়-স্বজনের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, কিন্তু ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোবৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত না হইয়া সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। তাহার বাল্যকালের উদারতা ক্রমে সঙ্কীর্ণতায় পরিণত হইল।

রাধানাথের বয়োবৃদ্ধির সহিত মনোবৃত্তির অপকৃষ্টতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ তাঁহার পত্নী কাদম্বরী। কাদম্বরী বাল্যকালে পিতৃ-গৃহে অভাবক্লিষ্টা ছিলেন। তাঁহার পিতা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু অর্থ-কৃচ্ছ্রতা হেতু অভাবে তাঁহার স্বভাব সঙ্কীর্ণ হয়। তিনি সঙ্কীর্ণমনা ঈর্ষাপরবশ ও রূঢ়-স্বভাবা ছিলেন। ভগবান তাঁহাকে যথেষ্ট পরিমাণে ধন সম্পত্তির মালিক করেন নাই, সেই হেতু তিনি অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক দেখিলেই তাঁহার হিংসা ও দ্বেষ করিতেন এবং তাঁহার কোন সদ্-গুণই দেখিতে পাইতেন না।

তাঁহার কন্যা কাদম্বরীও তাঁহার দোষগুলির সম্পূর্ণরূপে উত্তরাধি-কারিণী হয়েন। বাল্যকালে অভাব হেতু তাঁহার স্বভাব বিশেষ ক্লিষ্ট

হয় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর স্বভাবের কোমলতা ও তরলতা হেতু স্বামীকে নিজের দলে টানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি নিজে অতিশয় অলস ছিলেন। এই অলসতা হেতু তিনি নিজে দেখিয়া শুনিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারিতেন না, পরের উপরে নির্ভর করিতেন। পাড়ার পতি-পুত্রহীনা বাল-বিধবা অর্দ্ধ বর্ষীয়সী কুটিলমনা ঠান্‌দিদির তিনি বিশেষ অনুরক্তা। ঠান্‌দিদি কাদম্বরীর স্বামীর অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনেক গুণ দেখিতে পাইলেন। কাদম্বরীর সে সব গুণ অন্য কেহই দেখিতে পাইত না, ঠান্‌দিদি নিজগুণে তাহা দেখিতে পাইতেন, এবং সেই জন্য তিনি কাদম্বরীর অনুগতা ও অনুগৃহীতা। সময়ে সময়ে তিনি কাদম্বরীর চুল আঁচড়াইয়া দিতেন, গা মুছাইয়া দিতেন, কতক কতক গৃহ কর্ম্ম করিয়া দিতেন। সেই সঙ্গে কাদম্বরীর শ্বশুরবাটীর আত্মীয়েরা সকলেই যে সঙ্কীর্ণমনা, তাহা তিনি কাদম্বরীকে জ্বলন্ত উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতেন; এবং সঙ্গে সঙ্গেই চাল, ডাল, কাপড়, সুপারি, খয়ের, দোক্তা ও পয়সা উপার্জ্জন করিয়া, কাদম্বরীর দান-শীলতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ঠান্‌দিদি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার আত্মীয় সকলেরই তাঁহাকে ঠকাইয়া অর্থ লাভের চেষ্টা। তাঁহারা তাহার অর্থের পূজা করে অর্থ সংগ্রহের জন্য; তাঁহার ত' পূজা করে না। তাহারা ভালবাসে তাঁহার অর্থ, তাঁহাকে ভালবাসে না। এইরূপ বুঝাইয়া দিয়া তিনি কাদম্বরীকে দানশীলা করিয়া দিয়াছিলেন, আর কাদম্বরী তাঁহার স্পষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন।

রাধানাথ ও কাদম্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভোলানাথ। ভোলানাথ বাল্য-কাল হইতে হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা ও খলতায় পরিপূর্ণ। মাতার যাহা কিছু দোষ ছিল, সে সমস্তই তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলেন। শুধু মূল ধন নয়, সুদ ও আসল সমেত পাইয়াছিলেন। তিনি যদি শুধু

হিংসুক ও খল হইতেন, তাহাতে তত বেশী অমঙ্গল হইত না ; অধিকন্তু তিনি খুব চতুর ও মেধাবী ছিলেন। একে খল ও হিংসুক, তাহার উপর চতুর ও মেধাবী—এ'দুয়ের সমন্বয়ে, তিনি সত্য ও সদ্-গুণের একটি প্রবল শত্রু হইয়া শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। হিংসা, দ্বেষ, কপটতা-বিষবৃক্ষের গোড়ায় মিথ্যা ও অধর্ম্মের সার দিয়া এবং মেধা ও কুটিলতার জল সিঞ্চনে বিষবৃক্ষটি শীঘ্র ফুলে, ফলে ও বীজে সুশোভিত হইল। মাতার দিক হইতে উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র—হিংসা, দ্বেষ, কপটতার বীজ ; তাহাতে মিথ্যা ও অধর্ম্মের সার ; আর মেধা ও কুটিলতার জল সিঞ্চনে বিষবৃক্ষ দেখিতে দেখিতে বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইল।

বাল্যকাল হইতে ভোলানাথ অধর্ম্মের আশ্রয়ে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতাদিগকে কোনরূপে সহ্য করিতে পারিতেন না ; ভগ্নীদিগকে তাঁহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার ভাই ভগ্নী যদি না জন্মিত, তাহা হইলে তাঁহার বাপ মার ভালবাসা, আদর ও যত্ন তিনি একাই পাইতেন, তাহার কোন বখ্‌রা-দার থাকিত না। তাঁহার পরবর্ত্তী ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার মাতার স্তন্য পানের প্রধান অংশীদার হইল। তিনি প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতা পিতার স্নেহের, ভালবাসার ও যত্নের একাধিপত্য পাইয়া-ছিলেন, তাঁহার অংশীদার ও বখ্‌রাদার কেহই ছিল না। যেমন আর একটি তাঁহার মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল, অমনি তাঁহার মাতাপিতারও আত্মীয় স্বজনের ভালবাসার স্নেহের ও যত্নের খানিকটা অধিকার সে কাড়িয়া লইল। ক্রমে যত সংখ্যায় বাড়িতে লাগিল তাঁহার অংশীদারও বাড়িতে লাগিল, তাহা কি তিনি সহ্য করিতে পারে ?

তাঁহার বাল্যকাল হইতে চেষ্টা ও অধ্যবসায় ছিল, কেমন করিয়া

তিনি তাঁহার মাতাপিতার ভালবাসার, স্নেহের ও যত্নের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইতে পারেন ; কেমন করিয়া তাঁহার হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে পারেন। তাঁহারা তিন ভাই ও দুই বোন—মিঠাই এর পাত্রে পাঁচটি মিঠাই আছে দেখিতে পাইয়া, ভোলানাথ চারিটি নিজে খাইয়া অবশিষ্টটি অপর চারিজনকে বাঁটিয়া দিয়া মাতার কাছে প্রচার করিলেন যে, ৫টা মিঠাই পাত্রে ছিল তাহা তাহারা পাঁচ ভ্রাতা ও ভগ্নীতে ভাগ করিয়া খাইয়াছে। মা ভাবিলেন, ছেলে কত সুবোধ ও সৎপ্রাণ, পাঁচটি মিষ্টান্ন একা না খাইয়া বাঁটিয়া খাইয়াছে। পিতার কাণেও এই কথা পৌঁছিল। পিতা আপনাকে ধন্য মনে করিলেন এবং পত্নীর সহিত এক বাক্যে পুত্রের সদন্তঃকরণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ভোলানাথ দেখিলেন এ ত' খুব মজা, একটা মিছা কথা গুছাইয়া বলিতে পারিলে অন্যায় করা যায় আর সততার জন্য প্রশংসাও লাভ পাওয়া যায়। এ ত' খুব উত্তম পন্থা। অতএব তিনি স্থির করিলেন, এই পন্থাই অবলম্বনীয়। আর ভাই ভগ্নীরা দেখিল, ভোলানাথ দুর্দ্দান্ত, মা বাপেরও প্রিয়, মনে করিলে সে পাঁচটাই খাইয়া ফেলিতে পারিত, তাহা না হইয়া তাহারা যে একটার বখ্‌রা পাইয়াছে, সেই ভাল।

একদিন তাঁহার মাতা ক্যাশবাক্সের চাবী দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভোলানাথ টের পাইয়া তাহা হইতে আড়াই টাকা বাহির করিয়া লইলেন ; পরে একটি ভ্রাতা ও ভগ্নীকে ডাকিয়া মার খোলা বাক্সটী দেখাইলেন। তাহাতে দু একটি পুতুলও ছিল। ভাই ভগ্নীদের লইয়া দুই এক মুহূর্ত্ত খেলা করিয়া, পরে মাতাকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার একটি ভাই ও ভগ্নী মাতার বাক্স খুলিয়া খেলা করিতেছে। মাতা তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখেন, তাঁহার বাক্স খোলা, দুটি সন্তান বাক্সের পুতুল লইয়া খেলা করিতেছে। বাক্স খুলিয়া

দেখেন আড়াই টাকা কম। যে ছেলেটি ও মেয়েটি বাক্স হাটকাইতে-ছিল, তাহাদিগকে দুই একটি চড় চাপড় দিলেন ও স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন তাহারাই তাঁহার টাকা লইয়াছে, কিম্বা কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে। ভোলানাথ মনে মনে খুব খুসী। দেখিলেন, একটা মিথ্যা বলিলে অনেক সময় আশু বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, এবং প্রশংসাভাজনও হওয়া যায়। এইরূপে ছোট ছোট মিথ্যা বলিয়া, দুষ্কর্ম্ম করিয়া, ভোলানাথ ভাই বোনকে তিরস্কার-ভাজন করাইতেন, আর নিজেরও বিশেষ সুবিধা করিয়া লইতেন। ভোলানাথ ক্রমান্বয়ে এইরূপ ছোট খাট পাপের আশ্রয়ে সুগম পাপ পথে প্রবেশ করিয়া, আশু সুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন। আর নিজের ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশের জন্য বিষবৃক্ষ রোপণ করিলেন। অধর্ম্মে কখনও সুখ হয় না, তাহা তিনি একেবারেই বোধগম্য করিতে পারিলেন না।

এরূপে যখন ভোলানাথের বয়স ১৭ বৎসর, তখন তাঁহার দেড় বর্ষ বয়ঃ কনিষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ভোলানাথের বাটীর কাছেই কলেজ। বিদ্যা শিক্ষার সুবিধার জন্য ভোলানাথের পিতা নিজ জামাতা হরিচরণকে রামনারায়ণপুরের কলেজে ভর্ত্তি করিবার বন্দোবস্ত করেন। শালা ভগ্নীপতি দু'জনেই কলেজে ভর্ত্তি হইল। কলেজে পড়িতে লাগিল,—ভোলানাথ, ভোলানাথের মধ্যম ভ্রাতা আদ্যনাথ, আর ভগ্নীপতি হরিচরণ; হরিচরণ অতি ভাল মানুষ।

দুষ্টের কাছে ভাল মানুষের বাপ মা আঁটকুড়া। তাহার ভ্রাতা তিনবৎসর পরে পৃথিবীতে আসিয়া তাহার পূর্ব্ব অর্জ্জিত স্বত্বের বখ্‌রা লইয়াছে, অতএব সে অনুগ্রহ করিয়া তাহার ভ্রাতাকে যাহা দেয় ভ্রাতার তাহাই লাভ। তাহার ভগ্নীপতির বাপ মা আছে, ভোলানাথের মাতাপিতার অর্থে তাহার কোন স্বত্ব বা স্বামিত্ব নাই; তবে সে দয়ার পাত্র

এই পর্য্যন্ত। অতএব তাহাকে যাহা দেওয়া যায় তাহাতেই তাহার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। তাঁহার পিতৃধনে হরিচরণের কোনরূপ অধিকার নাই। সে দয়ার পাত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ভোলানাথ কার্য্য করিতে লাগিলেন।

রাধানাথ বিদেশে চাকরি করেন, আর মাসে মাসে পুত্রদ্বয় ও জামাতার খরচের জন্য টাকা পাঠাইয়া দেন। তিনি ভাবেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বড় হইয়াছে, অতএব তাঁহার আর ভাবনা কি? সে মেধাবী সৎ-চরিত্র, সত্যবাদী ও নিঃস্বার্থপর। তাহার উপস্থিতিতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ও জামাতার কোনই কষ্ট হইবে না। রাধানাথ মাসে মাসে ভোলানাথের কাছে টাকা পাঠান আর ভোলানাথ চারিভাগের তিন ভাগ খরচ করিয়া বাকি সিকি নিজের হাতে রাখেন, আর পিতাকে ক্রমান্বয়ে পত্র লিখেন, জামাইবাবু কুটুম্ব, তাহার সুবিধা বিশেষ করিয়া দেখিতে হয়। তাহা না হইলে তিনি কি মনে করিবেন। আর তাঁহার ভ্রাতা ছোট, তাহারও সুবিধা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া দেখিতে হয়। ভোলানাথ তাঁহার নিজের জন্য কিছুই গ্রাহ্য করেন না, কিন্তু তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এবং তাঁহার পিতার সুনামের জন্য বেশী করিয়া খরচ করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহা না হইলে ভাল দেখায় না। সেই জন্য তাহার পিতা শতকরা ২৫৲ টাকা খরচ বেশী পাঠাইতে লাগিলেন।

ভোলানাথ বামুনকে বুঝাইয়া দিলেন, টাকা তাঁহার বাপের, তিনি সেই বাপেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র, জামাইবাবু ত পরের ছেলে। আর তিনি নিজে খারাপ জিনিস একেবারেই খাইতে পারেন না। তাঁহার ভ্রাতার ও জামাইবাবুর ভাল মন্দে কিছু আসে যায় না,. আর বিশেষতঃ ছাত্রজীবনে একটু কষ্ট-সহিষ্ণু হওয়া ভাল। জামাই-

বাবু এখন হইতে যদি ভাল ভাল জিনিস খাইয়া জিহ্বা খারাপ করে, চিরকাল ত তাহার পিতা জামাইবাবুকে খাওয়াইবেন না, তখন তাহার বিশেষ কষ্ট হইবে। তাই তাহার হুকুম মত ও তাহার ভয়ে বামুনঠাকুর ভোলানাথকেই মাছের ডিম, মাছের মুড়া, দুধের সর ও ভাল ভাল তরকারী দিত; আর অবশিষ্ট অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টতর খাদ্য তাহার ছোট ভাইকে ও জামাইবাবুকে দিত। ভোলানাথ বাপকে প্রত্যেক চিঠিতেই লিখিতেন যে তাঁহার ভ্রাতার ও জামাই-বাবুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে, ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্য তাহাদিগকে দিয়া নিজে অপেক্ষাকৃত মন্দ দ্রব্য খান। তা তিনি তাহার কর্ত্তব্যই করেন, তাহার জন্য তাঁহার কোন কষ্টই নাই। এ খরচে এর চেয়ে ভাল আর হইতে পারে না।

একবার তাহার ভগিনী তাহার শ্বশুরবাটীতে। পিতা রাধানাথ, ভোলানাথের কাছে একশত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন আর লিখিয়া-ছিলেন সে যেন সেই টাকা তাহার ভগ্নীকে দিয়া পাঠায়। ভোলানাথ ২০৲ টাকা নগদ ও দশ টাকার জিনিস পাঠাইয়া দিয়া পিতাকে চিঠি লিখিলেন—"বাবা তোমার প্রেরিত টাকা পাইয়াছি। তাহার মধ্যে একশত টাকা আপনি সজনীকে দিতে বলিয়াছেন (সজনী ভোলানাথের ভগ্নী)। বাবা, আপনার হুকুম মত আমি তাহাকে একশত টাকার পরিবর্ত্তে একশ পাঁচ টাকা দিয়াছি; ২০৲ টাকা নগদ দিয়াছি, বাকি ৮৫৲ টাকার জিনিস-পত্র দিয়াছি, সব নগদ টাকা দেওয়া অপেক্ষা কতক টাকার জিনিস-পত্র দেওয়া ভাল। বিশেষতঃ তাহাদের সাংসারিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে সজনী ভাল জিনিস খাইতে পায় না; সেই জন্যই জিনিস কিনিয়া দিয়াছি। সে ত খাইতে পাইবে আর কুটুম্বিতা হিসাবে দেখিতে শুনিতেও ভাল। আপনার ১০০৲ টাকার

হুকুম ছিল; কিন্তু আমি পাঁচ টাকা বেশী দিয়াছি। সজনীকে আমরা না দেখিলে কে দেখিবে। আশা করি খরচ বাহুল্যের জন্য আপনি রাগ করিবেন না। আপনার অভাব কিসের, আমাদের নিজের কষ্ট আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু আমার বাল্যকাল হইতে সুখে পালিত, সজনীর কষ্ট আমি একেবারেই সহ্য করিতে পারি না। আগামী মাসে যখন টাকা পাঠাইবেন তখন ৫৲ টাকা বেশী পাঠাইবেন। আমি কষ্টে স্বষ্টে কোনপ্রকারে ধার কর্জ্জ করিয়া মাসটা চালাইয়া দিব। প্রাণের আবেগে ৫৲ টাকা বেশী খরচ করিয়াছি, দোষ ক্ষমা করিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মণিকাঞ্চনের যোগ

যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন হয়। উমেশচন্দ্র ইষ্ট-আফ্রিকার ডাক্তার। তিনি ইষ্ট-আফ্রিকায় কর্ম্ম করিতেন এবং সপরিবারে সেখানে বাস করিতেন। লোকে বলে জল হাওয়ার গুণ দোষে ও নিকটস্থ আনুষঙ্গিক অবস্থায় মনুষ্যের মনের গঠনের কোন তার-তম্য হয় না, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভুল। উমেশ ইষ্ট-আফ্রিকার পিনাল সেটেলমেণ্টের ডাক্তার। তাঁহার যে সব পুত্র কন্যা ঐ সময়ে ও ঐ স্থানে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের অবয়বের ও অঙ্গ সৌষ্টবের কোন বিভিন্নতা না থাকিলেও মানসিক বৃত্তিগুলি অতি নীচ, ও কদর্য্য, আর শরীর অপেক্ষা মন অনেক অধিক কদর্য্য। উমেশ ডাক্তার দূরদেশে গিয়া অনেক পয়সা করিয়াছেন। অতএব ভোলানাথের ও তাহার মাতার আগ্রহাতিশয্যে উমেশবাবু এই পিনাল সেটেলমেণ্টে জাতা কন্যার সহিত মহাসমারোহে ভোলানাথের বিবাহ দিলেন।

উমেশবাবুর, কন্যার নাম ধূমাবতী। ভোলানাথ ও ধূমাবতীর সম্মিলন মণিকাঞ্চনের যোগ, সোণায় সোহাগা, দুধে চিনি, ফ্লানেলের পাঞ্জাবীতে উৎকৃষ্ট শালের উত্তরীয়, শিল্কের মোজার উপরে ক্রোম-লেদারের পামসু। অগাধ ভূ-সম্পত্তির সহিত সুন্দরী বয়স্থা কন্যা, উৎকৃষ্ট পোলাও এর সহিত উৎকৃষ্ট মটন-কারী।

ধূমাবতী আজকালকার বৃথা নামের দিনের ফল নয়। আজ

কাল মিস-মিসে কৃষ্ণবর্ণ কন্যার বাপ মা তাহার নাম রাখেন স্বর্ণ-কুমারী। অতিশয় কুরূপা ও নোঙ্গরা কন্যার নাম হয় আতর, গোলাপ, চামেলী। কোটরগতচক্ষুযুক্তা কন্যার নাম হয়—পদ্মপলাশ-লোচনা! কিন্তু ধূমাবতীর নাম অসার্থক নাম নয়। তাঁহার নামের সার্থকতা ছিল,—তাঁহার সংসর্গে অতি সুন্দর শুভ্র বস্তুও ধূম্রবর্ণ হইত। তিনি নামে ও কর্ম্মে যথার্থ ধূমাবতী ছিলেন। হিংসা দ্বেষ কুটিলতা একত্র করিয়া তাহারই সারাংশে তাঁহার মনের গঠন হইয়াছিল।

ভোলানাথ ধূমাবতীর কাছে অল্পবয়স্ক ছাত্র, ধূমাবতীর কাছে ভোলানাথের শিক্ষার অনেক বাকী। তাহা দেখিয়া ও জানিয়া ধূমাবতী এসব বিষয়ের শিক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করিলেন। তাহার স্বামীকে তিনি মাজিয়া ঘসিয়া সাফ করিয়া লইবেন, নিজেই গড়িয়া লইবেন। তিনি বাহিরের লোকের সাহায্য চান না। তিনি যদি সে কার্য্য নিজে করিতে না পারেন, তবে তাঁহার জন্মই বৃথা, কর্ম্মই বৃথা, আর তাঁহার নামই বৃথা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মানুষ না পিশাচ

শিবনাথ, ভোলানাথের কনিষ্ঠ খুল্লতাত। অবস্থা তত ভাল নয়, বিশেষ উপায় করিতে পারেন না। বিশেষতঃ অভাবে পড়িয়া তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথের নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়াছিলেন। রাধানাথ শিবনাথকে সাহায্য করিয়াছিলেন, ধার বলিয়া দেন নাই, নির্ধন ভাইকে সাহায্য করিয়াছিলেন মাত্র। কথা-প্রসঙ্গে ভোলানাথ এ কথা শুনিয়াছিলেন। শুনিবার পর হইতেই তিনি সেই টাকার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শিবনাথের মরণাপন্ন অবস্থা, ব্যারাম জ্বর বিকার। অর্থের অভাব, চিকিৎসার অসুবিধা, অর্থের স্বল্পতা হেতু সেবা ও শুশ্রূষার লোক জনের অভাব। ভাল চিকিৎসকের অভাব, ভাল পথ্যের অভাব, ভাল শোওয়া, ভাল খাওয়া, প্রত্যেক জিনিসের অভাব ও অসুবিধা।

অর্থ অনর্থের মূল। এক অর্থের অভাবে পৃথিবীর অনেক প্রয়োজনীয় ও ভোগ্য বস্তুর অভাব। যদিও অর্থে মানুষকে মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারে না, শরীরকে রোগের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারে না, মানুষকে উচ্চ করিতে পারে না, ভগবৎ-প্রাপ্তির সাহায্য করিতে পারে না, সেই অর্থ কিন্তু অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটাইতে পারে। মুদী যখন আর অধিক 'উটনা' দিতে

নারাজ, অর্থ তাহাকে রাজী করিতে পারে, ভৃত্যকে কাজ করাইতে পারে, ভাল চিকিৎসক আনিয়া দিতে পারে, ভাল বাটী যোগাড় করিয়া দিতে পারে এবং অনেক সাংসারিক অভাব পূরণ করিতে পারে। অর্থ অভাবে শিবনাথের স্ত্রী রুগ্ন স্বামীকে লইয়া সকল প্রকার অভাবজনিত বিপদে পড়িলেন। তিনি ভোলানাথকে ডাকাইয়া বর্ত্তমান বিপদের কথা জানাইলেন। তাঁহার খুল্লতাত তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন।

খুল্লতাত। বাবা, ভোলানাথ, আমার ঘোর বিপদ। তোমার খুড়ী মা একা, আমাকে দেখিবার কোন লোকজন নাই। অর্থ নাই যে লোকজন নিযুক্ত করি; ভরসা—তোমার বাপ আর তুমি। তোমার বাপকে লিখিয়া ইহার বন্দোবস্ত কর, তোমার খুল্লতাত ভাই ভগ্নীগুলি অনাথা।

ভোলানাথ। কাকাবাবু, তাহার আর ভয় কি? যতদিন আমি আছি, আপনার কোন ভয় নাই। তবে কি জানেন, বাবা আপনাকে অনেকগুলি টাকা দিয়াছেন, তিনি আর টাকা দিতে রাজি হবেন কি না সন্দেহ। তিনি প্রায়ই বলেন, ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই।

খুল্লতাত। বাবা, তবে কি হবে? তোমরা থাকিতে কি আমি অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মরিব, এই কি পরিণাম! তোমার বাপও ত' আমার সহোদর ভ্রাতা, এক বাপের ঔরসে এক মায়ের গর্ভে জন্মিয়াছি। তাঁহার এখন অবস্থা ভাল, মনে করিলেই সাহায্য করিতে পারেন। বাবা, তিনি নিজের ছেলে মেয়েদের জন্য কত খরচ করিতেছেন, আমি ত' তাঁহার বাপের ছেলে, আমার এ বিপদে সাহায্য করিবেন না—এ কখনও সম্ভব? তোমার বাপকে লিখিলে চিঠির জবাব পাই না, শুনিতে পাই দেশের যাবতীয় বিষয়ে তোমার

মত লইয়া তিনি কার্য্য করেন। তুমি অনুরোধ করিলেই তিনি কিছু করিবেন নতুবা আমাদের আর উপায় নাই।

ভোলানাথ। কাকাবাবু, এক উপায় আছে। জিনিসটা সামাজিকতা হিসাবে দেখিতে নোঙ্গরা, তা সেটা আমাদের পক্ষে, আপনার পক্ষে নয়। বাস্তবিক তাহাতে কিছু দোষ নাই।

খুল্লতাত। তা বাবা বল। তুমি যা বলিবে, আমার পক্ষে নোঙ্গরা হইলেও আমি করিব। আমি অনাহারে বিনা চিকিৎসায় ও বিনা পথ্যে মরিতে বসিয়াছি, আমার পক্ষে পৃথিবীর সহিত সম্পর্ক স্বল্প দিনের জন্য। আমার আবার ভাল মন্দ কি ?

ভোলানাথ। দেখুন, বাবা একটু হিসাবী। আপনি একটি কাজ করুন, তাহা হইলে আমি বাবাকে রাজি করিতে পারিব।

খুল্লতাত। কি বাবা, বল বল।

ভোলানাথ। আর কিছুই নয়। কিছু দিনের জন্য আপনার বসত বাটীর অংশটা আমাকে দান পত্র লিখে দিন। তাহাতে বলুন, আমার প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা ও স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, আর সেবা শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট হইয়া আপনি পুত্র-কন্যা ও স্ত্রী সত্ত্বেও আমাকে দান করিতেছেন। আমি কিছুদিন বাদে আবার আপনাকে আর, ঈশ্বর না করুন, যদি আপনার ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়, আপনার পুত্রদ্বয়কে "স্বাভাবিক ভালবাসা ও স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া" পুনরায় দান-পত্র লিখিয়া দিব। ইহা যদি প্রকাশ পায়, লোকে আমাদেরই দোষ দিবে; আপনার কিছুই নয়। ইহাতে ক্ষতি কিছুই নাই; লেখা পড়ার কিছু খরচ, তা সে সমস্ত আমি নিজে থেকেই দেব। ইহাতে আপনার কোন লোকসানই নাই, আর আমার কোন লাভও নাই। এরূপ করা, কেবল বাবাকে বুঝাইবার জন্য। আমি তাহাকে বুঝাইতে পারিব

যে, আপনি যেমন বাবার কাছ হইতে কিছু টাকা লইয়াছেন, তেমনি আমাকে ভদ্রাসন বাটীর অংশ লিখিয়া দিয়াছেন। আপনার টাকা আর বাবার টাকা দুই এক উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত। আমরা বাবার যেমন স্নেহের পাত্র, আপনারাও তেমনি স্নেহের পাত্র। তাহা হইলে বাবা নিশ্চয় খুসী হইবেন, আপনাকেও সাহায্য করিবেন।

খুল্লতাত। যদি আমি মারা পড়ি, তাহা হইলে তোমার কাকিমার ও ছেলেদের কি হবে?

ভোলানাথ। কাকাবাবু, আমি জীবিত থাকিতে খুড়ীমার ও ভাই বোনদের ভাবনা কি? আপনি ত' সত্য সত্যই আমাকে দান করিতেছেন না; আর আমিও সত্য সত্যই সেই দান গ্রহণ করিতেছি না।

খুড়িমা তাহাদের সমস্ত কথাই শুনিলেন, আর তাহা বোধগম্য করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মহা অভাবের সময়ে উপায় কি? একদিকে অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় এবং বিনা পথ্যে স্বামীর মৃত্যু, আর অপর দিকে বাটীর অংশ লিখিয়া দেওয়া। ভোলানাথ ত' তাহার পুত্রের সমান, তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, সে কি বেইমানি করিবে? কখনও সম্ভব নয়। সে কেবল তাহার বাপকে বুঝাইবার জন্য এই রকম করিতেছে। তাহাদের দুধের গোপাল ভুলু ত' তাহাদেরই ছেলে, সে কখনও অমানুষিক পিশাচ হইতে পারে না। এরূপ ভাবিলেও তাহার পুত্র-সম ভোলানাথের অকল্যাণ করা হয়।

খুড়ীমা কহিলেন—তা এ ত ভাল কথা। আমার রামনাথ, শ্যামনাথই বা কে, আর ভোলানাথই বা কে। ভগবান না করুন, আমাদের অবর্ত্তমানে ভোলানাথ আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র; সেই ত' তাহার

ছোট ভাই বোনগুলিকে মানুষ করিবে। ভোলানাথ যাহা বলিতেছে তাহাই হউক।

ভোলানাথ। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) বাবাকে রাজী করিতেই হইবে। সেই জন্যই ত' এরূপ করিতে হইতেছে। তাহা না হইলে এই যে সব দলিল-দস্তাবিদের খরচা, সে টাকাটা ত' আপনাদের অনেক কাজে লাগাইতে পারিতাম।

অতঃপর এইরূপ করাই স্থিরীকৃত হইল। তাঁহাদের পুত্র-সম ভোলানাথ তাঁহার ভাতার খরচ হইতে নিজে না খাইয়া, খুড়ীর হাতে ৫০৲ টাকা দিয়া গেলেন, আর বলিয়া গেলেন, চারিদিনের মধ্যে তিনি তাঁহার পিতাকে সকল কথা লিখিয়া কিছু বেশী টাকা আনাইয়া দিবেন। তবে তাঁহার পিতাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য দান-পত্রটি রেজেষ্ট্রি করিয়া তাহার একটি নকল পাঠাইয়া দিতে হইবে। তাঁহার খুল্লতাতের সুবিধার জন্য ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, লেখা পড়াটি আগামী কল্য সহি ও রেজেষ্ট্রি করিতে হইবে। আর রেজেষ্ট্রির পরদিন হইতেই তাঁহার খুল্লতাত ও খুল্লতাত পত্নী প্রত্যেক মাসের শেষে একটি করিয়া ভাড়ার বিল ভোলানাথের নিকট হইতে লইবেন। অবশ্য বিলে ভাড়ার টাকার কথা লেখা থাকিবে, কিন্তু সত্য সত্যই কোন টাকা দিতে হইবে না। তাহারা ত' আর ভাড়াটিয়া নন, তবে সেটা খালি আপাততঃ তাহার পিতাকে রাজি করিবার জন্য। যেমন কথা তেমনি কাজ। লেখা পড়া সহি ও রেজেষ্ট্রি সবই হইয়া গেল। লেখা পড়ার জন্য উকীলের ত' অভাব নাই। দেবতা চাও তাহাও উকিলদের মধ্যে অনেক পাবে; আর দানবের ত' অভাব নাই।

ভোলানাথ বাপকে চিঠি লিখিলেন।

পরম পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয়,—

আমাদের সমূহ বিপদ, পূজ্যপাদ খুল্লতাত মহাশয় রোগ-শয্যায় শায়িত। আমি খবর পাইয়াই সেইদিন হইতেই তাঁহার রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া রোগসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। আপনি এখানে নাই। অতএব যাহা কিছু কর্ত্তব্য সমস্তই আমি নিজে করিতেছি। আমার মধ্যম ভ্রাতা (আগুনাথ) ছেলে মানুষ। বিশেষতঃ সে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বোঝে না ; ননীর পুতুল সে, কষ্ট সহ্য করিতেও পারে না। যাহা হউক, আপাততঃ আমার এক বন্ধুর নিকট হইতে দুই শত টাকা কর্জ্জ লইয়া রোগীর পথ্য, চিকিৎসাব্যয় ও সংসারাদি খরচ চালাইতেছি। কাকা-বাবু আমাদের উপর বা আপনাদের উপর রত হ'ন আর নাই হ'ন, তিনি ত' আমাদের পূজ্যপাদ পিতার সহোদর ভ্রাতা, অতএব আমার প্রণম্য ও সেব্য। সেই জন্য যতদূর সম্ভব অর্থব্যয়ে ও প্রাণপণে, শারী-রিক পরিশ্রমে তাঁহার সেবা করিতেছি। তিনি আমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বাটীর অংশটি আমাকে লিখিয়া দিয়াছেন। আমি কিছুতেই এ লেখাপড়ায় রাজি হই নাই। বলিয়াছিলাম, যদি একান্তই দিবেন ত' পূজ্যপাদ পিতার নামে লিখিয়া দেন, তাহা তিনি কিছুতেই রাজি হইলেন না। ডাক্তারেরা বলিলেন তাঁহার যেরূপ ব্যাধি তাহাতে তাঁহার কথায় বাধা দিলে রোগ বাড়িতে পারে, এই ভয়ে আমাকে রাজি হইতে হইল। অবস্থা বিবেচনায় আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। খুল্লতাত আরোগ্যলাভ করিলে তাঁহাকে যেমন করিয়া হউক রাজি করিয়া সম্পত্তি ফিরাইয়া দিব। আপনি পত্রপাঠমাত্র আমাকে ৫০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিবেন। ২০০৲ টাকা বন্ধুর দেনা শোধ ও বাকি ৩০০৲ টাকা রোগীর রোগের খরচ। কর্ত্তব্য করিতে গেলে জীবনে

অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, কর্ত্তব্য পালন সকলের জীবনের মূল মন্ত্র হওয়া উচিত। কাকাবাবুর কাছে এখন রাত জাগিতে হইবে, অতএব আজ আর অধিক লিখিতে পারিলাম না।

"জামাই বাবুকে লইয়া মহা বিপদ; কিছুতেই আর তাহার মন পাওয়া যায় না; তাহাকে ও খোকাকে যাহা কিছু ভাল খাবার ভাল বিছানা ও ভাল কাপড় জামা দিয়া যৎসামান্য নিজে খাই ও ব্যবহার করি। জীবন কর্ত্তব্যময়; আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, ভগবান্ আমার মনে বল দিন; চিরকাল যেন কর্ত্তব্যের পায়ে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। ইতি—

আপনার স্নেহের পুত্র।"

পত্র পাইয়া পিতা আত্মহারা হইলেন। কি কর্ত্তব্যপরায়ণ সুপুত্র! ভোলানাথ তাঁহার বংশের তিলক; তাঁহার বংশের ও তাঁহার নিজের সুনামের খরস্রোত নদ। তাড়াতাড়ি কাদম্বরীকে ডাকিলেন, আর পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলেন। আর দলিলের জবানিও শুনাইলেন। শুনিয়া কাদম্বরী বলিলেন, তা হবে না ত' কি, ওত' আর তোমাদের বংশের খল কপটতা পায় নাই। আমার মা, বাপ, ভাই, বোনের— আমার বংশের উদারতা ও উচ্চ মন পাইয়াছে। ওর যে আমার গর্ভে জন্ম, এরূপ না হওয়াই আশ্চর্য্য।

রাধানাথ। আমার মেজটা ভোলানাথের চেয়ে ত' তিন বৎসরের ছোট। কিন্তু সেটা ত' ওর মত নয়, আর জামাইটা ত' পরের ছেলে, তার কথা ছেড়ে দাও।

কাদম্বরী। তা ও শাস্ত্রেই আছে "জ্যেষ্ঠ পুত্র মায়ের গুণ পায়, মধ্যম পুত্র বাপের গুণ পায়।"

রাধানাথ। তা এ শাস্ত্র পেলে কোথায়? আমি ত' আগে জানিতাম না।

কাদম্বরী। তুমি ত' কেবল ইঞ্জিনিয়ারিং বই লইয়া ব্যস্ত। শাস্ত্র পড়িলে বা কবে আর শিখিলেই বা কবে? স্বয়ং ঠান্‌দিদি সেদিন বলিলেন, ওপাড়ার ভট্টাচার্য্য মশায় এ কথা বলিয়াছেন। ঠান্‌দিদি ত' আর তোমার ভগ্নী বা ভ্রাতৃবধূ নন যে মিথ্যা বলিবেন।

যাহা হউক রাধানাথ সেই দিনই ভোলানাথকে ৫০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিলেন। আর তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন।

ভোলানাথ টাকা পাইয়া ১৫০৲ টাকা কাকাবাবুকে দিলেন। বাকি ৩০৭৲ টাকায় তাঁহার স্ত্রী ধূমাবতীর জন্য ব্রেসলেট তৈয়ারী করিতে দিলেন। বাসা খরচের টাকা হইতে ব্রেসলেটের বাণির টাকা দিলেন। ধূমাবতী ব্রেসলেট পাইয়া তাঁহার শ্বাশুড়ীকে বুঝাইয়া দিলেন, তিনি অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তাঁহার মাতার কাছ থেকে এই ব্রেসলেট জোড়াটি আদায় করিয়াছেন। শ্বাশুড়ী বধূমাতার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য, খুল্লতাতের সেবা শুশ্রূষার জন্য ভোলানাথ তাঁহার অমূল্য সময়ের এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করেন নাই বা তাঁহার করিবার ইচ্ছাও ছিল না। আর সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া, সে ত' হইতেই পারে না; যদিও সম্পত্তির মূল্য অনেক বেশী, অসময়ে কে টাকা দেয়? সময় বিশেষে এক টাকার মূল্য ২৫৲ টাকা। খুল্লতাতের জন্য সে যথেষ্ট করিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যেমন দেবা তেমনি দেবি

আজ পাঁচ বৎসর হইল, ভোলানাথ ও ধূমাবতীর বিবাহ হইয়াছে। ধূমাবতী ভোলানাথের লাগাম সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে লইয়াছে। ভোলানাথ এখন রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়। তাঁহার নিজের অস্তিত্ব একেবারেই লোপ পাইয়াছে। তিনি ধূমাবতীর কথায় উঠেন আর বসেন। ধূমাবতী লালকে কালো বলিলে, ভোলানাথ কালই দেখেন, লাল একেবারেই দেখিতে পান না। ধূমাবতী যদি ধর্ম্মপরায়ণা, দয়ার্দ্রচিত্তা, সত্যবাদিনী, পর-দুঃখ-কাতরা, নর-নারায়ণে সেবারতা হইতেন, তাহা হইলে হয় ত' ভোলানাথের জীবন অন্য রকম হইত।

তাঁহার বুদ্ধি ছিল, ধর্ম্মশিক্ষাবিহীন বিদ্যা ছিল। মেধা ছিল, সুযোগ ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী ছিল ধূমাবতী। সে খল, কপট, অলস, অধর্ম্ম-পরায়ণ, মিথ্যাবাদী ও স্বার্থপর। ধূমাবতীর দোষগুলি সম্পূর্ণরূপে ভোলানাথকে আশ্রয় করিয়াছিল। অলসতা ও কর্ম্মবিমুখতা হেতু যে কেহ তাঁহাকে পাপের সরল ও মসৃণ পথ দেখাইয়া দিত, তিনি তাহাই অবলম্বন করিতেন। পুণ্যের ও কর্ত্তব্যের কণ্টকময় কষ্টসাধ্য পথে চলিতে যে চেষ্টা, ক্লেশ, অধ্যবসায় ও মনোযোগের প্রয়োজন তাহা তাঁহার একেবারেই ছিল না। যে পথে ধূমাবতীর চলিবার অসুবিধা, ভোলানাথের সে পথ একেবারেই সুবিধাজনক নয়। ধূমাবতী ভোলানাথকে বুঝাইয়াছিলেন, অর্থই এ জগতে

সকল সময়ে সকল অবস্থায় সেব্য। অর্থে হয় না কি? মূর্খ বিদ্বান্ হয়; বোকা চালাক হয়; কুরূপ, রূপবান্ হয়; ছোট বড় হয়; অমানুষ মানুষ হয়; কৃপণ দাতা হয়। অর্থের অধিকার ত' সকল সময়েই সুবিধাজনক। অর্থের অধিকারের মিথ্যা প্রবাদও অনেক সময়ে সুবিধাজনক। তবে যেমন করিয়া পারে ভোলানাথকে প্রভূত অর্থের অধিকারী হইতেই হইবে,—সদুপায়ে পারে ত ভালই।

ভোলানাথ বিশেষ গবেষণার পর স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, ধূমাবতীর পরামর্শ বর্ণে বর্ণে সত্য। যদি তিনি ধনেশ্বর হইতে পারেন তবে তিনি লোক সমাজে সকল গুণের আকর হইবেন; যে সব গুণ তাঁহার একেবারেই নাই, লোকে তাঁহাকে সেইসব গুণে গুণবান্ দেখিবে। এক অর্থ, তাঁহার কর কবলিত হইলে সকল অনর্থের হাত হইতে তিনি মুক্তি পাইবে। লক্ষ্মীকে বাটীতে আনিতে পারিলে, তাহার পাছু পাছু সরস্বতী, গণেশ, কার্ত্তিক, দুর্গা সকলেই তাঁহার আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। অর্থই তাঁহার সেব্য, অর্থ হইলে আর সমস্তই হইবে। অর্থই তাঁহার পূজনীয়, ভজনীয়, বরণীয়, প্রার্থনীয়। অর্থই তাঁহার উপাস্য দেবতা।

ধূমাবতীর সাহায্যে ভোলানাথ তাঁহার গন্তব্য পথ ঠিক করিয়া লইলেন। যেমন পথ ঠিক হইয়া গেল, অমনি তিনি অনন্যমনে একদৃষ্টি হইয়া দ্রুতপদে সেইপথে ধাবিত হইলেন। এই সময়ে ভোলানাথ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন!

ধূমাবতী সিদ্ধান্ত করিলেন, অধিক লেখাপড়া নিষ্প্রয়োজন, আর অনেক সময়ে বিপুল অর্থাগমের অন্তরায়। তাই তিনি পরামর্শ দিলেন আর অধিক লেখাপড়ার প্রয়োজন নাই। সেই অবধি ভোলানাথ সরস্বতীকে বিজয়া-প্রণাম করিলেন। ধূমাবতী ভোলানাথকে পরামর্শ দিলেন 'দেখ, আজকাল

কল্‌কব্‌জা ইত্যাদিতেই পয়সা। কোন রকমে কিছু জিনিষ তৈয়ারীর কল কারখানা তৈয়ার করিতে পারিলেই অর্থপ্রাপ্তি স্থিরনিশ্চয়। কারখানায় উৎপন্ন জিনিষ ভাল হউক, মন্দ হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। তারপর সেই কারখানাকে কেন্দ্র করিয়া একটি লিমিটেড্‌ কোম্পানি করা; বাশ্‌, তাহা হইলেই কার্য্য ফতে। তবে বাঙ্গালায় কল কারখানার বড় সুবিধা নাই। কলের স্থিতিস্থান বাঙ্গালার বাহিরে হওয়া চাই। কারণ বাঙ্গালার ভিতরে হইলেই অনেকে কারখানার যথার্থ অবস্থা জানিতে পারিবে, আর অর্থাগমের তত সুবিধা হইবে না। কারখানার স্থিতিস্থান বাঙ্গালার বাহিরে, শেয়ার বিক্রয় কলিকাতায়। তবে ত কাজ খুব জোরে চলিবে। বাঙ্গালা নাম একেবারেই নয়, অন্ততঃ কতকটা বদলাইয়া দিতে হইবে। যদি চট্টোপাধ্যায় নামে কেহ কোং করে, ত অন্ততঃ তাহাকে চট্টো এণ্ড কোং বলিতে হইবে। বাঙ্গালীর উপর বাঙ্গালীর এমনই অগাধ বিশ্বাস; আর ঠকাইতে হইলে বাঙ্গালার বোকা অপেক্ষা ঠকাইবার অতি উত্তম খাদ্য আর কুত্রাপি নাই।'

ইহাই যুক্তি সঙ্গত ভাবিয়া ভোলানাথ একটি ম্যাচ্‌ফ্যাক্‌টারি খুলিলেন। নাম দিলেন "অল ইণ্ডিয়া ম্যাচ্‌ফ্যাকটরি", গাল ভরা নাম না হইলে লোক ঠকাইবার সুবিধা হয় না। কারখানার স্থান ঠিক হইল বিন্ধ্যাচল। কি কারণে বিন্ধ্যাচলধাম স্থিরীকৃত হইল তাহা পরে জ্ঞাতব্য।

তাঁহার পিতা সরকারের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া রামনারায়ণপুরে আর ফিরিলেন না। না ফিরিবার কারণ অনেক।

কাদম্বরী দেখিলেন রামনারায়ণপুরে তাঁহাদের আদিম বাস। সেখানে অনেক আত্মীয় আছে, পাড়াপ্রতিবেশী আছে। অনেক সময় সামাজিকতা হিসাবে অনেক আত্মীয় স্বজনকে দেখিতে হইবে। তাহাতে

কিছু খরচ পত্র আছে। আর তাহারা অনেক সময় সাহায্যের জন্য উত্ত্যক্ত করিতে পারে। সেইজন্য রামনারায়ণপুরে গিয়া তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে কাদম্বরী একেবারেই নারাজ। সেই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া বিন্ধ্যাচলধামে বাসই প্রশস্ত মনে করিলেন। অল্প খরচেই চলিয়া যাইবে আর হিন্দু তীর্থস্থানে থাকাও হইবে—আহার ঔষধ দুইই হইবে, একঢিলে দুটী পাখী মারা যাইবে।

এই স্থির করিয়া কাদম্বরী রাধানাথকে বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহাদের বয়স হইয়াছে, তাঁহারা হিন্দু। শাস্ত্রে বলে "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"; অতএব আর রামনারায়ণপুর যাওয়া একেবারেই শাস্ত্রনিষিদ্ধ। বিন্ধ্যাচল হিন্দুর ধর্ম্মস্থান ও তীর্থস্থান। সেখানকার জলবায়ু ভাল, জিনিসপত্র সুলভ, অতএব সেইখানে থাকাই কর্ত্তব্য। তাহা ছাড়া সেখানে থাকিলে আত্মীয়দের জ্বালাতন হইতে, ছোট ছোট আত্মীয়শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার আশা আছে।

রাধানাথের অনেকগুলি ভাই ভগ্নী, অনেকগুলি ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রী, অনেকগুলি ভাগ্‌না ও ভাগ্‌নী। এই সব ছোট ছোট শত্রু হইতে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। এইসব কারণে রাধানাথ তাঁহার সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর বিন্ধ্যাচলেই বাস করিয়াছিলেন।

বিন্ধ্যাচলে বাসের আর একটি কারণও ছিল। বিন্ধ্যাচলে উমেশ বাবুর একটু সম্পত্তিও ছিল। কাদম্বরীর সে সম্পত্তির উপরও একটু নজর ছিল। ভবিষ্যতে তাঁহার ভোলানাথ সে সম্পত্তি পান আর নাই পান, আপাততঃ সে সম্পত্তি তাঁহাদেরই অধিকারে আসিবে। অতএব বিন্ধ্যাচলেই তাঁহাদের বাসের উপযুক্ত স্থান।

ভোলানাথ ভাবিলেন, বিন্ধ্যাচলে কারখানা করিলে কারখানার ভাড়া আদি কিছুই লাগিবে না।

ভোলানাথ উমেশ বাবুর জমিতেই কারখানা স্থাপন করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণকে ধন্য করিবেন, আর পিতার ভাত খাইয়া তাঁহাকেও ধন্য করিবেন ; ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহার পিতাকে পত্র লিখিলেন ;—

"পরম পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয়,

আমি অনেক চিন্তার পর এই স্থির করিয়াছি যে আমি আর অধিক পড়াশুনা করিব না। আপনি মোটে ৩৩০৲ টাকা পেন্‌সন্ পাইবেন, সেই অল্প আয় হইতে রামনারায়ণপুরে আর একটি আলাহিদা বাটীর খরচ অন্যায়, দোষনীয় ও অমার্জ্জনীয়। আমরা বড় হইয়াছি ; আপনি এতদিন আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিয়াছেন ; এখন যদি আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে না পারি, তবে সেটা আমাদের দোষ। আমার অধিক উচ্চ আশা নাই, আপনার ও জননীদেবীর পদসেবা করিয়া জীবন যাপন করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিব। যদি প্রাণ দিয়া আপনাদের পদসেবা করিতে না পারিলাম, তবে এ শরীরে কি কাজ? আপনার পুত্রবধূও আপনাদের পদসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে মানস করিয়াছে, কোন বাধা বিঘ্ন শুনিবে না। সে বলে মাতাপিতাই সন্তানের জীবন্ত দেবতা, তাহাদের অপেক্ষা বড় দেবতা আর নাই। অতএব আপনি আমাদের এ সাধে কাহাকেও বাদ সাধিতে দিবেন না। অর্থই অনর্থের মূল। আমি অর্থ চাহি না, মান চাহি না, সম্পদ্ চাহি না, ধর্ম্মাধর্ম্মও বুঝি না ; চাহি কেবল আপনাদের পদসেবা।

মোটে আপনাদের আয় এখন ৩৩০৲ টাকা, ইহা হইতে আত্মীয় স্বজনকে দিতে গেলে আপনাদের আর চলিবে কিরূপে? ভগ্নীদের যথেষ্ট দিয়াছেন ; সকলকেই যথেষ্ট পরিমাণে যৌতুক দিয়াছেন, আর নগদ টাকাও দিয়াছেন। জামাইবাবুদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া আর

লঘুপদ করিবেন না, তাহাদিগকে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে দিন।

আমি আর রামনারায়ণপুরের বাসা খরচের জন্য এক পয়সাও আপনার নিকট হইতে লইব না। আদ্যনাথ ও নরনাথ বড় হইয়াছে। আদ্যনাথ দেখিয়া শুনিয়া একটি কার্য্য যোগাড় করিয়া লইবে। নরনাথ আপনার ইচ্ছানুযায়ী যাহা হয় একটা কাজ কর্ম্ম করিবে। ইচ্ছা করে ত আমাদের সঙ্গে বিন্ধ্যাচলেই থাকিবে।

আমরা তিন ভাই, আমি তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তিন জনের মধ্যে একজন আপনাদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিব। আমি জ্যেষ্ঠ, আমারই এ কার্য্য কর্ত্তব্য। আর দুজনে সাংসারিক উন্নতির জন্য পৃথিবীতে যুদ্ধ করুক, বংশমর্য্যাদা বজায় রাখুক। আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সকলই আপনাদের সেবায় অর্পিত হইবে; আমি অন্য কিছু চাহি না। আমি শিলিগুড়িতে আদ্যনাথের জন্য একটি চাকরি যোগাড় করিয়াছি। আপনার অনুমতি পাইলে তাহার বন্দোবস্ত করিব। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

পুনশ্চ;—আপনি এ বিষয়ে শীঘ্র কর্ত্তব্য নিরূপণ করিবেন। আপনার অধিক খরচ আমি আর করিতে চাহি না।”

কিছুদিন পরে পিতার পত্র পাইয়া ভোলানাথ, নরনাথ ও ধূমাবতীকে লইয়া বিন্ধ্যাচলে যাত্রা করিলেন। মধ্যম ভ্রাতাকে শিলিগুড়িতে একটি চা বাগানের চাকরিতে পাঠাইয়া দিলেন। শিলিগুড়িতে চাকরি করিয়াও যদি বাঁচিয়া থাকে তবে তাহার বিড়ালের প্রাণ।

বিন্ধ্যাচলে গিয়া ভোলানাথ দেশালায়ের এক কল খুলিয়াছিলেন। পিতা একজন অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার, তাঁর নাম ডাক বেশ ছিল।

মহা ধূমধামে দেশালায়ের কল খোলা কার্য্য সম্পন্ন হইল। অনেক গণ্যমান্য লোক কল খোলার দিন উপস্থিত ছিলেন। কাজ এক রকম বেশ চলিতে লাগিল। প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা মূলধন লইয়া এই কল খোলা হইল। টাকা অবশ্যই রাধানাথের। রাধানাথ প্রথমে বলিলেন মোটে তাঁর ২০০০০৲ টাকা আছে, তাহা হইতে ১০০০০৲ টাকা ভোলানাথকে দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত? কিন্তু ভোলানাথ, কাদম্বরী ও ধূমাবতী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন টাকা ত' তাঁহারই রহিল, বরং টাকা লাভের সহিত একত্রিত হইয়া বাড়িয়া যাইবে, তিনিও লক্ষপতি হইবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যৎযেন যুজ্যতেলোকেবুধস্তৎ তেন যোজয়েৎ

গ্রহকুমার কাশীর একজন ভদ্রলোক। তিনি ভোলানাথের প্রিয় বয়স্য। গ্রহকুমার উচ্চবংশের সন্তান, কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে সর্ব্বদাই পাপকার্য্যে রত। যত রকম হুজুক আছে, গ্রহকুমার সে সকলেরই প্রধান পাণ্ডা। পিতার বেশ সম্পত্তি ছিল, দুষ্কর্ম্মরত হইয়া সমস্তই সে নষ্ট করিয়াছে। এখন যদিও সে কোন কাজকর্ম্ম করে না, সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায় সেরূপ কোন আয় নাই, তথাপি তাহার সংসারযাত্রা বেশ ভাল ভাবেই নির্ব্বাহ হইতেছে। তাহার আত্মীয়েরা আশ্চর্য্য হন, কেমন করিয়া তাহার সংসার চলে; বন্ধুরা আশ্চর্য্য হন, টাকা ধার করিয়া আর কত দিন চলিবে। আর প্রতিবেশীরা আশ্চর্য্য হন, এখনও সে কেমন করিয়া বাহিরে রহিয়াছে। ফল কথা, যেমন করিয়াই হউক সে সর্ব্বকর্ম্মে মুরুব্বিয়ানা করিয়া দশ-জনের একজন হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কর্ম্ম করিত না, তথাপি তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। পৈতৃক সুবিস্তৃত ভদ্রাসনে বাস করিত, ভাল পরিত, ভাল খাইত, ভাল দলে মিশিত, অথচ প্রকাশ্যে আয়জনক কোন কার্য্যই করিত না।

এ রকম একদল মনুষ্য আছেন যাহারা বৃহৎ বৃহৎ সহরের জীব। প্রকাশ্যে কোন ভাল চাকরী না করিয়া, ব্যবসা না করিয়া, কোন বিষয়-কর্ম্ম না করিয়া, কোন পেশা শিক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র নিজ নিজ

উপস্থিতবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া বিনা চেষ্টায়, বিনা পরিশ্রমে, সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারনদীতে বেগে বহিয়া যায়। এই সব জন্তু সহরের উৎপন্ন। সমাজে ইহাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে। এই সব লোকের ধর্ম্মে মতি নাই, পরমেশ্বরে বিশ্বাস নাই, পাপে ঘৃণা ও ভয় নাই; কিন্তু স্বার্থে প্রগাঢ় আস্থা। এক পয়সা স্বার্থের জন্য লোকের গলায় ছুরি দিতে পারে।

আবার একদল লোক আছে যাহারা পিপীলিকাকে সুজি ও চিনি দেয়, গরু ঘোড়াকে জিলিপী খাওয়ায়, পায়রাকে ছোলা দেয়। সুনামের জন্য মনুষ্যের সুবিধার নামে, ধর্ম্মশালা করিয়া দেয়, দুর্ভিক্ষে চাঁদা দেয়। স্বাস্থ্যকর খাদ্যের সহিত অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য মিশাইয়া লক্ষ লক্ষ লোক মারিয়া, সেই পয়সায় পিপীলিকা, গরুঘোড়াকে খাওয়ায়। আর ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করে, দুর্ভিক্ষে চাঁদা দেয়। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আটা ময়দার পরিবর্ত্তে পাথরচূর্ণ খাওয়ায়, ঘিয়ের পরিবর্ত্তে সর্পচর্ব্বি দেয়, খাঁটি সর্ষপ তৈলের পরিবর্ত্তে বিষাক্ত বীজের তৈল চালায়। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনেক অধর্ম্ম হজম করে। তাহাদের পক্ষে, এই ধর্ম্মের ভাণ অধর্ম্মের হজমীগুলি। এই ধর্ম্মের ভাণে অনেক পাপ কার্য্য বেমালুম সাফ হজম করে, সমাজে একটা কৃষ্ণবিষ্ণু হইয়া বেড়ায়, আর অনেক কার্য্যে মুরুব্বিয়ানা করে।

সমাজে এই গ্রহকুমার দলের বেশ প্রতিষ্ঠা, বেশ নাম ডাক। আর গলাবাজি করিয়া খবরের কাগজে ছাপাইয়া ঢেড়া পিঠাইয়া সমাজকে জানায় যে তাহারা দশের ও দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছে।

পাঁচটাকা মণ সাপের চর্ব্বি ৮০৲ টাকা মণ ঘি করিয়া বেচিতেছে। আট আনা মণ নরম পাথর, বার টাকা মণ ময়দা করিয়া বেচিতেছে। আর মাঝে মাঝে সমাজের জনসাধারণকে খানা দিতেছে। তজ্জন্য সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠাও পাইতেছে।

একদিন এক সান্ধ্য ভোজে অনেক সমাজের শীর্ষ স্থানীয় লোক সেখানে উপস্থিত হইয়া ও সান্ধ্যভোজে যোগদান করিয়া ভোজদাতাকে আপ্যায়িত করিতেছেন ; ভোজের আয়োজন খুব ভালই হইয়াছে ; সকলেই খুব খুসী, ভোজদাতাকে সহস্র কণ্ঠে ধন্যবাদ দিতেছে। আর বলিতেছে ইনি খুব খরচ করিয়াছেন ; বেশ বেশ। এমন সময় একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী বলিয়া উঠিলেন হাঁ—এই যুদ্ধের সময় অনেক পচামাল চালাইয়াছেন। গুলি করিয়া নয়, খারাপ মাল খাওয়াইয়া অনেক লোক মারিয়াছেন। না হয় আজ সন্ধ্যাকালে কিছু খরচ করিলেন—তাহাতে তাহার মক্ষিকা দংশন ছাড়া আর কিছুই নয়।

গ্রহকুমার এই দলের নিম্নস্তরের একজন নেতা। তাহার তাঁবে অনেকগুলি লোক পেটভাতায় কার্য্য করে। সময়ে সময়ে খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত পানীয় দ্রব্য আর আর অনেক রকম দ্রব্য তাহাকে যোগাইতে হয়।

কলটি একবৎসর কাল বেশ চলিয়াছে, টাকাও আমদানী হইয়াছে। প্রথম বার্ষিক উৎসবের দিন অনেক স্থান হইতে ভদ্রলোকদিগকে আমন্ত্রণ করা হইল। গ্রহকুমারও আসিয়া জুটিয়াছেন। তিনি ভোলানাথের প্রধান বয়স্য। এই উৎসবের দিনে গ্রহকুমার প্রস্তাব করিলেন যে ভোলানাথ দেশের ও দশের উন্নতিকল্পে তাহার এই কারখানাটি উৎসর্গ করুন, তাহার মত দেশ হিতৈষী লোকেরই এরূপ দান সম্ভবে। গ্রহকুমারের প্রস্তাবে আর কয়েকটি ভদ্রলোকের (অধিকাংশই গ্রহকুমারের বন্ধু) সমর্থনে প্রস্তাবটি সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া পরিগৃহীত হইল। ভোলানাথ পাঁচজন ভদ্রলোকের অনুরোধে তাহার কারখানাটি নিখিল ভারতবর্ষকে দান করিতে স্বীকৃত হইলেন, অর্থাৎ প্রকাশ করিলেন যে তিনি এই কারখানার স্বত্ব-স্বামিত্ব

ছাড়িয়া দিয়া ইহাকে লিমিটেড কোম্পানি করিবেন, আর শীঘ্রই তাহার বন্দোবস্ত হইবে। গ্রহকুমার ও তাহার বন্ধুবর্গের মুখরিত 'জয় ভোলানাথের জয়' উচ্চশব্দে গগন বিদীর্ণ হইয়া গেল। সেই বিন্ধ্যাচলের নিস্তব্ধ নভোমণ্ডলে প্রতিধ্বনি হইল 'জয় ভোলানাথের জয়'। রাধানাথ আপনাকে ধন্য মনে করিলেন, তাহার পুত্র ভোলানাথ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকে ধন্য করিলেন। এরূপ পুত্ররত্ন কয়-জনের ভাগ্যে ঘটে। ধন্য সে, ধন্য তাহার পূর্ব্বপুরুষ, ধন্য সেই বংশ, যে বংশে ভোলানাথ দয়া করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

কিছুদিন পরেই ভোলানাথ বিজ্ঞাপন জাহির করিলেন—তাহার দেশালায়ের কারখানাটিকে 'অলইণ্ডিয়া ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড্ করা হইল। মূলধন ৫০০০০০৲ টাকা। আড়াই লক্ষ টাকা, চালিত কলের দাম ও জায়গার দাম স্বরূপ ভোলানাথ বাবু পাইবেন, আর বাকি আড়াই লক্ষ টাকা কার্য্য চালাইবার মূলধন হইবে।

ইহা ভারতে এক অমূল্য নিধি। ইহা হইতে দেশের অনেক উপকার সাধন হইবে। দেশের ও দশের উপকারের জন্যই ভোলা-নাথ আপন অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। গ্রহকুমার ও তাহার বন্ধুরা ও অপরাপর অনেক ভদ্রলোক শেয়ার বেচিতে সুরু করিলেন। অনেক দালাল ক্যানভাসার নিযুক্ত হইল। মোটা কমিশনের লোভে অধিকাংশ ক্যানভাসার তাহাদের আত্মীয়দের কাছে এই শেয়ার বেচিতে লাগিল। প্রত্যেক শেয়ারের দাম অতি সামান্য, দশটাকা করিয়া। এই দশটাকা করিয়া শেয়ার কিনিয়া ক্যানভাসারদের আত্মীয়েরা দেশের ও দশের সেবা করিলেন। তবে লাভ দেশের না হউক দশের হইল বটে, কেন না ক্যানভাসারগণ ও ভোলানাথ দশের মধ্যেই ত।

অনেক টাকার শেয়ার বিক্রয় হইল। সকল টাকা ভোলানাথের হস্তে পৌঁছিল। কেবল তাহার মধ্য হইতে গ্রহকুমারকে কিছু মোটা রকম ক্যানভাসারের কমিশন দিতে হইল।

অল্ ইণ্ডিয়া ম্যাচ্ ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং খুলিবার পূর্ব্বে ভোলানাথ উমেশ ডাক্তারকে যে পত্র লিথিয়াছিলেন তাহা এই ;—

"পরম পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয়,

ঈশ্বর-ইচ্ছায় এখানে আমরা ভাল আছি। রাহুরাম (ইহাই ভোলানাথের পুত্রের নাম) এখন ভাল আছে। সে এখন বেশ চলিতে পারে, খুব দৌড়ায়, দাদা দাদা করিয়া চেঁচায়। তাহার মাতা তাহাকে বুঝাইয়া দেয়, তাহার দাদা ত এখানে নাই, তিনি ত অনেক দূরে। রাহুরাম আপনার জমীর দিকে দেখাইয়া দেয়, যেখানে তাহার দেশালায়ের কল। ভগবান জানেন, সেই ক্ষুদ্র অবোধ বালককে কে বুঝাইয়া দিল যে কারখানার জমি তাহার দাদামহাশয়ের। ইহা ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, আর কিছু নয়। সে এখন থেকে সেই জমি তাহার দাদামহাশয়ের, এইটি জগৎকে বুঝাইয়া দিতে চায়। তাহার মাতা অনেক সময় তাহাকে প্রবোধ দেয়, বোকা ছেলে, তুই যদি বেঁচে থাকিস্, তাহা হইলে কি আর বাবা এই জমিটা তোকে না দিয়ে অন্য কাহাকেও দিবে, এ জমি তোরই। এ কথা শুনিলে খোকা আবার চুপ করিয়া থাকে। ঈশ্বরের কি মহিমা, নিজের জিনিস একটি ক্ষুদ্র বালকও চিনিতে পারে। মনুষ্য জীবনে সকলই অনিশ্চিত। সেই জন্য আমিং মনে করিয়াছি, এখন এই কলটি বাবার নিকট হইতে দশ হাজার টাকা লইয়া খুলিব। কিছুদিন পরে এইটিকে লিমিটেড্ কোং করিব। রাহুরাম এণ্ড কোং এই লিমিটেড্ কোম্পানির ম্যানেজিং এজেণ্ট হইবে। ঐ ম্যানেজিং এজেন্সীর বখ্‌রাদার

শ্রীযুক্ত রাহুরাম রায় ও শ্রীযুক্তা ধূমাবতী রায়। আপনার ইহাতে মত কি লিখিবেন। আমরা সকলে ভাল আছি। আমার, রাহুরামের ও আপনার কন্যার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার চিরদাস পুত্র।”

আর ধূমাবতী উমেশ ডাক্তারকে নিজে যে পত্র লিখিলেন তাহা এই ;—

'পরম পূজনীয় বাবা,

আমার প্রণাম জানিবেন। আপনার বড় সাধের রাহুরাম আপনার এখানকার জমি তাহার কার্য্যে ব্যবহার করিবে জানিবেন। আপনার জামাই প্রথমতঃ এ প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিলেন। বলেন, শ্বশুরমহাশয়ের ত ছেলে সব আছে; তাহাদের জিনিস রাহুরাম কেন লইবে? আমি তাহার এ বৃথা আপত্তি শুনি নাই। আমি বলিলাম, আমার বাবার এত ছোট নজর নয় যে, তাহার পিণ্ডাধিকারী দৌহিত্রকে এই সামান্য একখণ্ড জমি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন। বরং রাহুরাম না লইলে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন; আমার পিতার এমন বংশে জন্ম নয়। তাহাদের বংশপরম্পরায় যে অর্থ-কৃচ্ছ্রতা, তাহা তাহাদের পুরুষানুক্রমে দানশীলতার ফল! আমি আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে ও আপনার জামাতাকে অনেক কষ্টে এই জমি লইতে রাজি করিয়াছি। আপনার ও মা'র রক্ত ত আমার ধমনীতে বহিতেছে, আমার নজর ছোট হইবে কেন? আমার বাপ-মা কি একখণ্ড জমির জন্য গ্রাহ্য করেন? তাঁহারা এখনও এই জমি লইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন, আপনি যত শীঘ্র পারেন রাহুরামের নামে এ জমির দানপত্র লিখিয়া সহি ও রেজেষ্ট্রী

করিয়া আমার শ্বশুরের কাছে পাঠাইয়া দিবেন। দেরী করিলে, তাঁহারা লইতে অস্বীকার করিতে পারেন। ঈশ্বরের কি অপার মহিমা, রাহুরাম এখন হইতেই ঐ জমির দিকে চাহিয়া দাদা, দা-দা করে; অর্থাৎ সে এখনই, ইহা দাদার জমি—ইহা চিনিতে পারিয়াছে, আর দাদা দা-দা বলিয়া বুঝাইতে চায়, দাদামহাশয় দাও, দা-দা-মহাশয় দাও। ইহা জন্মজন্মান্তরের সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নয়। মাতাঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম জানাইবেন; আর আপনি আমার প্রণাম জানিবেন।...ইতি—

আপনার স্নেহের ও আদরের কন্যা।"

"পুনশ্চ;—এই কারবারটি রাহুরামের নামে হইতেছে। আপনার জামাই বলেন, মনুষ্য-জীবন নশ্বর ও ক্ষণ-ভঙ্গুর। সেই জন্য যতদূর সম্ভব, তিনি আমাদের একটি বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেছেন। আপনি ইহাতে কি বলেন? বোধ হয় এরূপ বন্দোবস্তে আপনার অমত হইবার সম্ভাবনা নাই।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভজহরি

ভজহরি দত্ত হুগলি জেলার একজন গৃহস্থ ও মধ্যবিত্ত জমিদার। তাহার যথেষ্ট জমিজমা আছে; তেজারতিতে অনেক টাকা খাটে। হুগলি জেলায় এমন জমিদার নাই, যাহাকে সময়ে ভজহরির কাছে হাত পাতিতে না হয়। কাল অষ্টমের বিক্রি, আজ রাত্রিতে কোথাও টাকা কর্জ্জ না পাইয়া রাজীবলোচন মিত্র আসিয়া হাজির, আর বহু সুদে অর্দ্ধরাত্রে টাকা কর্জ্জ, জমিদারীর নিলাম স্থগিত। এরূপ অনেক রাজীবলোচন মিত্রই প্রতি বৎসর অষ্টমের সময় তাহার দ্বারস্থ। কিন্তু তার পর দিনই প্রকাশ্য ভাবে মোহিনী বোসের বৈঠকখানায় বসিয়া স্থিরীকৃত হয় যে, ভজহরি অতীব পিশাচ, সুদখোর,—টাকা ধার দিবার পূর্ব্বে যথেষ্ট বেগ দেয় ও কমিশন কাটিয়া টাকা নেয়। অসময়ে তাহার নিকট হইতে টাকা ধার পাওয়া যায় এই যা কথা, নতুবা সে নরপিশাচ। তাহার নাম করিতে নাই। সে দান খয়রাত কাকে বলে জানে না, জীবনে কখনও বেশী সুদে টাকা ধার দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন বাবদে টাকা দেয় নাই। কখনও কোন ক্রিয়া-কলাপ তাহার বাটীতে তাহার সময়ে হয় নাই। কোন ভদ্রলোকের পায়ের ধূলা, বিপদে পড়িয়া টাকা ধার করিতে আসা ব্যতীত, কখনও তাহার বাটীতে পড়ে নাই। সে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কখনও ব্যয়বাহুল্য করে নাই। পরণে একখানি আটহাত কাপড়,

গায়ে একটি পিরাণ, পায়ে একজোড়া ঠন্‌ঠনের চটী ও হাতে একটি ডাবাহুঁকা। সকলে এই অবস্থাতেই তাহার দর্শন পাইত। কেহই তাহাকে ভক্তি করিত না, তবে সকলেই ভয় করিত; কেন না, প্রয়োজন হইলে তাহার দ্বারস্থ হইতে হয়।

ভজহরির বাটীতে বাস করে ভজহরি, তাহার স্ত্রী উমাসুন্দরী ও সকল কর্ম্মের কাণ্ডারী বামাসুন্দরী চাকরাণী ওরফে বামী বা বামারাণী,—সুবিধামত যে যখন যে ভাবে ডাকে। আটপৌরে নাম, বামী; পোষাকী নাম, বামাসুন্দরী বা বামারাণী। যখন উমা 'বামা, বামা' করিয়া ডাকিয়া সাড়া না পান, বা যে দিন সে মনের মত বাজার না আনে, তখন সে হয় বামী; আর যখন সে আদরের ডাক পায়, তখন সে হয় বামাসুন্দরী।

বামা একাই একশ'। সেই বাজার করে, সেই হাট করে, কুট্‌না কোটে, বাটনা বাটে, ঘর ঝাট দেয়, বাসন মাজে, বিছানা পাতে আর বাবু ডাকিলে তামাকু সাজিয়া দেয়। সে জানে না আর পারে না এমন কিছুই নাই। তবে সে কিছু মুখরা। রাগিলে সে কাহারও তোয়াক্কা রাখে না। ভজহরি তাহার কাছে ভীত ও ত্রস্ত। আর ভজহরির ভীতি-প্রদায়িনী রক্ত-শুষ্ককারিণী, রাগিণী, বাঘিনী, উমা-সুন্দরী ওরফে উমা-রাণী, সেও ভীতা ও ত্রস্তা। তাহার তিনকুলে কেহই নাই, বয়স প্রায় পঞ্চাশ, শরীরের গঠন এখনও বেশ আছে! থাকিবার মধ্যে আছে তার এক মেনী বিড়াল। সে সেইটিকে খাওয়ায় দাওয়ায়, ধোয়ায়, পোঁছায়, সুখে রাখিতে চেষ্টা করে।

এ জগতের নিয়মই এই, প্রত্যেক লোকের ভালবাসার পাত্র আছেই; সে মেয়েই হউক, ছেলেই হউক, অথবা জীব জন্তুই হউক, বা পশু-পক্ষীই হউক। মানুষ যত দিন ক্ষুদ্র থাকে, তত দিন তাহার ভালবাসার

জিনিসও ক্ষুদ্র হয়; অর্থাৎ হয় নর, না হয় নারী, না হয় পশু-পক্ষী। যখন সে বৃহৎ হয়, তখন সে ভালবাসে দেশ, প্রদেশ, জল, স্থল, এবং সমস্ত পৃথিবী। এক শ্মশান ঘাটে আমি সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলাম; সে সব মায়া মমতার বন্ধন কাটাইয়াছে; কিন্তু তবুও সে এক বানরের সেবা শুশ্রূষায় রত,—বানরের মল-মূত্র পরিষ্কার করে। কোন এক ভালবাসার পাত্র ব্যতীত মানুষ থাকিতে পারে না। যাহা সকলের উপর খাটে, বামার উপরও তাহাই খাটিল; বামার ভালবাসার পাত্র ঐ মেনী বিড়াল।

ভজহরির একমাত্র কন্যা, নারীসুন্দরী। সে তাহার স্বামী উমেশ ডাক্তারের কাছেই থাকে। উমা সুন্দরী তাহাকে বড় একটা দেখিতে পারে না, কেন না তাহার অনেকগুলি ছেলে মেয়ে। বাটীতে আসিলে গোলমাল করে, আর খরচও অনেক বাড়িয়া যায়। খরচ বিষয়ে ভজহরি ও উমা সুন্দরী দুইজনেই সংযতহস্ত। অন্য সহস্র বিষয়ে তাহাদের মতভেদ থাকিলেও, এ বিষয়ে তাহারা দুইজনেই এক মত। পয়সা বাহির করিতে একেবারেই নারাজ, সওয়ায় বেশী সুদে কর্জ্জ দেওয়া।

বামার জীবনের অবলম্বন মেনী বিড়ালটি; আর ভজহরি ও উমা-সুন্দরীর জীবনের অবলম্বন টাকা, টাকা, টাকা। নারীসুন্দরী তাহাদের একমাত্র কন্যা হইলেও, তাহাদের ভালবাসার একমাত্র কেন্দ্র অর্থ। সকল অনর্থের মূল, অর্থই—তাহাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা।

ভজহরির হিসাব পত্র লিখিবার জন্য একজন সরকার ছিল। তাহার নাম রায় মহাশয়। রায় মহাশয়ের দেহখানি কার্য্যাধিক্য বশতঃই হউক, আর পর্য্যাপ্ত খাদ্যের অভাবেই হউক, একখানি শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায়। শরীর অতিশয় কৃশ ও শুষ্ক। রায় মহাশয়ের প্রকৃতিও রুক্ষ ও উগ্র; আশা অপার; ভরসা নিজের দক্ষিণ হস্ত ও বুদ্ধি; আর স্বভাব

সকল অবস্থাতেই এক রকম, সন্তুষ্ট। সে আরও কয়েক জায়গায় খাতা লেখে, এবং প্রত্যেক জায়গা হইতে কিছু কিছু মাসিক বৃত্তি পায়। তবে সে জনসমাজে ভজহরির সরকার বলিয়াই খ্যাত। ভজহরি যদিও তাহাকে যৎসামান্য বেতন দেয়—সে বেতনে অন্য কেহই সরকার পাইতে পারে না—তথাপি রায় মহাশয়ের এক রকম পোষাইয়া যায়। প্রত্যেক উত্তমর্ণকেই টাকা ধার করিবার সময়, রায় মহাশয়কে কিছু কিছু দিতে হয়। সুদের ও বন্ধকি সম্পত্তির হার বাড়াইবার সময় ভজহরি অনেক সময় 'বাড়ীর ওরা' ও রায় মহাশয়ের নাম স্মরণ লয়। 'বাড়ীর ওরা' অর্থে উমা সুন্দরী। অনেক সময় টাকা ধারের জন্য আগত বিপদগ্রস্ত ভদ্রলোকদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে, সে শতকরা আঠার টাকা হারে ধার দিতে রাজি, কিন্তু আপাতত তাহার হাতে নিজের টাকা নাই, তবে 'বাটীর ওদের' টাকা আছে। তা সে সব টাকা রায় মহাশয়ই খাটায়। 'বাটীর ওরা' আর রায় মহাশয় শতকরা চব্বিশ টাকা হার সুদের এক কড়া কমে টাকা ধার দিবে না। সে তাহার জন্য দুঃখিত, কিন্তু সে নাচার; স্ত্রীলোকের কথায় ত' সে কথা কহিতে পারে না। রায় মহাশয়কে কিছু না দিলে লোকের কার্য্য হাসিল হইবার নয়।

আইন আদালতের সোলেনামায় ও দলিল-পত্র লেখা পড়ায়—'পাঁচজন ভদ্রলোক' যে কার্য্য সাধন করে, ভজহরির কাছে 'বাটীর ওরা' ও রায় মহাশয় সেই কার্য্যই সাধন করিত। তবে আদালতের সোলেনামা ও দলিল লেখা পড়ায় 'পাঁচজন ভদ্রলোকের' একেবারেই অস্তিত্ব নাই, কিন্তু ভজহরির 'বাটীর ওরা' ও রায় মহাশয়ের অস্তিত্ব ছিল। তবে আদালতের সোলেনামা ও দলিল দস্তাবেজে 'পাঁচজন ভদ্রলোকের' যে দলিল সম্বন্ধে তাহাদের নাম লওয়া হয়, তাহাতে তাদের কিছু

আসে যায় না ; তেমনি 'বাটীর ওদের' ও রায় মহাশয়ের ও ভজহরির, তেজারতি কার্য্যে সুদের কমিশনের হারের কম বেশীতে কিছুই আসিয়া যাইত না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রায় মহাশয়ের আশা খুব প্রবলা। ভজহরি মাঝে মাঝে যখন রায় মহাশয়ের কার্য্য খুব বেশী হইত—তখন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া ও শুনাইয়া বলিত,—দেখ, রাঙ্গা বৌ (ভজহরি উমা-সুন্দরীকে অনেক সময় 'রাঙ্গা বৌ' আর না হয় 'নূতন বৌ' এই নামে ডাকিত) আমাদের পুত্র-সন্তান নাই। রায় মহাশয় আমাদের সংসারে অনেক দিন আছে। আমি আমার উইলে ওর একটু সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইব। এত দিন আমাদের সংসারে থাকিয়া আমাদের অবর্ত্তমানে ও কোথায় যাইবে? উহার যাহাতে কষ্ট না হয়, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া যাইব। কখনও কখনও পাঁচজন লোক উপস্থিত থাকিলে, রায় মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া ঐরূপই বলিত। রায় মহাশয় ভজহরিকে অনেক দিন জানিত, তবুও সে মনে করিত, হয় ত' তাহার প্রভু-ভক্তির জন্য ভজহরি তাহাকে কিছু দিয়া যাইতে পারে। অনেক সময় অনেক আশ্চর্য্য ঘটনাও ত' ঘটে, আর আমি তার জন্য যৎসামান্য বেতনে অনেক করিয়াছি। সে অন্য লোককে কিছু দিক আর নাই দিক, আমার প্রতি তাহার লক্ষ্য আছে, আমার জন্য সে কিছু করিয়া যাইতে পারে।

ভজহরির এক ভাই আর দুই ভগ্নী। পৈত্রিক সম্পত্তি দুই ভায়ের মধ্যে অন্তরায় হইয়াছিল। আর সেই পৈত্রিক সম্পত্তিই তাহার দুইটি বিধবা ভগ্নীকে দূরে রাখিত। তার সদাই ভয়, তাহার ভগ্নীরা নিকটে থাকিলেই কিছু না কিছু আদায় করিয়া লইবে; অন্ততঃ—ছেলে মেয়ে লইয়া খাইয়াও ত' যাইবে। তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী হৈমবতী নিঃসন্তান,

সে মাঝে মাঝে তাহার বাটীতে আসিত। কনিষ্ঠা ভগ্নী রমাবতীর দুইটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে, সে কোন রকমে তাহার বাটীতে আসিতে পারিত না। বড়ি দিবার সময়, ডাল বাটিবার সময়, রসুই ঘর সাজি মাটি দিয়া ধুইবার সময়, তোলা বাসন মাজিবার সময়, বিছানার চাদর সেলাইয়ের সময়, দোক্তা তৈয়ার করিবার সময় হৈমবতীকে নিমন্ত্রণ করিত; তাহা প্রায়ই একাদশী, অমাবস্যা বা কোন উপবাসের দিনে।

উমাসুন্দরী একদিন হৈমবতীর দেখা পাইয়া কহিল—ঠাকুরঝি, একদিন এসে চারটি বড়ী দিয়ে যেও না বোন, অন্য দিন তোমার নিজের রান্না-বান্না আছে, তাই বলিতে পারি না; তবে আগামী একাদশীর দিন তোমার রাঁধা-বাড়ার কোন ঝঞ্ঝাট নাই, সেই দিন এসে তোমার ভায়ের তরে কিছু বড়ি দিয়ে যেও। দেখ বোন, একটু ভোরে ভোরে এসো; পোড়া কপাল, আমি আবার ডাল বাটিতে পারি না, আর বামীও তদ্রূপ। আর সে করেই বা কি করে? একা কতই করিবে; তাহার উপর তোমার ভায়ের তামাক সাজা। তুমি একটু ভোরে এসে ডাল ক' সের ধুয়ে বেটে নিয়ে বড়ি কটা দিয়ে যেও। আমার বোন, বড়ি না হ'লেও চলে, তবে তোমার ভায়ের জন্যই যত ঝঞ্ঝাট। তা ডাল বামী বেছে বেছে রাখ্‌বে, আর আমি ভিজিয়ে রেখে দোব। দেখো বোন ভুলো না। তাহা হইলে ডালগুলো সব নষ্ট হ'বে। তোমার বাপ ভেয়ের কাজ, তুমি না কর্‌লে কে কর্‌বে বোন্।

হৈমবতী একাদশীর দিনে উপোস করিয়া আসিয়া ডাল বাটিয়া, বড়ি দিয়া, বেলা ২টার সময় কার্য্য শেষ করিয়া তাহার বাটী যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

হৈমবতী। নূতন বৌ, তবে এখন আসি।

উমা সুন্দরী। বোন, এমন দিনে এলে যে একটু জল পর্য্যন্ত খাবে

না। এটা কি ভাল, এ তোমাদেরই ত' বাপের বাড়ী, তোমরা আস্‌বে, যাবে, খাবে, নেবে।

হৈমবতী। তা বোন, যেখানেই থাকি তোমাদেরই ত' খাচ্ছি। লোকে বাপ ভায়ের খায় না ত' খায় কার? আজ একাদশী, আজ ত' আমি জল স্পর্শ করি না।

উমা। তা বোন, এখন এইখানেই একটু শোও, রোদ পড়্‌লে যেও। দেখ, আর একাদশীতে এসে আমার তোলা বাসন-গুলো মেজে দিয়ে যেও। সে সব গুলোয় কলঙ্ক পড়ে গেছে। আর সেই দিন কিছু বড়ি নিয়ে যেও। তবে কি জান, তুমি কি রাস্তা বেড়ান বড়ি খাবে?

হৈম। না বোন, ও আমার খাওয়াই। ভজহরি আর তুমি বেঁচে থাক, কত খাব কত নেব।

উমা। হ্যাঁ দিদি, রামলাল তোমাদের যত্ন আয়ত্তি কেমন করে? দশটা নয় বিশটা নয়, মোটে দুটো পিসী, তাদের যদি তত্ত্ব না লয় তবে তত্ত্ব লবে কার? তোমাদের বংশের কেমন বোন, খুড়ো, জেঠা বা পিসীর দিকে টান নাই।

হৈম। তা বেঁচে থাক আমার রামলাল। আমার বাপের বংশের তিলক। সে বেঁচে থাকলে আমার বাপ খুড়ো এক গণ্ডুষ জল পাবে। তবে এখন আমি আসি, বাটীতে কাজ কর্ম্ম আছে। হরেন ও গণেশ এ বেলা আমার কাছেই খাবে।

উমা। তুমি বোন, তোমার ঐ বুনপোদের নিয়ে জ্বলে ম'লে। তা নইলে তোমার দুই হাত, দুই পা, তোমার আবার ভাবনা কি? আমাদের এখানেও ত' মাঝে মাঝে থাক্‌তে পারো।

হৈম। তা বোন, কি করবো। রমার জন্যই যত ঝঞ্ঝাট, দুটো

অপগণ্ড রেখে বাপ চলে গেল। রমাকে, যা করে পারুক, ছেলে দুটোকে মানুষ ক'র্‌তে হবে ত'।

উমা। তা বোন, রামলাল কিছু কিছু সাহায্য করে ত? দশটা নয়, বিশটা নয়, মোটে দুটো পিসতুতো ভাই বই ত নয়।

হৈম। তা দিদি, করে বই কি। মাসে মাসে স্কুলের মাহিনা বলিয়া ৫।৭ টাকা দেয়।

উমা। পোড়া কপাল এই—মাসে দশটা টাকাও নয়! আমি বোন মাঝে মাঝে মনে করি—ছোট ঠাকুরঝিকে নিয়ে আসব, তা বোন হ'য়ে উঠে না। আমি নিজে এক রকম ক'রে তোমার ভায়ের ও আমার দুটো ডাল ফুটিয়ে নিতে পারি। তার বেশী হ'লে আমার শরীর টিকবে না। ইচ্ছা থাকলেও হ'য়ে উঠে না।

হৈম। তা বোন, তবে আজ আসি।

উমা। এসো বোন এস, কিছু মনে ক'রো না।

নবম পরিচ্ছেদ

"যখন যেমন তখন তেমন"

রামলাল ভজহরির ভ্রাতুষ্পুত্র, একমাত্র বংশের তিলক। যতদিন রামলালের পিতা জীবিত ছিলেন, দুই ভায়ে পিতৃক বিষয় লইয়া মনো-বিবাদ ছিল। রামলালের পিতা অপেক্ষাকৃত লোক ভাল ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠের ন্যায় কৃপণ ছিলেন না। তাঁহার শরীরে দয়া মায়া ছিল, লোকের কষ্ট দেখিলে তাঁহার মন আর্দ্র হইত।

রামলাল বংশের তিলক হইলেও তাহার জন্য ভজহরির বিশেষ স্নেহ মমতা ছিল না। উমা নিজেকে ছাড়া আর কাহাকেও কখন ভালবাসে নাই; নিজের মেয়েকেও নয়, নাতী নাতিনীদেরও নয়, দেবর পুত্রকে ত' নয়ই।

রামলালের বাটী ও ভজহরির বাটী পাশাপাশি। এক ভদ্রাসনই দায়-ভাগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দুই খণ্ড হইয়া গিয়াছে। রামলাল দুই বৎসরের মধ্যে শেয়ারের খেলায় দশ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। লেখা পড়া বিশেষ ভাল শিখেন নাই, তাহা হইলেও মেধাবী, বুদ্ধিমান ও উদার অন্তঃকরণ বিশিষ্ট।

জেঠা মহাশয়ের অংশে দালান পড়িয়াছিল। অনেক দিনের পুরাতন পৈত্রিক দালান কালের গতিতে ও মেরামতের অভাবে ব্যবহারের প্রায় অনুপযোগী হইয়া আসিয়াছিল, এমন সময়ে রামলাল শেয়ার বাজারে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ক্রিয়া-কলাপে মন দিলেন।

প্রথমেই দুর্গোৎসব করিবার ইচ্ছা। দালান চাই। নিজের অংশে দালান প্রস্তুত করিতে সময় লাগিবে, অতএব কিং কর্ত্তব্য ভাবিতেছেন, এমন সময় ভজহরি ইহার খবর পাইলেন। তিনি রায় মহাশয় ও উমা সুন্দরীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শেয়ার মার্কেটে পয়সা করিয়াছেন। শেয়ার মার্কেটের পয়সায় দুঃখদরদ নাই, আসিতেও যেমন যাইতেও সেইরূপ। তবে তিনি তাহার কিছু অংশ কেন পাইবেন না। রামলাল দুই বৎসরে দশ লক্ষ টাকা উপায় করিয়া স্থির করিলেন, তাহার উপায়-ক্ষমতা বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা, মাসে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা—চারিটা ভারতবর্ষের প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তার মাসিকবৃত্তি।

যে ব্যক্তি অল্প আয়াসে কোন দুষ্প্রাপ্য বস্তু অর্জ্জন করে, তাহারই মাথা সহজে ঘুরিয়া যায়। সে নিজেকে একটা বিশেষ কৃষ্ণ বিষ্ণু মনে করে, আর মনে করিয়া পৃথিবীটাকে সরা কিম্বা মধু-পর্কের বাটীর মতন দেখে।

ভজহরি গত বিশ বৎসরের মধ্যে ভায়ের অংশে পদার্পণ করেন নাই, আজ কিন্তু তাহা করিলেন। তাঁহার সর্ব্ব সময়ের সাথী ডাবা-হুকাটি হাতে করিয়া টানিতে টানিতে 'কোথায় রে বড়মিয়া' 'কোথায় রে বড়মিয়া' হাঁকিতে হাঁকিতে রামলালের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। রামলালের একটি কন্যা; ভজহরি তাহাকে মৌখিক আদর করিয়া 'বড়মিয়া' বলিয়া ডাকিতেন—জ্যেষ্ঠতাতের গলার আওয়াজ শুনিয়া রামলাল তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন, আর "আসুন জেঠা মহাশয়, আসুন, আসুন," শব্দে তাহাকে অন্দর বাটীতে লইয়া গেলেন। ভজ-হরি রামলালের দোতালার শয়ন কক্ষে গিয়া বসিলেন।

ঘরটি পরিপাটী রূপে সজ্জিত; মেহগণি কাষ্ঠের ৭´×৭´ একখানি খাট

আগাগোড়া সোনালি করা, উৎকৃষ্ট নেটের মশারি, কড়ির নীচেই ছতরী হইতে ঝুলিতেছে। খাটে একটি স্প্রিং গদী প্রায় এক ফুট উচ্চ, দেখিলেই শুইবার লোভ হয়। ভাল একখানি কার্পেটের পাপোষ। ঘরে দুইখানি প্রমাণ আর্‌সি। দেওয়ালের পাশের একটি টেবিলে ফুলদান, তাহাতে অত্যুৎকৃষ্ট গোলাপ-ফুল রহিয়াছে। যদিও বেলা আটটা, এর মধ্যে আজকের তাজা ফুল, ফুলদানি শোভিত করিয়া আছে। মেজেতে একখানি ব্রাসেল কার্পেট বিছানা। আর কয়েকটি উৎকৃষ্ট আসবাবে ঘরটি বিশেষ রূপে সজ্জিত। অনেক সময় লোক, ঘর সাজাইতে গিয়া তাহাকে ঝাড় লণ্ঠনের দোকান বা কেবিনেট ওয়েরহাউস করিয়া তোলেন। রামলালের ঘরটি সে পদ্ধতিতে সজ্জিত নয়। তাঁহার অর্থ ছিল, পছন্দ ছিল, নজর ছিল আর সন্ধানও ছিল। কোথা হইতে কোন ভাল আসবাব্‌টি পাওয়া যায়, তাহা তিনি জানিতেন এবং বহু ব্যয় করিয়া সংগ্রহ করিতেন।

ভজহরি তাহার ঘরে ঢুকিয়া গৃহের পারিপাট্য ও সজ্জা দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাই ত, বাবাজীর আমার নজর আছে, তবে পেলে কোথা থেকে? তার পর প্রকাশ্যে বলিলেন, তা বাবা বেশ, আমি তোমার বাটীর পারিপাট্য ও সুন্দর সাজ দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট। রামলালকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন, বোস বাবা, বোস, দাঁড়াইয়া কেন? তুমি আমার বংশের তিলক, তুমি বাঁচিলেই আমার পিতা, পিতামহ এক গণ্ডুষ জল পাইবেন। বোস বাবা, বোস; দেখ বাবা, আজ বিশ বৎসর পর এ বাটীতে আসিলাম। পাঁচজন দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় তোমার পিতা আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন; সদাই পার্শ্বচর পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, অপমানের ভয়ে এদিকে আসিতাম না। তা কি জান, বাবা, প্রাণের টান, প্রাণের

টান ; ইচ্ছা করি আর না করি, প্রাণের টানে এখানে এনে ফেলচে। দেখো বাবা, খুব সাবধানে চল্‌বে, খুব হুসিয়ার হ'য়ে থাকবে। সহরে বাস অতিশয় বিপদ্-সঙ্কুল; পদে পদে ডাঙ্গার হাঙ্গর, কুমীরের ভয়, উত্তম ভোজ্য পাইলেই টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা। এই সব সাঙ্গোপাঙ্গের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে। ইহা বাবা বড় শক্ত, বড় শক্ত। এই সব হাঙ্গর কুমীরেরা, আত্মীয়ে আত্মীয়ে বিবাদ লাগাইয়া নিজেদের কার্য্য উদ্ধার করে, তোমার জন্য তাহাদের কোনরূপ আসে যায় না। তাহারা তোমার পয়সা চায়, তোমার পরিণাম যাহাই হউক তাহাতে তাহাদের আসিয়া যায় না।

রামলাল। জ্যেঠা মহাশয়, আপনি ও মামা ছাড়া আমার মুরুব্বি আর কে আছে? আপনারাই আমার নিকট আত্মীয়। আপনি পিতা ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন ; তাঁহার গুরুজন আপনি জীবিত আছেন, আপনি আমার পিতৃ-স্থানীয়। মাতা ঠাকুরাণী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাতুল মহাশয় এখনও জীবিত, মাতার তরফ হইতে তিনি আমার গুরুজন ও মুরুব্বি।

ভজহরি। তা বটেই ত', তা বটেই ত'। তা বাবা, তোমার মাতুল মাঝে মাঝে তোমাদের খবরাদি লন ত'?

রামলাল। আজ্ঞে হাঁ। আজ মাস খানেক হইতে তিনি আসা যাওয়া করিতেছেন। বলেন বৃদ্ধ হইয়াছেন, আসিতে কষ্ট হয়, তা কি করিবেন? বলেন, নাড়ীর টান, না আসিলে থাকিতে পারেন না। তাঁহার আদেশ মত মাঝে মাঝে গাড়ী পাঠাইয়া দি, আর তিনি আসেন।

ভজহরি। (মনে মনে)

এই রে, বেটা আগে থেকেই এসে আসর দখল ক'রেছে। আমি ক'দিন

থেকেই মনে করছি, শীঘ্র আসব, শীঘ্র আসব ; তা প্রায় বিশ বৎসর আসি নি, এখন কি ক'রেই বা খবর লইবার ভাণ করে আসি ? রামের মামাশালা দেখছি আমার চেয়েও বেহায়া। শালা ত' আজ পঁচিশ বৎসর ভাগ্নের বাটীতে পা দেন নাই। আর যেমন ভাগ্নের দশ লক্ষ টাকা লাভ, অমনি মধু-চক্রে মৌমাছির ন্যায় বায়ু-বেগে আসিয়া উপস্থিত। রামলালের মামাশালা খুব হুসিয়ার, খুব হুসিয়ার ; এখনও বাহিরে আছে, এই আশ্চর্য্য।

(প্রকাশ্যে) তা বাবা, নাড়ীর টান কি না। আমি তোমার পিতৃ-কুলের, আমার নাড়ীর টান বেশী—আন্তরিক। তোমার মামা, তোমার মাতা ঠাকুরাণীর ভাই, তাহারও কতকটা টান আছে। সেও ত' আসবেই, সেও ত' আসবেই। আরে বড়মিয়া, চাকরকে একটু তামাক দিতে বল। বড়মিয়া গেল কোথায় ?

ভজহরি। (একটু অপ্রস্তুত হইয়া বেহারাকে তামাক দিতে বলিয়া) মাপ ক'রবেন, আমার আগেই তামাক দেওয়া উচিত ছিল। মেনকারাণী সকাল বেলা মাঠে হাওয়া খেতে গেছে। অনেকগুলো ঘোড়া ব'সে ব'সে খাবে, তাই সকালে একটা জুড়ি জুতে মেয়েটাকে হাওয়া খেতে পাঠিয়ে দিই। মামা প্রায়ই তাহার সঙ্গে যান। সকালে ভোরের হাওয়াটা ভাল, তাই মেয়েটাকেও পাঠাই, মামাকেও পাঠাই।

ভজহরি। (মনে মনে)

ওরে এর মামা বেটা আমার চেয়ে তিন ক্লাস উপরের লোক, এই কয় দিনের মধ্যে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। বেটা খুব হুসিয়ার, অনেকটা ষ্টার্ট পেয়ে গেছে।

(প্রকাশ্যে) তা বেশ বাবা, তা বেশ। তা মেয়েটাকে হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসা, সে ত' আমাদেরই কাজ। আর বড়মিয়াই ত' এখন বংশের

শিব-রাত্রির সল্‌তে। তা ভাল বাবা, তা ভাল। আমি মাঝে মাঝে তাকে হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসব। তোমার মামাকে আর কেন অপর বাটী হইতে আসিয়া এতটা কষ্ট ক'রতে হবে? আমার ত' এক বাড়ী ও এক বংশ, আমিই এটা করিব।

রৌপ্যের উপর সুবর্ণ-খচিত আল-বোলায় খাম্বিরী সুল্‌ফা তামাক, বাবুর পেয়ারের চাকর মেধো আসিয়া জেঠা মহাশয়কে দিয়া গেল। তাহার সুগন্ধে ঘর মাতোয়ারা, গন্ধ শুঁকিয়াই জিহ্বায় জল পড়ে।

ভজহরি তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, দেখ রাম, বলিতেছিলাম কি, তুমি নাকি আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের লুপ্ত কীর্ত্তি মা দুর্গাকে পুনরায় আমাদের বাটীতে আনয়ন করিবে। খুব ভালই, খুব ভালই। আমরা নরাধম, অবস্থান্তরে পূর্ব্ব-কীর্ত্তি বজায় রাখিতে পারি নাই; তুমি কুলের তিলক, সেই পূর্ব্ব-পুরুষের লুপ্ত-কীর্ত্তি পুনরুদ্ধার করিবে, ভাল, ভাল, তাহাই হউক। আমি শুনিলাম, তুমি পূজোর দালানের জন্য চিন্তিত হইয়াছ। তা বাবা, আমার অংশে পৈত্রিক দালান পড়িয়া আছে; পূজাও পৈত্রিক, দালানও পৈত্রিক, আর তুমি পৈত্রিক পূর্ব্ব-পুরুষের বর্ত্তমান কুল-তিলক। তুমি মনে কিছু দ্বিধা করিও না, তোমার পূর্ব্ব-পুরুষের দালানে পুনরায় মাকে আনয়ন কর। সকলই আনন্দময়ীর ইচ্ছা। বাবা, তুমি আমার অংশের দালান বলিয়া কিছু মনে করিও না, এ দালান তোমারই, তুমি নিঃসঙ্কোচে এই দালানে মা'কে আনয়ন কর। আর বাবা, তোমার দালান তুমি সাজাইবে। যেমন করিয়া ইচ্ছা সাজাইয়া লও, মনে কিছু কিন্তু করিও না বা খোঁচ রাখিও না।

অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ভজহরি বলিলেন, তবে বাবা আজ এখন আসি, কই বৌমা কোথায়? তাহাকে অনেক দিন দেখি নাই। আমার যেমন কপাল! দেখি, সে কত বড়টা হ'য়েছে, আর কেমনটিই বা হ'য়েছে।

ভজহরি "বৌমা" "বৌমা" বলিয়া ডাকিলে বৌমা আসিয়া গল-বস্ত্রে ভজহরিকে প্রণাম করিল। "সাবিত্রী সমান হও, বেহুলা সমান হও" বলিয়া ভজহরি আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রামলালের স্ত্রী অনুপমা, চলনসই সুন্দরী, অঙ্গ সৌষ্টব মন্দ নয়। চেহারায় মাধুর্য্য আছে, কোমলতা আছে। সর্ব্বদাই হাস্যময়ী। বর্ণ চাঁপা ফুলের মত। মুখটি গোলগাল, জোড়া ভ্রূ, চুল ঘোর কৃষ্ণ-বর্ণ ও কোঁকড়ান। চোখ দুটি ক্ষুদ্র, নাকটি মধ্যভাগে ঈষৎ চাপা। পরনে একখানি টাঙ্গাইল শাড়ী, কাণে দুইটি হীরার পেনডেণ্ট, নাকে বড় বড় এক জোড়া মুক্তা ও একটা বড় নলকে শোভিত একটি ছোট নথ। গলায় এক জোড়া শেলির নেক্‌লেস, হাতে তীর প্যাটার্ন ছয় গাছি করিয়া বার গাছি সোনার চুড়ী। বাহুতে এক জোড়া সোনার অনন্ত, কোমরে সোনার চন্দ্রহার। সংখ্যায় অল্প হইলেও বাছা বাছা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। তাহাকে দেখিলেই সৌভাগ্য-শালিনী রমণী বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অল্পক্ষণ থাকিয়া ভজহরি সেদিনকার মত বিদায় হইলেন।

সেই দিনেই রামলাল ভজহরির বাটীতে একটা দুই সের কি আড়াই সের মৃগেল মৎস্য পাঠাইয়া দিলেন। ভজহরি ও উমাসুন্দরী মাছ দেখিয়া ভারি খুসী হইলেন। তাদের চারি পয়সার বেশী প্রত্যহ মাছ আসে না, চুনো চিংড়ী ব্যতীত অন্য মাছ জোটে না, খুব সস্তা হইলে টেংরা, না হয় পার্শে, না হয় বাটা, না হয় চারিখানা ইলিস কাটা; বড় মাছ নিমন্ত্রণ বাড়ী ভিন্ন জোটে না, তাই আজ এত বড় মাছ দেখিয়া খুব খুসী।

সে আনন্দ কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না। মাছ কুটিতে গিয়া বামা চেঁচাইতে লাগিল, এত ছোট বঁটিতে কি এত বড় মাছ কোটা যায়? যাহা হউক, যখন কষ্টে স্বষ্টে কোটার পালা শেষ হইল, তখন ভাজার পালা

সুরু। উমাসুন্দরী দেখিল, সে দিনের জন্য যে তৈল বাহির করা হইয়াছে, তাহার দশ গুণ না বাহির করিলে মাছ ভাজা যাবে না। মাছ পোড়া খেতেও ত' সুমিষ্ট নয়; তখন রাঙ্গা বৌ মহা ফাঁপরে পড়িলেন; গিলিতেও পারেন না ফেলিতেও পারেন না।

মাছের উপর লোভ আছে—বড় মাছ খাইতে বড়ই লোলুপ—আবার তেলের উপর মায়াও আছে। মাস কাবারের সময় অন্ততঃ আট দিনের তৈল কম পড়িবে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া রাঙ্গা গিন্নী মহা বিপদে পড়িলেন। অনেক চিন্তার পর, মাছ ভাজাই সাব্যস্ত হইল। খাইতে বসিয়া কর্ত্তা ভজহরির বহু সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে যে মাছ পাঠাইয়াছে, তাহারও সুখ্যাতি হইতে লাগিল।

রাঙ্গা বৌ। তা যাই বল, তোমার ভাইপোর আক্কেল একেবারেই নাই; সে বুড়ো মিন্সে যে একটা বড় মাছ পাঠাইয়া দিল, তাহার আক্কেল হইল না যে, মাছ ভাজিতে কত তেল লাগিবে। মাছ পাঠাইলে তেল পাঠাইতে হয়। আর এ ত এক বাড়ী বলিলেও চলে। যদি আমাদের মাছ খাওয়াইবার এত সাধ, রেঁধে ত' পাঠাতে পারতো। বাটী ত' লাগাও, রাস্তা দিয়ে ত' আনিতে হত না। আমার বাপ, ভাই, ভাইপো হইলে তাহারা এরূপ করিত না, আর করিলে আমি তাহাদিগকে এ বিষয়ে পরামর্শ ও শিক্ষা দিতাম। এত মাছ কি কেবল দুজনে খাইতে পারি? এ মজা কেবল বামীর, সে খুব ক'রে খাবে। আমরা না হয় তিন দিন ক'রে খাবো, তাতেও ত' তেলের লোকসান পোষাবে না। আর তেল নুন খরচ ক'রে রেঁধে অপর কাকেও বিলিয়ে খেতে পারবো না। নারীর ছেলেরা মাছ খেতে ভালবাসে বটে, তা শুধু মাছ ত' আর খাবে না; খেতে এলেই লুচির গোছা না হয় রুটির গোছা ওড়াবে।

বাস্তবিক সে দিন আসল মজা বামীর। সে পেটটা পুরে ছেঁচ্‌কি পোড়া মাছ খাইল। রাঙ্গা বৌ তাহার মাছগুলো খুব অল্প তেলে ছেঁচ্‌কি পোড়া করিয়া ভাজিয়াছিল। তা হউক, মাছটা ত' ভাল ছিল।

কিছু দিন পরে মহা ধূম-ধামে দালান মেরামত স্থরু হইয়া গেল। দালানের কাঠাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। প্রায় দশ হাজার টাকা খরচ করিয়া রামলাল জেঠা মহাশয়ের পৈত্রিক দালান মেরামত করাইলেন। জেঠা মহাশয়ের বাড়ীর অংশটা একটু মেরামত না করিলে তাহার নিজের মেরামতি বাটীর সহিত খাপ খায় না; অতএব তাহাও মেরামত করাইয়া দিলেন।

খুব ধূম-ধামে দুর্গোৎসব হইয়া গেল। অনেক আত্মীয়-স্বজন পাড়া প্রতিবেশী পাঁচ দিন ধরিয়া রামলালের বাটীতে মহামায়ার প্রসাদ পাইলেন। সকলে রামলালের ধন্য ধন্য রব তুলিল। রামলাল যে বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনে, মানে দেশের ও দশের একজন বিশিষ্ট লোক, তাহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিল। সমাজ তাহাকে একটা কৃষ্ণ বিষ্ণু বলিয়া স্বীকার করিল। খালি তাহার নামের মধ্য ভাগটা এখনও উঠিয়া যায় নাই।

এই রকম প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া রামলালের বাটীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইতে লাগিল। মহা ধূম-ধাম, লোকজনের অভ্যর্থনা ও আরাধনা চলিতে লাগিল। বহু লোকের ভূরি ভোজন হইল। রামলাল লোক মুখে ধন্য হইলেন।

তাহার জ্যেষ্ঠতাত ও মাতুল এখন তাহার ব্যয় সংক্রান্ত কার্য্যের মুরুব্বি। তবে দুইজনেই খুব চালাক, খুব হুঁসিয়ার।

দশম পরিচ্ছেদ

সেয়ানে সেয়ানে

ভজহরি ও জনার্দ্দন দু'জনেই সমান। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। তাহাদের একত্র মিলন—সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, মণিকাঞ্চনের সমন্বয়। কে উনিশ, কে বিশ, ঠিক করা দায়। দুজনেই দুজনের গুরু, কেহ কাহারও শিষ্য নহে।

প্রত্যেকেই অপরকে বিশেষ ঘৃণা করে। পাছে দুজনে আত্মবিচ্ছেদ করিলে তাহাদের নিজ নিজ কার্য্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে, সেই জন্য প্রকাশ্যে দুজনে গোবেচারীর ন্যায় থাকিতেন। তবে সুবিধা পাইলে, একজন অপরের নিন্দাবাদ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইতেন; আর সে পর-নিন্দাবাদের বিপুল নির্ম্মলানন্দ দুজনেই উপভোগ করিতেন।

রামলালের এক মাসী ছিল, তার দুই পুত্র। মাসীটি বিধবা, অর্থহীনা, অতি কষ্টে দিন-পাত করেন। রামলালের মাতামহের কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত ছিল, তাহা তাহার মাতুলই প্রাপ্ত হন; সংসার সচ্ছল ভাবেই চলিয়া যায়, তথাপি জনার্দ্দন ভুলেও কখন জীবিত বিধবা ভগিনীর বা ভাগিনেয়দের কোন তত্ত্ব লইতেন না, কখনও একটি তামার পয়সা দিয়াও সাহায্য করিতেন না। তবে মাঝে মাঝে তাহার বড় ভগ্নীটি তাহার খবর লইতে আসিলে তাকে দিয়া নিজের গা পা টিপাইয়া লইতেন। আর তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন, দেখ্ নিতাই, তুই বেশ পা টিপিস্।

নারীর ছেলেগুলো কোন কাজের নয়, ভাল পা টিপিতে পারে না, আর পা টিপিতে বলিলে পালায়। দেখ্, মাঝে মাঝে তুই খবর নিস্, কোথাও নিমন্ত্রণ থাক্‌লে তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

বাস্তবিক নিমন্ত্রণ থাকিলে ভজহরি তাহার ভাগিনেয়দের, ও পাড়ার দূর আত্মীয়ের ও পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে লইয়া যাইতেন, আর বেশ করিয়া খাওয়াইয়া আনিতেন। তবে নিমন্ত্রণের দিন হইতে পর পর অনেক দিন ধরিয়া তাদের দিয়ে গা, হাত, পা টিপাইয়া লইতেন ও অন্যান্য কার্য্য করাইয়া লইতেন। পরের বাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়া তিনি, আহার হইয়াছে কি না, এ খবর অনেকেরই লইতেন। আহার হয় নাই শুনিলে, কর্ম্মকর্ত্তাকে ডাকিয়া শীঘ্র পাতার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিতেন; অবশ্য সে পরের বাটীতে, নিজের বাটীতে ওপাঠ কখনও ছিল না।

একদিন ভজহরি, রামলালের মাতুল জনার্দ্দন ও রামলালের অনেকগুলি পারিষদবর্গ উপস্থিত। ভজহরি ঈর্ষা পরবশ হইয়া নিতায়ের কথা তুলিলেন, রামলালের মাতুলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হাঁ হে ভায়া জনার্দ্দন, তোমার ভাগিনেয় নিতাই ও বলাই কেমন আছে, আর সে ভগ্নীটী কেমন আছে? তোমার ভগ্নীপতি মারা গেলে তাহারা আছে কোথায়?

জনার্দ্দন প্রশ্নটা বড় একটা পছন্দ করিলেন না। ইচ্ছা, কথাটা শুনিয়াও না শোনেন। কিন্তু ভজহরি ছাড়িবার পাত্র নন; তিনি প্রশ্নটি আবার জোরে ও উচ্চৈঃস্বরে পুনরাবৃত্তি করিলেন। তখন জনার্দ্দন বলিলেন, আরে ভাই, সে হতভাগাগুলোর কথা বল কেন? সে ছোঁড়া দুটো অতি লক্ষ্মী ছাড়া, বোনটিও তেমনি আলক্ষ্মী। তা না হ'লে অমন সোনার বাপ, আর সোনার স্বামীকে অকালে খাবে কেন?

ভজহরি। তা'ত সত্য! তাহারা বাপের মাথা ও স্বামীর মাথা খেয়েছে বলিয়াই ত' তাদের কথা জিজ্ঞাসা করা, নতুবা তাদের খবর তাদের বাপ ও স্বামীই লইত, তোমার আমার কি?

জনার্দ্দন। তা ভাই, আমার মতে স্বতঃ সাহায্যই প্রার্থনীয়। পরে সাহায্য করিলে ছেলেদের মাটী করা হয়। ছেলেরা নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখুক, নিজেকে নিজে সাহায্য করিতে শিখুক। যে নিজেকে সাহায্য করিতে জানে ও করে, ভগবান্ তাহাকে সাহায্য করেন।

ভজহরি। সে কথা ধ্রুব সত্য। তবে কি জান ভায়া, ছেলেরা মার পেট থেকে প'ড়েই ত' আর আত্ম-সাহায্য করিতে পারে না। গাছটি যখন পোঁতো, তখন জল দিতে হয়; কাটি দিয়া সমান করিয়া বাঁধিতে হয়. গরু, বাছুর, মহিষ, ছাগল, ভেড়া যা'তে না গাছটি খাইয়া যায় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হয়। আবার গাছটি যখন প্রকাণ্ড মহীরুহ হয়, তখন সে স্বতঃ সাহায্য করিতে পারে, আর শুধু তাহা নয়, ফল, ফুল, পাতা, ছায়া ও কাষ্ঠ দিয়া শত সহস্র অপর লোককেও সাহায্য করে। তবুও গাছের বাল্যাবস্থায় তাহাকে দেখিতে হয়; সেইরূপ পশু-পক্ষীর, সেইরূপ মনুষ্য-শিশুরও।

জনার্দ্দন। আরে ভাই, মানুষ ত' আর পশু পক্ষী গাছ পাথর নয়। তাহাকে বাহিরে থেকে সাহায্য করিলেই সে আর নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে না। যদি মানুষ হবার হয়, ত' সাহায্য না করিলেও হইবে। আর তা নইলে কিছুতেই হইবে না, হবার নয়, হবার নয়।

রামনরেশ। তা মামা বাবু, আমাদের বাবুও যেমন আপনার ভাগনে, নিতাই বলাইও ত' তেমনি আপনার ভাগ্‌নে। এই দেখুন

বাবুর জন্য আপনি রোজ কত কষ্ট কচ্ছেন, রোজ খবর নিচ্ছেন। তবে নিতাই বলাইয়ের খবর রাখেন না কেন ?

জনার্দ্দন। আরে বাপু, রামলালের যে বাপও নাই আর মাও নাই, তাই তাকে দেখতে হয়।

জনার্দ্দন। আর নিতাই বলাইয়ের বুঝি পাঁচ সাতটা বাপ আছে ?

জনার্দ্দন দেখিলেন মহা বিপদ, সকলে মিলে তাহাকে কোণঠাসা করেছে। বাস্তবিক কাজটা সে ত' ভাল করে নাই। এক পোয়া সত্য ঘটনা এক সের তর্কের চেয়ে ঢের বেশী ভারি।

তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছেন কি জবাব দিবেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে পড়িল "ভজহরির ও ফলার"। তখন তিনি আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, বোন ও ভাগনেগুলো যদি ভাল না হয়, ত' সগোষ্ঠী মাতুল বংশ তাহাদের কিছুই উপকার করিতে পারে না। এই তোমার দিয়েই দেখ না ভায়া ; তোমারও ত' বিধবা ভগ্নী আছে, অনাথ ভাগনেও আছে, তুমি তাদের কিছু করতে পেরেছ কি ? কি বল ভায়া ?

ভজহরির মাথায় হঠাৎ যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি ভাবিলেন, তাই ত' তিনিও ত' তাঁহার বিধবা ভগ্নীর ও অনাথ ভাগিনেয়দের জন্য কিছুই করেন নাই। হঠাৎ তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন তিনি আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিতে লাগিলেন, তা ভায়া, এক গাছের ছাল অপর গাছে লাগে না। ভাগনেগুলো প্রায়ই অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য হয়। ভাইপোর কথা আলাহিদা, সে ত' নিজের বংশ। তাহাকে দেখিতেই হইবে, নচেৎ নিজের বংশ লোপ পাইবে। আর ভাগনেগুলোর সব পেছন দিকে পা, খালি মতলব, নিয়ে থুয়ে স'রে পড়া। আর আমি ভাগনেদের জন্য মনে মনে অনেক চিন্তা করিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম তাহাদের সুবিধা করা আমার দ্বারা হবার নয়, হইবেকও না।

জনার্দ্দন। তা যাক ভাই, ও সব হতচ্ছাড়াদের কথায় কাজ নাই। রামলাল ও তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ—আকাশ ও পাতাল; চাঁদে ও বাঁদরে; দুধে চিনি আর শাকে বালি।

ভজহরি। জনার্দ্দন ভায়া, আজ বেলা হ'য়েছে উঠি।

তার পর মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ বেটা কি বেদ্ড়া, আমি ভগ্নী ও ভাগনেদের দেখি না ব'লে বেটা এমনি কট্ কট্ ক'রে বল্লে, যেন আমার না করাটাই হাইকোর্টের নজির—১২ কলিকাতা, ১৭ বোম্বে। আরে বেটা, আমি যাই করি না, তো বেটাদের কি? তোরা করিস্ না কেন, তার জবাব কি? মানুষের চোখে ধূলো দিচ্ছিস্, ভগবানের কাছে কি জবাব দিবি? যদি ভগ্নী ও ভাগনেদের না খাওয়াইলে খোরাকি নালিশ চলিত, তবে এ বেটারা খুব জব্দ হইত। আর আমার কি, আদালত হইলে হুকুম হইলে আমি না হয় পাঁচ, সাত, দশ টাকা মাসে মাসে দিলাম। মনে করিয়াছিলাম, অবর্ত্তমানে গরীবদের জন্য কিছু দিয়া যাইব; তা না হয় সেই টাকা থেকে এখনই কিছু কিছু দিয়া যাইব। কিন্তু বাবা, ইচ্ছা ক'রে জীবিত অবস্থায় কিছু দিতে পারব না। তবে আদালতের হুকুম, সে ত' অমান্য করিতে পারিব না, হুকুম মত কার্য্য করিতেই হইবে। এই দেখ না বাবা, বাপের সম্পত্তি না থাকলে আদালত হইতে মায়ের খোরাকির হুকুম হয় না, তাই অনেক উপযুক্ত পুত্র সে দায় হইতে অব্যাহতি পান; নিজের ইচ্ছাতে ত' দেনই না, আর আদালত হুকুম জারি করেন না, কাজে কাজেই হুকুম জারির ভয়েও দেন না। পোড়া ছাই, আগে শাস্ত্রকারেরা কি জানিতেন, এমন উপযুক্ত পুত্র সব জন্মাবে যে, আদালতের হুকুম ছাড়া কাজ কর্ব্বে না, তাহা হইলে আমাদের শাস্ত্রকারেরা ও আইন-কর্ত্তারা তাহার বন্দোবস্ত করিতেন, আইনের পেষণে খোরাকি বাহির করিতেন।

এখন জোর খালি আইনের, আর কিছুরই জোর নাই। এই সেদিন রাঙ্গা বৌ বল্লে, তাহার মাসতুত ভগ্নীপতি মারা গিয়াছে, তাহার ছেলে মেয়ে অনেক গুলি নাবালক, তা কি ক'রে খাবে। অনেক তর্ক বিতর্কের পর সে হুকুম দিলে, অন্ততঃ একটি আধুলি দিতে হবে; কি করা যায়, পত্র পাঠ হুকুম তামিল করিতে হইল। ব'লে রেখেছি, মাসকাবারের পরে আট আনা দিব, মাসকাবার ত শ্রাদ্ধের পরেই। আর শ্রাদ্ধে কিছু দেওয়া যেত, না হয় তার পর কিছু দেওয়া যাবে। হ্যাঁ গা বল্‌তে পার, গৃহিণীদের গরীব আত্মীয় স্বজন থাকে কেন? গরীব হউক আর বড়লোক হউক, আত্মীয় স্বজন থাকলেই খরচ আছে। স্ত্রীগুলো যদি গাছের ফল হতো; গাছ থেকে ভেঙ্গে আনো বা কিনে আনো,—তা হ'লে অনেক ঝঞ্ঝাট কমিয়া যাইত, অনেক বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়া যাইত। আগে শুনেছি, স্ত্রীরত্ন কিনিতে পাওয়া যাইত, বেবিলনের বাজারে বিক্রী হইত। সে এক রকম ছিল ভাল। একবার কিছু খরচ করিলে নিশ্চিন্ত; রোজ রোজ বৃথা খরচ আর লাগিত না।

(প্রকাশ্যে) আসি বলিয়া ভজহরি সেদিন উঠিয়া বাঁচিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাতারাতি বড়লোক

শেয়ার মার্কেট অতি ভয়ঙ্কর স্থান। এখানে কত সহস্র সহস্র লোকের ধ্বংস হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত ধনী আসিয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন, কত লোক আশার পসরা মাথায় করিয়া আনিয়া নিরাশা বোঝাই করিয়া লইয়া গিয়াছে। কত ধার্ম্মিক অধর্ম্মী হইয়াছেন, আর কত জুয়াচোর ধনী হইয়াছে। ইহা ভদ্র সন্তানের মৃত্যুর পাহাড়, এখান হইতে ভদ্র সন্তান নিরাশা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করেন।

অনেক সময়ে বুঝা দায় যে এখানে লোকের বেশী সর্ব্বনাশ হয়, না হাইকোর্টের উকিল পাড়ায় বেশী সর্ব্বনাশ হয়; শেয়ার ব্রোকারের আফিসে বেশী লোকের সর্ব্বনাশ হয়, না হাইকোর্টে এটর্ণী আফিসে বেশী সর্ব্বনাশ হয়। দুই স্থানই প্রায় তুল্য মূল্য; কে বড়, কে ছোট বলা দায়। তবে শেষোক্ত দল গভর্ণমেণ্টের আদেশ প্রাপ্ত, আর প্রথম দল মিউনিসিপ্যালিটির লাইসেন্স প্রাপ্ত।

যদি দুইটি স্থানই বিপদ্‌সঙ্কুল, দুইটির একটি হইতেও মানুষকে উদ্ধার করিবার উপায় নাই, দুই স্থানেই মানুষ অগ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় গিয়া পড়ে; স্বচক্ষে দেখিতেছে সহস্র সহস্র লোক অগ্নিকুণ্ডে পড়িতেছে, পুড়িতেছে, মরিতেছে, আত্মীয় স্বজনকে পোড়াইতেছে, তবু আবার নূতন দল আসিতেছে, পড়িতেছে, পুড়িতেছে, ছাই হইয়া

যাইতেছে, তবে ইহা কেন হয়? ইহার কারণ আর কিছু নহে, কেবল অতিশয় লোভ, দুর্দ্দমনীয় আশা, বিপুল দুরাশা, লাভেরমোহ, রাতারাতি বড় লোক হইবার স্পৃহা আর প্রভূতধনলাভের আকাঙ্ক্ষা।

যতদিন মানবের লোভ, অবৈধ লালসা, অল্প আয়াসে অতিশয় লাভের মোহ থাকিবে, ততদিন মানুষ শেয়ার মার্কেটে পুড়িয়া মরিবে। দেখিবে সহস্র সহস্র লোক এই শেয়ার মার্কেটের আগুণে ঝাঁপ দিয়া পুড়িতেছে, মরিতেছে; তাহা দেখিয়াও আবার সহস্র সহস্র মানুষ সেই আগুনে ঝাঁপ দিবে। সকলেই ভাবিতেছে, রাম পুড়িয়া মরিল, কারণ রাম হুঁসিয়ার নয়; আমি রামের অপেক্ষা অনেক হুঁসিয়ার, অতএব আমি পুড়িব না। সহস্র সহস্র লোক ভাবিতেছে, শতকরা নিরানব্বই জন পুড়িয়া মরিতেছে, শতকরা এক জনও ত প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করিতেছে। কে বলিবে, আমি ওই একজন নহি। এইরূপ চিন্তার ফলে সহস্র সহস্র লোকের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ, সহস্র লোকের মৃত্যু। এই যে শেয়ার মার্কেট, ইহা যে কত সহস্র লোকের অস্থিচর্ম্মের উপর স্থাপিত, তাহা কে বলিতে পারে।

অতিলোভ যে সকল দুঃখের মূল। একজন ভুক্তভোগী এ কথাটি আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন।

আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সরকারের তরফ হইতে ১১০ ধারার একটি মোকর্দ্দমা চালাইতেছিলাম। তাহাতে দশজন আসামী ছিল। তাহারা ধারাবাহিক জুয়াচুরি করিয়া বহুলোককে ঠকাইয়া আসিতেছে, এই অভিযোগে বিচারাধীন। যে সকল লোক প্রতারিত হইয়া ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য। দুইজন পাশকরা ডাক্তার, একজন পাশকরা ইঞ্জিনিয়র, দুইজন ব্যবসাদার, আর একজন কবিরাজ। সকলেরই কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী উপনগরীতে বাস।

সকলেই নিজের পেসা করেন, কেহ বিশ বৎসর, কেহ পনর বৎসর পেসা করিতেছেন।

এই নসোরিয়া জুয়াচোরের দল নিম্নলিখিত ভাবে কার্য্য করিত। একজন রাজা সাজিত, এক জন তার ম্যানেজার, একজন মন্ত্রী, এক জন রাজবাটীর ছেলেদের মাষ্টার। তাহারা সার্কুলার রোডের ধারে একটা প্রকাণ্ড বাটী ভাড়া লইয়াছিল। দরজায় সেপাই শান্ত্রী। বাটীটি পরিপাটী করিয়া সাজান, দেখিলেই রাজবাটী বলিয়া ধারণা হয়।

তাহাদের দলের একজন লোক যাইয়া অনেক দূর হইতে ডাক্তারকে ডাক দিল, রাজার বাটীতে ব্যারাম। ডাক্তার আসিলেন। রোগী ব্যস্ত, ডাক্তারের সহিত দেখা করিতে পারিল না। ডাক্তার বাবু নিজ পাড়ায় দুই টাকা দর্শনী পান। যদিও রোগীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হইল না, তবুও তাঁহাকে আট টাকা দর্শনী দেওয়া হইল। তিনি অম্লান বদনে তাহা গ্রহণ করিলেন, কোন ধোঁকা বোধ করিলেন না। তিনি যখন চলিয়া যান, তাঁহাকে বলিয়া দেওয়া হইল, আগামী পরশু তিনি যেন রাজার সহিত দেখা করেন, তাঁহার এক বন্ধুর অসুখ। রাজা ব্যস্ত থাকিলে রোগী দেখা না হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার দর্শনীর কোন অসুবিধা হইবে না, তিনি তাঁহার প্রাপ্য আট টাকা রাজবাটীতে পদার্পণ করিলেই পাইবেন।

দ্বিতীয় দিন ডাক্তার বাবু আসিলেন, রাজা ব্যস্ত, দেখা হইল না; রোগী কোথায়, আর রোগী কে, তাহাও জানিলেন না। কিন্তু ম্যানেজারের কাছ থেকে আট টাকা দর্শনী পাইলেন, আর অনেক লোক দেখিয়া চলিয়া গেলেন।

চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে খুব ব্যস্ততার মাঝখানে ম্যানেজার, ডাক্তার বাবুকে বুঝাইয়া দিলেন, রাজা একজন বোকচন্দ্র। অনেক ধনের

অধীশ্বর, টাকাকে টাকা জ্ঞান করেন না, খোলামকুচির চেয়েও অকিঞ্চিৎকর মনে করেন, আর বৃথা কার্য্যে টাকা ব্যয় করেন। এই দেখুন না কেন, বন্ধুর ব্যারামের জন্য আপনাকে দুইটি কল্ দিলেন, দুইটি দর্শনীও দিলেন। রোগী দেখাইবার অবসর নাই, তবে জুয়া খেলিতে আর হারিতে খুব মজবুত। যে কোন লোক আসিয়া নূতন ধরণের জুয়ার কথা বলিলেই, তিনি তাহার সহিত খেলিবেন- আর হারিবেন। এইরূপ করিয়া লোক তাঁহার নিকট হইতে সহস্র সহস্র মুদ্রা জিতিয়া লইয়া যাইতেছে। এমন বোকা রাজাও জন্মায়! পয়সাটা একেবারে লুটিয়ে দিলেন। আমরা মশাই খালি চাকরী করতে এসে কিছু করতে পাল্লেম না।

ডাক্তার বাবু কলিকাতায় বিশ বৎসর ধরিয়া রোগী দেখিয়া চালাইতেছেন। বিনা প্রয়োজনে রোগীর বাটী আসিয়া দুটো পাঁচটা বেশী দর্শনীও লইয়াছেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও পয়সা করিতে পারেন নাই। স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রভূত অর্থসঞ্চয় হয় নাই। তিনি এত দিন পেসা করিয়াও ম্যানেজারের কথার শাদা মানে বুঝিলেন। তিনিও বুঝিলেন, রাজাটা অতিশয় বোকা।

শেষে ম্যানেজার বলিলেন, যাক্ মশায়, আমাদের ছোট মুখে বড় কথার প্রয়োজন নাই। আপনি আজ আসুন। আজ আর রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। আপনি আগামী পরশু প্রাতে ৮ টার সময় আসিবেন; দেখি, যদি রাজাবাবুর সহিত দেখা করাইয়া দিতে পারি। রাজার সহিত দেখা হইলে, রোগীর কথা তিনি নিজেই আপনাকে বলিবেন; না হয় আপনার দর্শনী ত মারা যাইবে না। তবে দেখবেন মশায়, অসুখ আদির সময় গরীবের বাটীতে অল্প দর্শনীতে দেখিবেন। আমরা গরীব লোক, আপনার পুরা দর্শনী দিতে পারিব না।

ডাক্তার বাবু, তা দেখিব বৈ কি, তা দেখিব বৈ কি, বলিয়া সে দিন চলিয়া গেলেন।

তার পর এক দিন বাদে, প্রাতে আটটার সময় রাজবাটীতে পদার্পণ করিলেন। লোভ, কার্য্য না করিয়া আট টাকা দর্শনী। ভাবিলেন না, তাঁহার দর্শনী দুই টাকা, সেত রোগী দেখিলে, আর ঔষধের ব্যবস্থা করিলে; তাঁহাকে কেন রোগী না দেখাইয়াই আট টাকা দর্শনী দেয়। তাও এক দিন নয়, তিন দিন। কিন্তু লোভে, লালসায় তিনি সেটা বুঝিলেন না ও দেখিলেন না।

তৃতীয় দিবস আসিয়া দেখেন, ম্যানেজার বসিয়া আছেন, তাঁর কাছে আর একজন লোক। ডাক্তার বাবু জাতিতে ব্রাহ্মণ। ডাক্তার বাবুকে দেখিয়াই ম্যানেজার একটি প্রণাম করিয়া আসুন, আসুন বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

ডাক্তার বাবু বসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ম্যানেজার বাবু, আজ কি রাজা বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হবে? আর রোগী বা কেমন?

ম্যানেজার বাবু বলিলেন, বসুন মহাশয়, দেখি কি হয়।

ডাক্তার বাবু বসিলে, ম্যানেজার তাঁহাকে আপনার সুখদুঃখের কথা শুনাইতে লাগিলেন। এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে এক জন লোক সেইখানে আসিয়াই বসিলেন। তাঁহার হাতে একটি কোরিয়ার ব্যাগ, সাজসজ্জায় বেশ ভাল, পরনে ধোপদস্ত কাপড়, গায়ে ধোপদস্ত পিরাণ, আর পায়ে একজোড়া জুতা। তিনি ম্যানেজার বাবুকে, রাজা বাহাদুর কোথায়, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন, ম্যানেজার বাবু, আমি একটা নূতন খেলা শিখিয়া আসিয়াছি; রাজাকে ব'লে একবার আমার সহিত খেলিয়ে দিন; তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

ম্যানেজার বাবু বলিলেন, তা বাবু, খেলিলেই আপনি কিছু মেরে নিয়ে যাবেন, আমার তাতে লাভ কি ?

অনেক তর্ক বিতর্কের পর ম্যানেজার বাবুতে আর আগন্তুক ভদ্রলোকটিতে এই স্থির হইল যে, সে ঠকই হউক আর জুয়াচোরই হউক, অধর্ম্মশীলই হউক আর কুকর্ম্মরতই হউক, খেলিয়া যাহা জিতিবে, তাহার চারি অংশের এক অংশ ম্যানেজারকে দিয়া যাইবে।

এইরূপ স্থির হইলে পর, ম্যানেজার বাটীর ভিতর গেলেন ও কয়েক মুহূর্ত্তের পর ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন, রাজা বাহাদুর আসিতেছেন।

ম্যানেজার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, মথুরাবাবু, আজ কত টাকা আনিয়াছেন ? মথুরাবাবু ব্যাগ খুলিয়া একতাড়া নোট দেখাইলেন। তাহার একখান একশত টাকার নোট। বাকিগুলি নোটের মতই কাটা ; তবে তাহা ম্যানেজারকে খুলিয়া দেখাইলেন না। ম্যানেজার বলিলেন, তা খুব ভাল।

মুহূর্ত্তকাল পরেই প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক একজন ভদ্রলোক বেশ সাজ সজ্জা করিয়া বাহিরে আসিলেন, তার সঙ্গে তিন চার জন লোক। আসিবামাত্রই আগন্তুকটি, ম্যানেজার ও অপর লোকটি 'রাজা বাহাদুর' 'রাজা বাহাদুর' বলিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা বাহাদুর আসিয়া একটি সুবৃহৎ ঢালা বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন। অপর সকলেই সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া পড়িল। রাজা বাহাদুর মথুরা বাবুর দিকে চাহিয়া, কিহে মথুরা বাবু যে, তবে আজ যে অনেক দিনের পর, বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন।

মথুরা বাবু। রাজা সাহেব, আজ একটি নূতন খেলা শিখিয়া আসিয়াছি। আসুন, একবার দেখি, মহারাজের কাছ থেকে কিছু পাই কি না।

রাজা সাহেব। তুমি বড় অসময়ে আসিয়াছ। আমি আজ বড় ব্যস্ত আছি।

(ম্যানেজারের দিকে চাহিয়া) কিহে, রমণীবাবুর জন্য ডাক্তার ডাকা হইয়াছে ?

ম্যানেজার। আজ্ঞে হাঁ, আজ তিন দিন থেকে তিনি আসিতেছেন, আর ফিরিয়া যাইতেছেন। এই ডাক্তার বাবু এই খানেই উপস্থিত।

রাজা সাহেব। ডাক্তার ফিরে যাচ্চে তা তোমার কি ? আমার সুবিধা হবে, তবে ত তার সঙ্গে দেখা করব। তোমার অত ছোট নজর কেন ? দেখি, যদি সুবিধা হয় ত আজ তার সঙ্গে কথা কব, তা না হইলে আর এক দিন আসিবেন।

(আর একজন যে বসিয়াছিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া) কিহে, নবু, থিয়েটার রোডের...কি হইল ? আমি বিশ লক্ষ অবধি উঠিলাম তবু ক'রে দিতে পারলে না। ছি, তোমরা কোন কাজের নও।

নবকিশোর। আজ্ঞে, আমার আর অপরাধ কি ? আমি ত রোজ যাতায়াত করিতেছি, তবে জায়গা প্রায় বার বিঘে, পঁচিশ লক্ষ টাকার কম দিবে না।

রাজা সাহেব। (আর এক চসমাধারী ভদ্রলোককে উদ্দেশ করিয়া) কিহে বক্কেশ্বর, ঐ শেলির নেকলেসটা দেড় লক্ষ টাকা বলিলাম তবু হ'ল না। রাণী সাহেবার পচ্ছন্দ হ'য়েছে তাই, তা না হ'লে ওরকম জিনিস শওয়া লক্ষ টাকায় পাওয়া যায়।

বক্কেশ্বর। কি করব খোদাবন্দ, আমার কি অসাধ। তবে বনবন কপূর দুই লক্ষ টাকার কমে বেচ্‌বে না। শেষে অনেক ধস্তাধস্তির পর যখন তাহাকে বলিলাম, রাজা সাহেবকে খুসী রাখ, তা হ'লে বছরে দশ লক্ষ টাকার জিনিস বেচিয়ে দেব, সেই শুনে এক লক্ষ

পঁচাত্তর হাজার টাকায় রাজি হইয়াছে। যদি বলেন ত আজ ক্লোজ ক'রে দি।

রাজা সাহেব। কি কর্‌ব, রাণী সাহেবার আব্দার। আচ্ছা, তাই ক'রে দাও।

(মথুরা বাবুর দিকে লক্ষ্য করিয়া) আচ্ছা, মথুরা বাবু, আমি এক দান খেলিব, ১০ মিনিটের বেশী নয়। কত টাকা এনেছ?

মথুরা বাবু। আজ্ঞে, ৮০০০ টাকা।

রাজা সাহেব। আচ্ছা, বেশ। ম্যানেজার ৮০০০৲ টাকার নোট দাও।

ম্যানেজার রাজার হাতে নোট দিল। তখন মথুরাবাবু কয়েকটি ছোট এলাচি বাহির করিল। খেলা সুরু হইল। দশ মিনিটের মধ্যেই রাজা সাহেব হারিয়া গেলেন। হারিয়াই উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, আজ আর আমার সময় নাই। এই বলিয়াই উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। ম্যানেজার মহাশয় মাথায় হাত দিলেন ও বলিয়া উঠিলেন, এ রকম ক'রে আর বেশী দিন ম্যানেজারি করতে হবে না, রাজত্ব আর বেশী দিন চলবে না।

মথুরাবাবু ইতিমধ্যে রাজা সাহেবের কাছ থেকে যে ৮০০০৲ টাকা জিতিলেন ও নিজের কাছে যে টাকা ছিল সব তাড়াতাড়ি ব্যাগে পুরিয়া চলিতে লাগিলেন। ম্যানেজার বাবু চাপা গলায় 'মথুরবাবু', 'মথুরবাবু', বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, আর 'আমার বখ্‌রা দিয়া যান, আমার বখ্‌রা দিয়া যান' বলিতে লাগিলেন।

আমি খেলে জিতেছি, তোমায় দিব কেন হে, হারলে কি তুমি আমায় তার খেসারত দিতে?—এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

তখন ম্যানেজার বাবু, ডাক্তার বাবু ও অপরাপর লোককে উদ্দেশ

করিয়া বলিলেন, দেখলেন মহাশয়, জুয়াচোরের কাণ্ড দেখলেন। আমিই ওকে পাওয়াইয়া দিলাম আর আমাকেই ফাঁকি! এ কি ধর্ম্মে সয়! আমি সহিলাম, ধর্ম্মে সহিবে না। বিশ্বাসঘাতকতা! এইরূপ করিয়া হাহুতাশ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি ডাক্তার বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, ডাক্তার বাবু আমার মহাবিপদ। আমার একটি বার বৎসরের মেয়ে গলায় গলায়। ব্রাহ্মণের ঘরে একটু দেখে শুনে দিতে গেলে অন্ততঃ ছ হাজার টাকা লাগিবে। মোটে আমার আড়াই হাজার যোগাড় হইয়াছে, বাকি টাকার কি করি? যোগাড় না হয়, তবে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নষ্ট হয়। দেখুন, আমার হাত দিয়ে রোজ হাজার হাজার টাকা যাইতেছে, আমি লোককে পাওয়াইয়া দিতেছি। আর এমনি বেইমানের কাল যে আমাকেই ফাঁকি! দেখুন, আমার সহিত রাজা সাহেবের চাকর মুনিব সম্বন্ধ। আমি ত আর তাহার সহিত খেলিতে পারি না। তাহা হইলে এক দিনে এসব টাকা তুলিয়া লইতাম। যদি কোন ভদ্রলোক পাই, তাহা হইলে তাহার যথেষ্ট কিছু হয়, আর আমার যৎকিঞ্চিৎ হয়; আর ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বজায় থাকে। ডাক্তারবাবু, তা মুস্কিল কি জানেন, লোককে বিশ্বাস করা, লোক ঠিক করা। এই দেখুন না কেন, আপনার সাক্ষাতে মথুরা বাবুকে আট হাজার টাকা পাওয়াইয়া দিলাম, তাও দশ মিনিটে, ডাক্তার বাবু, দশ মিনিটে। সে আমার কাছে—আমি কুলীন ব্রাহ্মণ, শূদ্রের জলস্পর্শ করি না—আমার ন্যায় সদ্‌ ব্রাহ্মণের কাছে সত্য ক'রে ফাঁকি দিয়ে পালাল। ডাক্তার বাবু, এ কলিতে লোক চেনা বড় দায়। তা বাবু, আপনাকে দেখিয়া ভদ্রলোক বলেই মনে হ'চ্ছে, আপনি একটা কাজ করুন না। কিছু টাকা নিয়ে আসুন, খেলিয়া কিছু জিতিয়া যান। বরং আমায় কিছু অংশ দিবেন, আমি আপনাকে জিতাইয়া দিব।

ডাক্তার বাবু। তা বটে, আমি ভদ্র লোকের ছেলে, আপনার সহিত প্রতারণা করিব না। আপনি আমায় টাকা পাওয়াইয়া দিবেন, আর আপনার সঙ্গে দাগাবাজি! তাহা কি কখন, ম্যানেজার বাবু, ধর্ম্মে সহে! তবে কি জানেন, আমি ত খেলা জানি না।

ম্যানেজার। আরে মশায়, খেলা আবার জানাজানি কি? আমি আপনাকে ইসারা দিব। এই বক্কেশ্বর বাবু আপনার সাহায্য করিবেন। জিত ত আপনার নিশ্চয়ই। আরে মশায়, হাজার হাজার লোক জিতে যাইতেছে, আর আপনি ভাববেন? শুনুন মশায়, আমি যার উপকার করি, প্রাণ দিয়েই করি। এই আমার স্বভাব তাতে ভালই বলুন আর মন্দই বলুন। আর বংশ পরম্পরায় এইরূপ পরের উপকার করিতে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হই, তাহাও স্বীকার। এই পরোপকার ব্রতই আমার পুরুষ পরম্পরার ধর্ম্ম, এতে ক্ষতি হয় হউক। তা শুনুন ডাক্তারবাবু, আমার মন বলছে, আপনি আমার সহিত বেইমানি করিবেন না; আর মনই অন্তর্যামী ও নারায়ণ। অতএব আমি এ কাজ করবই, তা আপনি আমায় কিছু দেন আর নাই দেন। তা আপনি এক কাজ করুন, যোগাড় যন্ত্র ক'রে আট হাজার টাকা লইয়া আসুন। আমি আমার সঞ্চিত, মেয়ের বিবাহের জন্য দুই হাজার টাকা আপনাকে দিব, সে ত কেবল আধ ঘণ্টার জন্য। আপনি দশ হাজার টাকা লইয়া খেলুন, তাহাতে বিশ হাজার পাইবেন; আমাকে পাঁচ হাজার দিবেন, আপনি পনর হাজার লইবেন। আধ ঘণ্টায় সাত হাজার টাকা, ডাক্তার বাবু। সব সময়ে ডাক্তারিতে ত আর হয় না; ভগবানের দিব্য আপনাকে এ কাজ করিতেই হইবে। সাত হাজার টাকা আপনার কিছুই নয়, কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্ত আমার ন্যায় গরীব ব্রাহ্মণের তিন হাজার

টাকাই যথেষ্ট। আর দেখুন "ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণো গতিঃ"। আপনি এতে অমত করিবেন না।

আরও অনেক কথাবার্ত্তার পর, কিরূপভাবে খেলিতে হইবে তাহা শিখিয়া, ডাক্তারবাবু সেদিনকার মত সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

যাইবার সময় ম্যানেজার তাড়াতাড়ি বাক্স হইতে আট টাকা বাহির করিয়া ডাক্তার বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, আপনার দর্শনীর টাকা মারা যাবে কেন? তবে আগামী সোমবার বেলা আটটার সময় এখানে আসিবেন। আজ বুধবার এখনও পাঁচদিন আছে। যদি সব টাকা যোগাড় না থাকে, তবে এই পাঁচ দিনের ভিতর বাকি টাকাটা যোগাড় করিয়া আনিবেন। এক দিনের কড়ারে আনিবেন; বাস, তা হ'লেই কর্ম্ম ফতে। তবে দেখবেন মশায়, গরীবের গলায় ছুরি দেবেন না।

নির্দ্দিষ্ট বুধবারে ডাক্তারবাবু টাকা লইয়া আসিলেন। টাকা ত ঘরে বসান ছিল না, স্ত্রীর অলঙ্কারাদি বন্দক দিয়া দুই হাজার, পৈত্রিক কোম্পানির কাগজ (৫০০০৲ হাজর টাকার) বেচিয়া তিন হাজার, আর দুই হাজার এক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের কাছ হইতে ঋণ করিয়া (ইঁহার বাড়ীতে ডাক্তার বাবু আজ বিশ বৎসরের গৃহচিকিৎসক), আর তাহার এক আত্মীয়ের মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের দেয় টাকা হইতে এক দিনের কড়ারে এক হাজার, একুনে আট হাজার লইয়া লোয়ার সার্কুলার রোডে রাজা সাহেবের বাটীতে আসিয়া হাজির।

ডাক্তার আসিলে পর ম্যানেজার তাহার হাতে দুই হাজার টাকা দিলেন। রাজাসাহেব আসিলেন। অন্য অন্য লোকও উপস্থিত হইল।

দশ লাখ বিশ লাখের কেনা বেচার কথা; তার পর খেলিতে খেলিতে প্রথমেই দশ হাজায় জিত। মহা আনন্দ,—জীবনে বুঝি এত আনন্দ, ডাক্তার বাবু আর কখনও পান নাই।

রাজা চলিয়া যাইবেন আর খেলিবেন না, বক্কেশ্বরের ও ম্যানেজারের প্ররোচনায়, ও ডাক্তার বাবুর আগ্রহাতিশয্যে রাজা সাহেব আর একবার খেলিতে রাজি হইলেন।

এবারে বিশ হাজারে পঁচিশ হাজার টাকা বাজী। যেমন খেলা অমনি হারা। ডাক্তার বাবু পঁচিশ হাজার হারিলেন। রাজা সাহেব পঁচিশ হাজার টাকা জিতিয়া ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর আপনার টাকা আছে? ডাক্তারবাবু একেবারে হতভম্ব। তখন রাজা সাহেব বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

বক্কেশ্বর তখন ডাক্তার বাবুকে বলিলেন, ডাক্তার বাবু, বাকি পাঁচ হাজার টাকার কি হবে? যেমন এই কথা বলা, আর ডাক্তার বাবুও নিজের অবস্থা মনে মনে অনুশোচনা করিতেছেন, এমন সময় দীর্ঘে ছয় ফুট, প্রস্থে তিন ফুট বিকটাকার এক মুর্ত্তি সেইখানে উপস্থিত। ডাক্তার বাবু তাহাকে দেখিয়াই ভীত ও ত্রস্ত।

ম্যানেজার বাবু তখন ডাক্তার বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ডাক্তার বাবু, আর ভাবিতেছেন কি? আজকে যা হবার হইয়া গেল, আবার টাকাটা ত তুলিতে হইবে। আপনি পাঁচ হাজার টাকার একটি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিন। আমার দুই হাজারও আপনার কাছে রহিল। এর পর আর একদিন খেলিয়া টাকাটা উসুল করিতে হইবে।

ডাক্তার বাবু রকম সকম দেখিয়া বুঝিলেন, সেই কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ। তখন তিনি বক্কেশ্বর বাবুর নামে একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিলেন। তাহাতে আরও লেখা রহিল যে, তিনি স্বইচ্ছায় জুয়া খেলিয়া হারিয়াছেন। তাহার কাছে টাকা নাই; সেই জন্য তিনি সুস্থ শরীরে ও বিনা অনুরোধে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতেছেন।

আট হাজার টাকা নগদ দিয়া ও পাঁচ হাজারের হ্যাণ্ডনোট দিয়া ডাক্তার বাবু সেইদিন সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

সেইরূপে ইঞ্জিনিয়ারকেও ডাকান হইয়াছিল। রাজা সাহেবের এক প্রকাণ্ড বাড়ী প্রস্তুত হইবে। কার্য্য প্রায় বারলক্ষ টাকার। তিনি সময়ে যাহাতে সুচারুরূপে কার্য্য শেষ করিতে পারেন, সেইজন্য তাহাকে পঞ্চাশহাজার টাকা গচ্ছিত (Security Deposit) রাখিতে হইবে।

তাঁহার পাঁচ সাত দিন আনাগোনার পর, ডাক্তার বাবু যে সব দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার বাবুও সেই সব দেখিলেন ও শুনিলেন। সেই ম্যানেজারের আত্মীয়তা, আর দশ সহস্র টাকা জুয়ায় হার।

কবিরাজ মহাশয়েরও সেই দশা। ব্যবসায়ীদেরও অবস্থা তদ্রূপ। তবে টাকার হার কম আর বেশী।

যিনি ম্যানেজার সাজিতেন, তিনিই নসোরিয়া দলের নেতা। তাঁহার নাম হরদম খোস, তিনি, একজন বেহারী। এ দলের রাজা সাহেব সাজিতেন একজন বাঙ্গালী।

আমি কৌতূহল পরবশ হইয়া তাহার সহিত হাজতে সাক্ষাৎ করিলাম। আমি পূর্ব্বে চার পাঁচ বার ফেলজামিনী মোকর্দ্দমায় তাহাকে খালাস করিয়াছিলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, হরদম খোস, তোমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছ, তোমরা জবায়ের জন্য বরাবর এতগুলো বোকা লোক কোথা হইতে পাও।

হরদম খোস। হুজুর, আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। আমরা যাদের জবাই করি তাহারা বোকা নয়, বেশ চালাক। তাহাদের যে বলি হয়, তা তাদের বোকামির জন্য নয়, অতিশয় লোভের জন্য। আমাদের

তাহাদিগকে খুঁজিতে হয় না, তাহারাই আমাদিগকে খুঁজিয়া লয়। তাহারা বিনা পরিশ্রমে, অল্পায়াসে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে ধনী হইতে চাহে। যে কোন কার্য্যেই হউক, বিপুল অর্থ অর্জ্জন করিতে হইলে তাহার জন্য মূলধন চাই, পরিশ্রম চাই, অনেক বৎসর ধরিয়া শিক্ষা চাই। কিন্তু এই অতিলোভাতুররা বিনা পরিশ্রমে, অল্প সময়ের মধ্যে, এমন কি, একদিনে কিছু টাকা খাটাইয়া ধনী হইতে চায়। যাহা হইবার নয় তাহাই তাহারা করিতে চায়, ফলও তদ্রূপ হয়। তবে হুজুর আপনাদের আইন এইরূপ এক তরফা যে, আমরা হ'লাম জুয়াচোর, নসোরিয়া, সমাজকীট, বদমায়েস; আর তাহারা হ'ল ভদ্র, শিক্ষিত, গোবেচারা, আর আমাদের হাতের বলি। উদ্দেশ্য দুই দলেরই এক; কোন প্রকারে এক দলকে ঠকাইয়া বিনা পরিশ্রমে অল্প সময়ের মধ্যে টাকা রোজগার করা। একবার এক হাকিম এইরূপ মতেই রায় দিয়াছিলেন; আমাদের দলকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সরকার আমাদের প্রতি এক চোখো ব্যবহার করেন ও আমাদের প্রতি শত্রুতা-সাধন করেন। আর আপনারাও আমাদের প্রতি অন্যায় ও একচোখো ব্যবহার করেন। আপনারা আমাদেরই জুয়াচোর বলেন, যাহারা আমাদের ঠকাইয়া টাকা রোজগার করিতে আসে, তাহাদের আপনারা ভদ্রলোক বলেন। তাহার একমাত্র কারণ, তাহারা ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর তাদের পাঁচটা মুরুব্বি আছে, বুকের পিঠের লোকও আছে। যদি তাহাই হয় তবে আমাদের মধ্যেও অনেকে ভদ্র বংশে জন্মিয়াছেন। সরকার কিম্বা আপনারা ত আমাদের প্রতি সহানুভূতি করেন না। আমরা যে সব লোককে জবাই করি, তাদের জবাই হইবার প্রধান কারণ তাদের ধর্ম্মহীন শিক্ষা, ধর্ম্মহীন অর্থ পিপাসা, অতিরিক্ত অর্থলোভ। সেই অমানুষিক ধনলিপ্সাতে তাহারা পুড়িয়া মরে।

আর দোষ হয় আমাদের। যাহা হউক, সরকার এই সঙ্গত হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল করিলেন। হাইকোর্ট আবার আমাদের সেই দলের লোকদিগকে সাজা দিলেন। আমরা বলি, কেবল এক দলের সাজা হওয়া অন্যায় ও পক্ষপাতিত্ব দোষে দূষিত। সরকার যদি সাজাই দেন, ত দুই দলকে সাজা দিন, দুই পক্ষই সমান দোষী। তাই বলিতেছিলাম যে, যতদিন মানুষের ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন ধনলিপ্সা প্রবল থাকিবে, যতদিন মানুষ অমানুষিক ও অস্বাভাবিক লোভে অভিভূত হইবে, ততদিন আমাদের বলির জন্য লোকের অভাব হইবে না, ততদিন তাহারা আমাদিগকে খুঁজিয়া লইবে, আমাদের হস্তে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিবে ও স্বেচ্ছায় আপনাদিগকে বলি দিবে। আপনারা আমাদের পিছনে না লাগিয়া যদি অপর দলের ধর্ম্মহীন শিক্ষার পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, যদি অপর দলকে নিরতিশয় লোভ ত্যাগ করিতে বলেন, তাহা হইলে সমাজের অনেক উপকার করা হয়, আর আমরাও এই সব লোকের অভাবে কোন সৎকার্য্যে আত্মসমর্পণ করি। দেখুন হুজুর, আমিও ভদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বিদ্যালয়ে পড়িয়া দুটো পাসও করিয়াছিলাম, বাপের কিছু সংস্থানও ছিল, কিন্তু কখনও ধর্ম্ম শিক্ষা পাই নাই, ফল কি বিষময় হইল! সঙ্গদোষে, শিক্ষাদোষে ও আশু সুখের আশায় "পূর্ব্বধনম্ বিনশ্যতি" হইল, গুরুজনের সৎ পরামর্শ পাপকলুষিত কর্ণে প্রবেশ করিল না। আশু সুখের আশায় সব হারাইলাম। মনে এমন ক্ষমতা ও সৎসাহস ছিল না, যাহাতে ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বর্ত্তমানে কষ্ট সহ্য করি। ভবিষ্যৎ সুখের জন্য বর্ত্তমানে কষ্ট সহ্য করিতে রাজি নহি, কোন যোগ অভ্যাস করিতে প্রস্তুত নহি। কোন অধ্যবসায় নাই, কোন চেষ্টা নাই; চেষ্টা কেবল রাতারাতি ধনকুবের হইব, আর নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করিব, খালি

ফুল্ল গোলাপ উপভোগ করিব, কাঁটার ঘাটি' পর্য্যন্ত সহ্য করিব না। ভগবানের রাজ্যে যাহা হইবার নয়, তাহা হয় না; অথচ আমাদের প্রতিপক্ষ সেই বৃথা মনোবেদনা পাইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরেন। যাহা ভগবানের ধর্ম্ম-রাজ্যের নিয়ম তাহাই হইল। আমি আশু সুখের আশায় সব হারাইলাম; হারাইলাম অর্থ, ধন, জন, মান। কিন্তু বৃথা;—আশু সুখের আশার হাত হইতে ত এড়াইলাম না। ফলে যা অবশ্যম্ভাবী, তাহাই হইল; অধর্ম্মের জীবন যাপন করিতে শিখিলাম। আমার অপেক্ষাও যে লোভী তাহাকে মারিতে শিখিলাম, আর তাহার অস্থিচর্ম্ম ও রক্ত খাইয়া বাঁচিতে শিখিলাম। ফল, অধর্ম্মে অর্থ উপার্জ্জন, ক্ষণিক মাতোয়ারা, আর ঠকাইয়া জিতিবার সময় ক্ষণিক আবেগ। তবে জীবন অশান্তিময়, কি করি, আর ফিরিবার উপায় নাই, থাকিলে ফিরিতাম। এখন সর্ব্ব সময়েই অশান্তিতে পুড়িয়া মরিতেছি। যতক্ষণ আহারের চেষ্টায় দৌড়াইতেছি, ততক্ষণ এক রকম একটা আবেগ; আবার কার্য্যসিদ্ধির পর ক্ষুধা পিপাসার নিবৃত্তি, তার কিছুক্ষণ পরেই আত্মগ্লানি। তবে যতদিন আপনারা আমাদের ত্যাক্ত করেন, ধরপাকড় করেন, মোকর্দ্দমা করেন, ততদিন মানুষের প্রধান ধর্ম্ম যে আত্মরক্ষা তাহার চেষ্টায় বিভোর হইয়া থাকি, সব ভুলিয়া যাই, ভাল মন্দ কিছুই জ্ঞান থাকে না। কোনরূপে মানুষের গঠিত আইনের হাত হইতে উদ্ধারের চেষ্টা, তার পর আবার যে আগুন সেই আগুন। আমরা ২৪ ঘণ্টা যে আগুনে পুড়িতেছি, তাহাতে আপনাদের জেল বিশেষ কষ্টের জায়গা নহে। তাই বলিতেছিলাম, হুজুর, দোষ আমাদের নহে, দোষ ধর্ম্মহীন শিক্ষার, দোষ অমানুষিক ধনলিপ্সার, দোষ অশেষ ও অজেয় লোভের।

আমি হরদম খোসের কথা শুনিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলাম।

হরদম যাহা বলিয়াছে তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। আমাদের সকলেরই হরদম সেই কথা মনে রাখা উচিত। তাই বলিতেছিলাম শেয়ার মার্কেটে লোক যে মরে, তাহার মূলে অমানুষিক অস্বাভাবিক লোভ ও অশেষ ধনলিপ্সা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অতিলোভাভিভূতস্য চক্রং ভ্রমতি মস্তকে

সেই শেয়ার মার্কেটে শতকরা নিরানব্বই জনের যাহা হয়, রামলালেরও তাহাই হইল রামলালের বিদ্যাশিক্ষা বেশী নয়। কিন্তু শেয়ার মার্কেটে অতি বিদ্বান ও অতিমূর্খের ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা, কোন পার্থক্য নাই।

রামলাল যে সময়ে রাজা হইবার আশায় শেয়ার মার্কেটে প্রবেশ করেন, ঠিক সেই সময়ে হরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি এম.এ পরীক্ষায় প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বুদ্ধি ও বিদ্যাবলে এক স্বাধীন রাজার প্রধান সচিব পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হন ও জীবনের অৰ্দ্ধেক সময়ের মধ্যেই প্রায় বিশ লক্ষ টাকা নিজ হস্তে সংগ্রহ করেন। এই সর্ব্বগুণনাশী সর্ব্বনাশী শেয়ার মার্কেট মন্দিরে পুরোহিত হইবার আশায় তথায় প্রবেশলাভ করেন। পৃথিবীতে এত দেখিয়া ঠেকিয়া বুঝিলেন না যে, এ মন্দিরে দেবতার পূজা হয় না, উপদেবতার পূজা হয়। সেই পূজায় তিনি ব্রতী হইয়া দুই বৎসরের মধ্যে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন।

সেই সময়ে রামলালও যথাসর্ব্বস্ব হারাইলেন। লোকসানের পূর্ব্বে রামলালকে অনেক সময়ে লোকে বুঝাইয়া বলিত, আপনি এ সর্ব্বনাশী জায়গায় কেন যাইতেছেন। তখন তিনি হরনাথ বাবুর নাম উল্লেখ করিয়া বলিতেন, আমি না হয় অল্পদর্শী, কিন্তু যিনি একটা বৃহৎ রাজত্ব চালাইয়া আসিলেন তিনি ত বহুদর্শী, তিনি অনেক দেখিয়া, অনেক

ঠেকিয়া, জীবনের অর্দ্ধেক অংশ অপর কার্য্যক্ষেত্রে কাটাইয়া যখন এ বাজারে আসিয়াছেন, তখন কি তিনি না বুঝিয়া আসিয়াছেন ?

ফল কিন্তু দুজনেরই এক হইল। এখানে মুড়ি মিছরীর একই দর, এখানে শিক্ষিত অশিক্ষিতের এক পরিণাম, এখানে ধনী নির্ধনের এক-শেষ, ধনে প্রাণে সর্ব্বনাশ। রামলাল ও হরনাথ দুইজনেই কপর্দ্দক-শূন্য হইলেন, দুইজনেই পথের ভিখারী হইলেন। তবে হরনাথের সহ্য ও রক্ষণ শক্তি বেশী, যাহা হউক করিয়া, তিনি জীবনে বাঁচিয়া গেলেন, আর রামলালের রক্ষণ ও সহ্য শক্তি কম, তিনি ধনে প্রাণে মরিলেন।

শেয়ার মার্কেটের পরিণাম একই হয়; সকলের জন্যই এক। শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত, ধনী, নির্ধন, বলবান, দুর্ব্বল, হুঁসিয়ার, ও বোকা সকলেরই পরিণাম এক; কেহ কেহ প্রাণ লইয়া পলাইতে পারে, কেহ তাহাও পারে না।

আমাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব, বাঙ্গালী জাতি কবে এই ধ্রুব সত্যটি বুঝিবেন। ভগবানের ইহা একেবারেই অভিপ্রেত নয় যে, তুমি মাথার ঘাম পায়ে না ফেলিয়া রোজগার করিবে, অর্থ সংগ্রহ করিবে। প্রথমে ত' অর্থ সংগ্রহ করা অসম্ভব; আর যদি বা কর তবে সে অর্থ ভোগ করিতে পারিবে না। যদি ভোগ করিতেই না পারিলে, তবে অর্থ থাকায় আর না থাকায় প্রভেদ কোথায় ?

শেয়ার মার্কেটে অধিক পরিমাণে লোকসানের পর রামলাল একে-বারে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। তাহার জীবনের সকল উদ্যম একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি উদ্যমের সহিত আবার দুই একবার কার্য্য করিয়া নষ্ট সম্পত্তির উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চোরা বালিতে প্রোথিত পা তুলিবার চেষ্টার ন্যায় তাহার পা আরও বসিয়া

যাইতে লাগিল ; সম্পত্তির উদ্ধারের পরিবর্ত্তে লোকসান আরও বাড়িতে লাগিল। তাঁহার "পূর্ব্বধনং বিনশ্যতি" হইল। যাহা শেয়ার মার্কেট হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা ত সমস্তই গেল, উপরন্তু যাহা পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, তাহাও সমস্ত নষ্ট হইল।

ক্রমে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট আরম্ভ হইল, সংসার চলা দায় হইয়া উঠিল। বাজারে পার্টিরা তাঁহার আসল হাল জানিয়া তাঁহার সহিত আর কণ্ট্রাক্ট করে না। আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন, বন্ধুবান্ধবেরা ক্রমে আর তাঁহাকে দেখিতে আসিবার অবসর পান না। ক্রমে লক্ষ্মীদেবী যেমন তাঁহাকে ত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ত্যাগ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীর যতগুলি বরযাত্রী ক্রমে সকলেই চলিয়া গেলেন।

তাঁহার পরমাত্মীয় মাতুল মহাশয়, যিনি গত দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার নিকট হইতে অন্ততঃ দশ হাজার টাকা আদায় করিয়াছিলেন, আর যিনি প্রত্যহ দুইবার করিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, তিনি আর তাঁহাকে দেখিতে আসিবার সময় পান না। তাঁর শরীরও আর বয় না। কাজেই তিনি আর তাঁহার পরমাত্মীয়, নয়নানন্দময় মৃতা সহোদরা ভগ্নীর একমাত্র সন্তান, প্রিয়দর্শন রামলাল বাবাজীকে দেখিতে আসিতে সময় পান না।

তাঁহার জেঠামহাশয় ভজহরি আর তাঁহার খবর লইতে পারেন না। তিনি যে একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল বুদ্ধির দোষে একেবারে পথের ভিখারী, তিনি কি তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিতে পারেন। রামলাল যাহাই হউক, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ত বটে ; তা ছাই, তিনি আর কি করিবেন ? বুদ্ধির দোষে রামলাল নিজের সর্ব্বনাশ করিল আর শত্রুগণকে হাসাইল।

রামলাল ও তাহার পিতা দু'জনেই দুষ্টবুদ্ধি; বুদ্ধির দোষে দুইজনেই নিজের নিজের সর্ব্বনাশ করিল; তিনি আর কি করিবেন?

একদিন, রামলালের এক মোসাহেবের সহিত ভজহরির সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় জনার্দ্দন আসিয়া উপস্থিত। জনার্দ্দন আসিলে তাহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

ভজহরি। (শ্লেষভাবে) কিহে, তোমাদের রাজাবাবু কেমন আছেন, কই আজকাল আর ঘন ঘন জলসা দেখিতে পাই না, আমোদের ফোয়ারা ত আর চলে না, তোমাদেরও দেখিতে পাই না। গতিকখানা কি?

মোসাহেব। মহাশয়, আপনি হলেন বড় রাজাবাবু, আপনিই খবর রাখিবেন। রামলাল বাবু হলেন আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র, আপনার পিণ্ডাধিকারী; আর আমরা হলেম পর, দু দিনের আলাপ। কি জানেন, আমাদের পুত্র পরিবার আছে, সংসার ঘরকন্না আছে, ভাইপো ভাইঝি আছে; আমরা তাদের দেখবো, না রামলাল বাবুর খবর নিব। বিশেষ রামলাল বাবু ত আর আমাকে মাসহারা দিচ্ছেন না, আর বাটী ঘর করেও দিচ্চেন না; আমাদের ত খেটে খেতে হবে মশায়।

ভজহরি। তা সত্য বটে, তবে কি না, কিছুদিন পূর্ব্বেও ত তোমাদের স্ত্রী, পুত্র, ভাইপো, ভাইঝি, সংসার, ঘরকন্না সবই ছিল। তখন কিন্তু সময় ত পেতে, রামলালকে দেখিতে আসিতে, এমন কি সারাদিন তাহার ওখানে কাটাইতে। আর এই দু মাসে এমন কি হইল যে, একেবারেই তোমরা সময় পাও না। আর তোমাদেরই বা শুধু বলি কেন? এই জনার্দ্দন বাবু, রাজাবাবুর মাতুল, তাহাকেও আর আমাদের পাড়াতেই দেখিতে পাই না।

জনার্দ্দন। আরে ভাই, তুমি ত জান, আমি অন্যায় একেবারেই সহ্য করিতে পারি না, নিজের পিতারও নয়, তা অন্যে পরে কা কথা।

আমার বাবা প্রায়ই বলিতেন, জনার্দ্দন আমার অবাধ্য। তা কি করব ভাই, আমি অন্যায় বরদাস্ত করিতে পারি না। রামলালটা চিরকেলে বোকা, ওর বাপটা ছিলো হারামজাদা, আর ওর মাটা ছিলো তেঁদড়। ওর মা বাপ থাকিতে কখন ওদের বাড়ীতে পা দিই নাই। তবে কি জান, রক্তের টান, তাই মা-বাপ-খেকো ছেলেটাকে মাঝে মাঝে দেখতে আসতাম। তা ছোঁড়া ত আমার কথা শুন্‌লে না। পাঁচজন পরের ও চিরশত্রুর কথা শুন্‌লে, আর উৎসন্নও গেল; পাঁচটা খোসামুদের কথা শুনেই ত মাটী হ'ল। ছোঁড়ার মনটা ভাল বটে, বুদ্ধিটা কিন্তু ভাল নয়। আর হবেই বা কোথা থেকে, ওর বাপটা ছিলো হারামজাদা, ওর বংশটাই এরূপ। যখন ওর বাপের বিয়ে হয়, আমার সকল নিকট আত্মীয়েরা বাবাকে ব'লেছিল, দেখ সুখময়, ওর বংশে মেয়ে দিও না; ও শালার বংশ পাজী, ও বংশের সব তে'তো। তা ভাই, আমার পরামর্শ যখন শুন্‌লে না, সেইদিন থেকেই আমি আর ওমুখো হই নাই।

মোসাহেব। সে কি মামাবাবু? রামলালবাবু, মামা, মামা, ক'রে খুন হ'য়ে যে'তেন, আপনি ফুস্ ফুস্ ক'রে পরামর্শ দিতেন, আর তিনি সেইরূপ কার্য্য করিতেন। জেঠামহাশয় আর আপনিই ত তাঁর পরামর্শ-দাতা আর মুরুব্বি।

ভজহরি। আরে বাবা, আমার হ'লো নাড়ীর টান। আমি ত প্রাণপণে তার শুভ চেষ্টা করছি। তবে জনার্দ্দন ভায়া, তার ঘাড়ে চেপে বসলো। আমি ত আমি, স্বয়ং গঙ্গা ময়রা তার কিছু করতে পারে না। আর জনার্দ্দন শালা, ওর কথা ছেড়ে দাও, চালালে খুব ভাল; বাল্যাবস্থায় বাপের ঘাড়ে চালালে, তারপর ছেলের ঘাড়ে চালালে, তারপর বিধবা মেয়ের ঘাড়ে চালালে, তারপর ভদ্রাসন বাটীর অংশের উপর চালালে, আর বৎসর দুই তিন ভাগ্‌নের ঘাড়ে চাপ্‌লো।

মোসাহেব। ভদ্রাসন বাটীর অংশের উপর চালালে কি প্রকার?

ভজহরি। জান না বাপু, ওর ভদ্রাসন বাটীর অর্দ্ধেকটা একটা বেশ্যাকে খুব বেশী দামে বেচ্‌লে। সেই বেশ্যাটার একটা জোরসই বাবু জুটলো, অমনি জনার্দ্দন বাবু সেই প্যারীমতির বাবা হইলেন, প্যারীমতির বাবুর বাবা হইলেন। এক চালে কিস্তি মাত; বেশী দরে বাটী বিক্রী, বেশ্যার বাবা হওয়া আর বড় ঘরের অকাল কুষ্মাণ্ডের বাবা হইয়া বেশ দু পয়সা হাতাতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে রামলালের মাতুল হইয়া "বন থেকে বেরোলো টীয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।" জনার্দ্দন ভায়া একটা বোনকে আমাদের বংশে দিয়ে মজাটা লুট্‌লে ভাল। যদি আর দু একটা বোন্ আমাদের বংশে ছাড়্‌তে পার্‌তো, ত আরো মজা পেতো।

জনার্দ্দন। তা ভাই, যাই ঠাট্টা কর আর যাই কর, ছোড়াটার জন্য প্রাণটা কাঁদে। তা কি করবো ভাই, একেবারে যে যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট ক'রছে। তাহাকে বাঁচান দেবতার অসাধ্য, তা আমি ত মানুষ।

মোসাহেব। তা জেঠামহাশয় নমস্কার। আমি তবে আজ আসি।

জনার্দ্দন। তা ভায়া, আমিও আজ আসি। ছোড়াটাকে একবার দেখো। মা নেই, বাপ নেই, মামা—আমি থেকেও নেই, টাকা নেই পয়সা নেই। তবে থাকবার মধ্যে আছ, তুমি তার জেঠামহাশয়। দেখো যদি ছেলেটাকে বাঁচাতে পারো। আমি, ভাই, নিতে, বলাকে চেষ্টা ক'রে পারি নাই; এটাকেও পারলেম না। দেখো, যদি তুমি কিছু করতে পারো।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিপদে মধুসূদন

রামলাল ক্রমে সকল অধিকার ছাড়িয়া রোগ শয্যা অধিকার করিলেন। অর্থ নাই, লোক নাই, আত্মীয় নাই, উপযুক্ত পুত্র নাই, স্বার্থহীন বন্ধু নাই, সহিষ্ণুতার আকর পিতা নাই, স্নেহের আকর মাতা নাই, আশা নাই, ভরসাও নাই। কেবল নিরবচ্ছিন্ন নিরাশা তাঁহার সঙ্গের সাথী।

এরূপ অবস্থায় রোগশয্যাই তাঁহার একমাত্র শেষ স্থান। ইহার পর এ জগতে তাঁর আর স্থান নাই। তিনি সেই শেষস্থান আসিয়া অধিকার করিলেন। যখন রোগের আধিপত্য তাঁহার উপর একটু কমে, তখনই চিন্তার আধিপত্য তাঁহাকে একেবারে গ্রাস করে।

একদিন তিনি রোগের তাড়নায় ও চিন্তার আবেগে ভাবিলেন, একবার জেঠামহাশয়কে আমার নিজের অবস্থা খুলিয়া বলি। তিনি হয় ত সাহায্য করিলেও করিতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার কন্যাকে বলিলেন, দেখ্ মেনকা, তুই একবার তোর দাদামহাশয়কে ডাকিয়া আন্ দেখি। বলিস্ দাদামহাশয়, বাবার অসুখ, বাবা তোমাকে একবার দেখিতে চাহেন।

মেনকা আসিয়া ভজহরিকে সেইরূপ বলিল। ভজহরি বলিল, হাঁ যাব, কিন্তু গেল না।

রামলাল পুনরায় বলিয়া পাঠাইলেন। জবাব একই, 'যাইব'; কিন্তু আসিল না।

অবশেষে চার পাঁচদিন ডাকাডাকির পর ভজহরি আসিলেন। রামলালের দুঃখ কাহিনী শুনিলেন। শেষে বলিলেন, বাবা, আমারই ত সাহায্য করিবার কথা। কিন্তু আমার হাতে এখন কিছুই নাই। দেখি, তোমার জেঠাইমাকে ব'লে, সে যদি কিছু টাকা ধার দিতে রাজি হয়, তবে তোমাকে সাহায্য করিব। সে পরের মেয়ে তাহার ত তোমার প্রতি রক্তের টান নাই যে, যেচে ধার দেবে। আর কি জান বাবা, তোমাদেরই আমাদিগকে দেখিবার কথা। আমরা বুড়ো হইতেছি, তোমাদের জোয়ান বয়েস, তোমরা আমাদের দেখবে, তা নয় কলির সবই উল্টো। আরও ভাবছি, তোমার ভাল মন্দ কিছু হলে, আমার পূর্ব্বপুরুষ ভবিষ্যতে এক গণ্ডূষ জলও পাবে না। আর বৃদ্ধ বয়সে আমাকেই বা দেখবে কে? তুমি হ'লে পুত্রের সমান, তুমি কোথায় আমায় দেখবে, না তোমাকে আমায় দেখতে হবে। তোমার পিতা চিরকালই আমার প্রতি শত্রুতা করিয়াছেন, ম'রেও একটী কাঁটা রেখে গেছেন, ইচ্ছে ক'রে পূর্ব্ব পুরুষের পিণ্ড লোপ ক'রবার যোগাড়।

রামলাল। জেঠামহাশয়, এ যাত্রা বাঁচলে, হয় ত আপনাকে বৃদ্ধ বয়সে দেখ্‌তে পারব, আর পূর্ব্ব পুরুষগণ পিণ্ড পেলেও পেতে পারেন।

ভজহরি। বাবা, পোড়া কপাল, আমাদের কি সে বরাত! আমাদের ভাগ্যে পোড়া সোল মাছ জলে চ'লে যায়।

রামলাল। জেঠামহাশয়, আপনার পায়ে ধ'রে বল্‌ছি, আমায় কিছু সাহায্য করুন, না হয় ধার ব'লে কিছু দিন। আমি চিকিৎসা করাই, পথ্য পাই, আপনার বৌ ও নাতনীদের জীবন বাঁচাই।

ভজহরি। আরে বাবা মূর্খ ছেলে, ডাক্তারেরা কেবল ঠকাইয়া দর্শনী

নয়। পরমায়ু না থাকলে ডাক্তারের কি সাধ্য যে রোগী বাঁচায়, আর পরমায়ু থাকিলে দুর্ব্বাঘাসে বাঁচিয়া যায়। পরমায়ু না থাকিলে বটকৃষ্ণ পালের ১ ও ৩ বনফিল্ড লেন রোগীকে খাওয়াইলেও রোগীর কিছু হয় না। তোমার শ্বশুর রোজ আসেন ত? তোমার মাতুল জনার্দ্দন আজ এখনও আসেন নাই।

রামলাল। শ্বশুর মহাশয় বিষয় কর্ম্মে ব্যস্ত, আসিতে পারেন না। মাতুল মহাশয়, বোধ হয়, শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন আসিতে অপারগ।

ভজহরি। এই ত বাবা বুঝতে পারছ এখন, কে আপনার কে পর। শ্বশুর কার্য্যে ব্যস্ত, মাতুল হয় ত অসুস্থ; কিন্তু আমি ত আর ফেলে থাকতে পারলেম না। আমাকে ত আসতে হল।

রামলাল। তা জেঠামহাশয়, যখন এসেছেন, তখন আমাদিগকে রক্ষা করুন।

ভজহরি। দেখি বাবা, তোমার জেঠাই মা কি বলেন। তিনি ত পরের মেয়ে। তা বাবা আমি এখন আসি।

ভজহরি বাটীর বাহিরে আসিলে প্রতিবেশী যোগেশ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। যোগেশবাবু ভজহরিকে দেখিয়া রামলালের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আর বলিলেন, দেখুন ভজহরি বাবু, আপনার ত আর ছেলে নাই, একমাত্র মেয়ে। তা সেও বেশ সৎপাত্রে পড়িয়াছে। আপনাকে দেখতে হবে না। আপনি রামলালকে এ যাত্রা সাহায্য করিয়া বাঁচান। তার স্ত্রী ও কন্যাদের বিশেষ সাংসারিক কষ্ট হইয়াছে, তাহাদের সাহায্য করুন। ভাল ডাক্তার কবিরাজের বন্দোবস্ত করুন, নিজ বংশের শিবরাত্রির সলিতা তৈলসিক্ত রাখুন।

ভজহরি। আরে মশায়, কি করা উচিত আর অনুচিত তাহা আমি

খুব জানি। আমিই অপরকে পরামর্শ দিই, আমাকে পরামর্শ দিবার অপরের প্রয়োজন নাই। ডাক্তার কবিরাজ কি করিতে পারে; পরমায়ু থাকে, বাঁচবে; ডাক্তার কবিরাজের পাল শুদ্ধু পড়িয়াও যথেষ্ট দর্শনী লইয়াও রোগীকে মারিতে পারিবে না। আর পরমায়ু না থাকিলে ভাল ভাল ডাক্তার কি কবিরাজ চেষ্টা করিলেও কোন ফল হয় না।

যোগেশ। মশায়, আমার স্ত্রীর মুখে শুনিলাম, রামলাল বাবুর বিশেষ অর্থ কষ্ট হইয়াছে। শুনিয়াছি, তাঁহার শ্বশুর নরপিশাচ, তিনি একেবারেই তাঁদের কোন খোঁজ খবর লন না। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষে কেহ কখনও পরোপকার করেন নাই, তিনিও তাহা করেন না। যখন রামলালের পয়সা ছিল, দেশ শুদ্ধ লোক তাহার খেয়েছে, মেখেছে, কতলোকের বাড়ী ঘড় হ'য়েছে, সোনাদানা হ'য়েছে। আর এখন সেই লোকই বেঁচে, আর তাহার স্ত্রী, কন্যা ও সে নিজে পথের ভিখারী, বসতবাটী তাহাও খুব বেশী টাকায় বন্ধক। নিজের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, তোষামুদেগণ, নিমজ্জমান জাহাজের মুষিকের ন্যায় সকলেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে। তাহার শ্বশুর তাহাকে দেখেন না। তাহার মাতুল, যিনি অনেক টাকা তাহার কাছ থেকে পেয়েছেন, তিনিও একবারটি উঁকি মারেন না। তোষামুদেরা ত কখনও কৃতজ্ঞ নয়, এক্ষেত্রেও নয়। আপনি তার জেঠামহাশয়, আপনার কিছুরই অভাব নাই, আপনি না দেখিলে কে দেখিবে।

ভজহরি। ওহে বাবু, সে ত আমার পূর্ব্বপুরুষের এত টাকা পেলে, আর তাহাদেরই আশীর্ব্বাদে এত টাকা রোজগার করলে, তাও রাখতে পারলে না; তা আমি হাজার দুহাজার দিয়া তাহার কি সাহায্য করিব। ওটা ত চিরকেলে হাবাতে, যে রকম ব্যাধি তাহাতে ওর তো রক্ষা নাই। আবার মেয়েগুলো ও বৌটা ত আমার ঘাড়েই পড়বে। এর পর

ইচ্ছাতেই হউক, আর অনিচ্ছাতেই হউক আমাকেইত দেখতে হবে, আর কোন শালা ত দেখবে না। যখন পয়সা ছিল তখন সব শালা আসত আর দোহাত্তা মারত, এখন জেঠামহাশয়, জেঠামহাশয়।

যোগেশ। তা ভজহরি বাবু, যখন তাহার ছিল, দশ হাজার টাকা খরচ ক'রে আপনার বাটী ও দালান মেরামত ক'রে দিয়াছিলেন, আপনি না হয় এখন কিছু দিলেন। আর বৌ নাতনীর কথা যা বলিলেন, সে ত পরের কথা, এখন সে কথা অপ্রাসঙ্গিক।

ভজহরি। ওহে যোগেশ, ভবিষ্যৎ আগে দেখতে হয়, মানুষের দূরদর্শী হওয়া দরকার। আর দালান মেরামত যা বললে, সে ত নিজের ঝোঁকে সে খরচ ক'রেছে। পূজা করা তার চাইই, তখনি চাই—নামের জন্যে, পশারের জন্যে, দশটা তোষামুদের 'ধন্য' 'ধন্য'র জন্যে। আমার দালান তাহার পূর্ব্ব পুরুষের দালান। না পেলে একটা বাহিরের লোকের দালান লইয়া মেরামত করিত, হয় ত সেই দালানের মালিক নগদ টাকাও কিছু লইত। তা যাহাই হউক, বেলা হ'ল, এখন এসো।

এই বলিয়া ভজহরি বাটীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

যোগেশ। আজ কপালে কি দুর্দ্দৈব আছে, তা না হ'লে ওর মুখ দেখিলাম। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা। বেটা নরপিশাচ।

বলা বাহুল্য ভজহরি রামলালের কিছু মাত্র সাহায্য করিলেন না। মাতুল মহাশয় রামলালের বাটীর রাস্তা মাড়াইতেন না। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, শরীর বড়ই খারাপ। একে ত পূর্ব্ব হইতেই খারাপ ছিল, আবার রামলালের ভাবনায় আরও খারাপ হইয়া গেছে। তবে বিশেষ সন্ধানে এটা জানা গিয়াছে যে, শরীরের উপকারার্থে আর অপত্য স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পাতান কন্যা প্যারীমতি ও

তাহার বাবুর সহিত সপ্তাহে প্রায় তিন দিন বাগানে রাত্রি যাপন করেন।

তাহার শ্বশুর মহাশয় নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত, তিনি তাঁহার জামাতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে একেবারেই আসিতে পারিলেন না। বরং বলিতে লাগিলেন, আমি যখনি বিবাহ দিয়াছিলাম, তখনি জানিতাম মেয়েটাকে নিয়ে চিরকাল জ্বলতে হবে। জামাই পুরানা ঘরের ছেলে, মেয়ে অনেক সোনাদানা পরবে, এই লোভে ওর মা এই কার্য্য কর্‌লে। তা নইলে, আমি কি ও ঘরে মেয়ে দি? তা গৃহিণীর যেমন বুদ্ধি, তেমনি ফল। আমি আর কি করব, মেয়েটা ত ঘাড়ে পড়বেই, আজই হউক আর দুদিন বাদেই হউক।

তাহার জেঠামহাশয় সাহায্য করিতে পারিলেন না, কেন না তার জেঠাইমা জেঠামহাশয়কে টাকা ধার দিলেন না।

আর আর আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব তাঁহার দুর্বুদ্ধির জন্য তাঁহার নিন্দাবাদে ব্যস্ত। সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা তাহাদের একেবারেই নাই। তাহারা বলিতে লাগিল, দেখ, আমরা খুব হুঁসিয়ার বলিয়াই আজকালকার দিনে মান ইজ্জত বজায় রাখিয়া সংসার চালাইতেছি। নইলে আমাদেরই বা কি হইত কে বলিতে পারে? রামলালকে তুলিতে চেষ্টা করলে আমরা শুদ্ধ ডুবিব। অতএব সকলেই তাঁহাকে তাঁহার দুর্ভাগ্যের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কেহ একটি ক্ষুদ্র কনিষ্ঠাঙ্গুলি তুলিয়াও তাঁহার সাহায্য করিল না।

অবশেষে বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে, বিনা অর্থে কিছুদিন রোগ শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া, যখন সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিল, তখন তিনিও সেই রোগশয্যা পরিত্যাগ করিলেন। কেবল তাঁহাকে শেষ অবধি পরিত্যাগ করেন নাই তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার কন্যা মেনকারাণী।

তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া গেলেও তাহারা তাঁহার স্মৃতি লইয়া প্রাণ ধারণ করিতে লাগিল। সর্ব্বরোগশোকের চরম স্থান পুণ্য-সলিলা গঙ্গাদেবী কুলু কুলু রবে তাঁহাকে ডাকিয়া নিজের কোলে স্থান দিলেন।

আর তাঁহার অন্তর্ধানের পর তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাগণের ভার, তাঁহার শ্বশুর মহাশয় লইলেন না, মাতুল মহাশয়ও লইলেন না, জেঠা-মহাশয়ও লইলেন না। লইলেন, এক দূর আত্মীয়। তাঁহার বিশেষ অর্থ না থাকিলেও উচ্চ প্রাণ ছিল, ধন না থাকিলেও উচ্চ মন ছিল।

রামলালের মৃত্যুর কিছু দিন পরে তাঁহার উত্তমর্ণেরা নালিশের পর ডিক্রী করিয়া বসত বাটীটি বিক্রয় করাইলেন।

নিলাম ডাকের সময় যখন পাড়ার খরিদদাররা উপস্থিত, ভজহরি বাবু সকলকার হাতে পায়ে ধরিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, দেখুন, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের বসতবাটী, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গেছে, আমি আছি; আমি ঐ বাটী আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূকে ও তাহার মেয়েদের কিনিয়া দিব। আপনারা দর বাড়াইলে আমাকে অধিক টাকা দিতে হইবে, তাহা হইলে আমি আর অত বেশী টাকা বধূও নাতনীদের জন্য দিতে পারিব না। ঈশ্বরের দিব্য, এ সম্পত্তি তাহাদের জন্য কিনিতেছি।

সকল ভদ্রলোকই এ কথা শুনিয়া রাজী হইলেন। এমন কি অপরিচিত লোকজন বৃদ্ধের সদিচ্ছার প্রশংসা করিতে করিতে ডাক দিতে বিরত হইলেন।

ভজহরি স্বল্পমূল্যে সম্পত্তি ক্রয় করিলেন এবং ক্রয় করিয়াই রাম-লালের পত্নী ও কন্যাদিগকে গৃহচ্যুত করিয়া খুব বেশী ভাড়ার এক বেশ্যাকে সেই বাটী ভাড়া দিলেন।

ভজহরি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ভুলেও রামলালের স্ত্রী কন্যার কোন সংবাদ লন নাই বা কোন প্রকার সাহায্যও করেন নাই। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে দুঃখের ভান করিয়া বলিতেন, যে পথে রামলাল গিয়াছে সেই পথে তার সব গিয়াছে। রামলাল মরিয়াছে, এই বৃদ্ধবয়সে সে আমাকে মারিয়া গিয়াছে। আমি আর সংসারের বিষয় ভাবিতে পারি না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না

ভজহরি মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক সম্পত্তি সত্ত্বেও মরিবার পূর্ব্বে কোনরূপ চিকিৎসাই হইল না। জগতে তাঁহার টাকা কড়ি ছাড়া আর কেহই আপনার ছিল না। তিনি কখন কাহারও খোঁজ খবর লন নাই, শেষ অবস্থায় তাঁহারও কেহ খোজ খবর লইল না।

তিনি রুগ্ন শযায় শায়িত। তিনি ত রুগ্ন বটেই, তাঁহার শয্যাও বিশেষ রুগ্ন; একটা ছেঁড়া মাহুর, একখানা ছেঁড়া কাঁথা, আর থুথু ফেলিবার জন্য একটা মাটীর গেলাস। তাঁহার পার্শ্বে কেহ নাই, রোগশয্যায় তিনি একাকী পড়িয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গী তাঁহার অন্তিম চিন্তা। সে যে ভয়ানক, সে যে অসহনীয়।

জীবনে কখনও ভাল কাজ করেন নাই, কখন কাহাকেও দয়া করেন নাই, ভগবান্ কি তাঁহার প্রতি দয়া করিবেন। সত্য, তিনি দয়াল হরি, কিন্তু শঠতা প্রবঞ্চনা ও স্বার্থপরতায় যাহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, আজ সে কোন সাহসে সেই দয়াল হরির কাছে দয়া ভিক্ষা করে।

তিনি সমস্ত জীবন অর্থ আহরণে কাটাইয়াছেন। সেই অর্থের এক কপর্দ্দকও তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন না। যত দিন তাঁহার শরীরে শক্তি ছিল, যতদিন তাঁহার মনে বল ছিল, তিনি তাঁহার আবশ্যক জিনিসগুলির আয়োজন করিয়া লইতেন। এখন তিনি বল

শক্তিহীন। কোন জিনিসের ইচ্ছা হইলে, মনের মধ্যে ইচ্ছার উদয় হয় আবার বিলীন হয়, মনের মধ্যে ফুটে আবার মনের মধ্যেই শুখাইয়া যায়।

জীবনসঙ্গিনী রাঙ্গাবৌ জীবনে টাকা ছাড়া আর কিছুই ভালবাসেন নাই। স্বামীর রোগশয্যাতেও তাঁহার সেই একই লক্ষ্য; তিনি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই, এ বিপদেও হইলেন না।

তিনি স্বামীর চিকিৎসার জন্য এক পয়সাও খরচ করিতে রাজি নন, আর তাঁহাকে রাজি করেই বা কে? তিনি বলিতে লাগিলেন, কর্ত্তার যে অবস্থা, তাহাতে এ যাত্রা তাঁহার রক্ষা পাইবার আশা নাই। আমার ছেলে নাই যে তাঁহার অবর্ত্তমানে আমায় দেখিবে। আমার যে মেয়ে, সে নিজের ছেলে মেয়ে নিয়েই ব্যস্ত; আমায় দেখিবার তাহার ইচ্ছাও নাই, প্রবৃত্তিও নাই, অবসরও নাই। আর ত তিনি আমার জন্য টাকা উপায় করিবেন না। আমি স্ত্রীলোক, আমি টাকা রোজগার করিতে পারিব না। অতএব যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে, তাহা কোন মতেই, কমান উচিত নয়। আমার স্বামী আমায় ভালবাসেন, অর্থাভাবে যদি আমার কষ্ট হয়, তখন তিনি স্বর্গে গিয়াও সুখী হইতে পারিবেন না। আর তাঁহার যে অবস্থা, তাঁহার জন্য টাকা খরচ করা, ডাক্তার কবিরাজ ডাকান, ভাল খাদ্যদ্রব্য খাওয়ান, খালি ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ, তাহা করিতে আমি একেবারেই রাজি নই। তাহার উপর সামাজিকতা হিসাবে শ্রাদ্ধাদি করিতে হইবে, গুরু পুরোহিতকেও কিছু কিছু দিতে হইবে, পাঁচটা লোককেও খাওয়াইতে হইবে। তাহাতেও ত কিছু খরচ আছে। সমাজের কি সুন্দর বন্ধন! আমার স্বামীর আত্মীয়েরা তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার জন্য কিছু করিলেন না, তিনিও জীবিত অবস্থায় তাঁদের জন্য কিছু করিলেন না; অথচ যেই তিনি

মরিলেন, অমনি আমাকে তাঁহাদের ভুরি ভোজন করাইতেই হইবে; এর চেয়ে বিদ্রূপ আর কি হইতে পারে?

অতএব তিনি, রাঙ্গা বৌ, নিজের ভবিষ্যৎ লইয়াই ব্যস্ত। তিনি তাহার মুমূর্ষু স্বামীর জন্য বৃথা খরচ পত্র ও সেবা শুশ্রূষা করিয়া সময় ও অর্থ নষ্ট করিতে একেবারেই নারাজ। যেমন চিন্তা, সেইরূপই কার্য্য।

ক্রমে বিনা চিকিৎসায়, বিনাপথ্যে, বিনা শুশ্রূষায় ভজহরির প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি বুঝিলেন যে, জীবনে তিনি ভয়ানক ভুল করিয়াছেন। সারা জীবন যে পয়সার সেবা করিয়াছিলেন, সে পয়সা অন্তিমে তাঁহার কোন সেবাই করিল না। তিনি বেশ বুঝিলেন, তাহার স্ত্রীও সেই ধোঁকায় পড়িয়া সেই অনর্থের আকর অর্থেরই সেবায় ব্যস্ত রহিলেন, তাঁহার সেবা করিলেন না।

অর্থ তাঁহার কোন উপকারে আসিল না। তিনি এতকাল যক্ষের সম্পত্তি আগলাইয়া ছিলেন। সেই সম্পত্তি এখান কার হাতে যাইবে কে জানে? স্ত্রীর হাতে যে বেশী দিন থাকিবে না, এটা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার জীবনীশক্তি একেবারে সুতার সঞ্চারে ধিকি ধিকি বহিতেছে। জীবনের প্রবাহ ফিরাইবার সাধ্য তাঁহার নাই। থাকিলে তিনি আর অর্থের পূজা করিতেন না, অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেন।

ধর্ম্ম তাঁহাকে কেন সে শিক্ষা পূর্ব্বে দেয় নাই? সমাজ তাঁহাকে পূর্ব্বে কেন সে শিক্ষা দেয় নাই? তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে পূর্ব্বে কেন সে শিক্ষা দেয় নাই? আর এমন সাদা কথাটা, এমন ধ্রুবসত্যটা, তিনি কেন পূর্ব্বে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যদি ভগবান্ দয়া করিয়া আর কিছুদিন তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতেন, তাহা হইলে হয় ত তিনি তাঁহার জীবনের স্রোত অন্যদিকে ফিরাইতে পারিতেন। তাহা হইলে তিনি ধনসম্পত্তির দাস না হইয়া ধনসম্পত্তিকে তাঁহার দাস করিতেন। ভগবান

কিন্তু তাঁহার সে প্রার্থনা পূরণ করিলেন না। তিনি জীবনে ভগবানের আদেশ পালন করেন নাই, ভগবানও তাঁহার প্রার্থনা নামঞ্জুর করিলেন। অবশেষে কাহাকেও না কাঁদাইয়া, নিজে কাঁদিতে কাঁদিতে ভজহরি চিরকালের জন্য প্রভূত অতৃপ্ত আশা বুকে লইয়া চক্ষু চিরমুদ্রিত করিলেন।

রাঙ্গা বৌ সামাজিক হিসাবে বার কয়েক "ওরে বাপরে, কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে" বলিয়া চীৎকার করিলেন, তার পরই নিজের জিনিসপত্র সামলাইতে ব্যস্ত।

আত্মীয় স্বজন, যাঁহারা জীবিত অবস্থায় ভজহরিকে দেখিতে আসেন নাই, তাঁহারাও তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতে আসিলেন। আর বার কতক 'আহা' 'আহা' করিয়া যে যাহার আবাসে চলিয়া গেলেন।

পৃথিবীর নিয়মই এইরূপ। তোমার জন্য যাহাদের একটুও স্নেহ মমতা নাই, একটুও দয়া দাক্ষিণ্য নাই, একটুও আন্তরিক ভালবাসা নাই, সেই সব লোকই সামাজিকতা হিসাবে তোমার মৃত্যুর পর, তুমি যাহাদিগকে রাখিয়া গেলে তাহাদিগের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশের জন্য তোমার বাটীতে দেখিতে আসিবে, আর বার কয়েক মৌখিক 'আহা' 'উহু' করিবে। তাহারা যেমন থিয়েটার যাত্রা দেখিতে যায়, নাচ তামাসা দেখিতে যায়, তেমনি মৃত ব্যক্তির বাটীতে মৌখিক 'আহা' 'উহু' করিতে আসে; আসিয়া গহনার কথা কয়, বাটী ঘরের কথা কয়, চাল ডালের কথা কয়, জল হাওয়ার কথা কয়, সকল কথাই কয়; সব চেয়ে কম কথা কয় মৃত ব্যক্তির। তাহাদের আসা একটা তামাসা দেখতে আসা। মৃত ব্যক্তির জন্য তাহারা একেবারেই ব্যস্ত নয়, তাহার বিষয়ে তাহারা মোটেই উদ্বিগ্ন নয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভজহরি নিজে মরিয়া অনেককে বাঁচাইল।

ভোলানাথ সময়ে সংবাদ পাইলেন, তাঁহার দাদাশ্বশুর ভজহরি মারা গিয়াছেন। খবর পাইয়া বলিলেন, তাই ত, বুড়ো ম'লো, তা বয়সও ত অনেক হ'য়েছিল।

তাঁহার স্ত্রী ধূমাবতী সেই সংবাদ শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই মৃত্যুতে তাঁহার কোন সুবিধা হইবে কি না। পিতা উমেশ বাবু যে রকম একরোখা লোক, তাহাতে এ বিষয়ে কোন মাথা ঘামাইবেন না। আর মাতা ও দিদিমার মধ্যে বিশেষ আন্তরিকতা ভালবাসা নাই। ভগবান্ যা করেন, ভালর জন্যই করেন। দেখা যা'ক, দাদামহাশয়ের মৃত্যুতে তাঁহার কোন সুবিধা হয় কি না?

ভজহরির মৃত্যুর পর উমাসুন্দরী নিজ ভদ্রাসন বাটীতেই বাস করিতে লাগিলেন। সংসারে তাঁহার সেই পুরাতন দাসী বামা আছে। আর মধ্যে মধ্যে তাঁহার সেই বিধবা ননদিনী আসিয়া তাঁহার খোঁজ খবর লয়। তাহার পুত্র নিতাইও মাঝে মাঝে আসে ও খবর লইয়া যায়।

কিছুদিন এই রকমভাবে কাটিলে বামার কহত মত, নিতাই ও তাহার মাতা, উমাসুন্দরীর ভদ্রাসন বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিল এবং উমাসুন্দরীর সেবা যত্ন করিতে লাগিল। আর বামাকে প্রাণপণে খুসী রাখিতে লাগিল।

নিতাই ভাল চাল, ভাল ডাল, ভাল তরিতরকারী, ভাল মিষ্টান্ন সস্তায়

আনিয়া যোগাইতে লাগিল, আর বামা দাসী হইলেও তাহাকে বিশেষ-রূপে যত্ন করিতে লাগিল। ফলে, মামা বাঁচিয়া থাকিতে নিতাই ও তাহার মাতা মাতুলালয়ে কখনও স্থান পায় নাই, আজ সেই মাতুলালয়ে তাহারা স্থান পাইল। যদিও প্রকাশ্যে তাহাদের ভাড়া দিতে হইত না, বস্তুতঃ প্রত্যেক মাসেই সস্তায় জিনিস কিনিতে কিছু ব্যয় হইত। এই সস্তায় কেনার জন্যই নিতাই ক্রমে মামীর প্রিয়পাত্র হইল; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতাকেও উমাসুন্দরী সহ্য করিতে লাগিল।

ক্রমে বলাইও আসিয়া ঐ বাটীতে জুটিল। তাহারা তিন জনে মিলিয়া, উমাসুন্দরী ও বামাসুন্দরী যাহাতে খুসী থাকে, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল; এবং তাহাদের তিন দিক হইতে তিন জনের চেষ্টায় ফলও ফলিল।

উমাসুন্দরীর বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনা করে—নিতাই; সে বিনা বেতনেই কার্য্য করে, অর্থাৎ মামীর কাছ থেকে একটি পয়সাও লয় না। তবে ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে ও খরচপত্রের ভিতর থেকে বাঁচাইয়া বেশ দু পয়সা পায়।

সম্পত্তি অল্প হইলেও মোকর্দ্দমা মামলা বেশ চলিতে লাগিল। ভজ-হরির সময়ে মোকর্দ্দমা একেবারেই হইত না। এখন প্রায়ই মোকর্দ্দমা চলিতে লাগিল। মোকর্দ্দমায় বলাইয়ের বিশেষ আনন্দ; কেন না পয়সা মোকর্দ্দমা হইতেই হয়। উকিলদের ত হয়ই, সরকার গোমস্তা কারপর-দাজদেরও বেশ দু পয়সা হয়।

একদিন এক গোমস্তাকে আমি জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, হ্যাঁহে, তোমা-দের ছোট এষ্টেট, এত মোকর্দ্দমা হয় কেন?

তাহাতে সে বলিল, মহাশয়, তাহার প্রধান কারণ, আমাদের বেতন অল্প, আমাদের ত স্ত্রী পরিবার আছে, সংসার ঘরকন্না আছে, আমরা

এত অল্প বেতনে চালাইব কি করিয়া ? আমরা জমিদারের কার্য্য করি মাত্র। আমাদের ত আর বাপ বড়বাপের জমিদারী নাই যে সংসার চালাইব ; মুনিবের খাইয়াই সংসার চালাইব,—তা মাহিনা ব'লেই পাই, আর উপরি বলেই পাই।

মারওয়াড়ি ব্যবসাদারদের আদায়কারী জমাদারের মাহিনা পঁচিশ টাকা, তাহার খরচ ৫০৲ টাকা। ফলে, বৎসরে অনেকগুলি জমাদার মালিকের টাকা লইয়া পলায়ন করে।

মানুষ যতদিন লোককে খাটাইয়া তাহার পুরা খরচা না দিবে, তত-দিন লোকে মালিকের নিকট হইতে "যেন তেন প্রকারেণ" তাহাদের অত্যাবশ্যক টাকা যোগাড় করিয়া লইবেই লইবে,—তা যে নাম দিয়াই সে টাকা আদায় করুক।

উমাসুন্দরী জ্ঞানত নিতাই বলাই কি তাহার মাতাকে এক সূচ্যগ্রও দিতেন না ; কিন্তু প্রকারান্তরে তাঁহার সম্পত্তি হইতে তাহারা পোষাইয়া লইত।

এইরূপে ভজহরির মৃত্যুর পর সুখে দুঃখে উমাসুন্দরীর জীবনের দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে ভোলানাথ তিন চারিবার আসিয়া উমাসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন।

এই দুই বৎসরের মধ্যে উমেশবাবু জীবন-লীলা সংবরণ করিয়াছেন। যদিও উমেশ বাবু পৃথিবী ছাড়িয়া যাইলেন, উমা সুন্দরী অচল, অটল ও নির্ব্বাক। উমেশের মৃত্যু সত্বেও তাহার জীবন-প্রবাহ সমান ভাবে বহিতে লাগিল ; উমেশের মৃত্যু হেতু উমা সুন্দরীর জীবন প্রবাহে একটি অতিরিক্ত বুদ্বুদও ফাটিল না।

গত দুই বৎসর ধরিয়া ভোলানাথ পাঁচ রকম এদিক ওদিক করিয়া কিছু কিছু রোজগার করিতেছিলেন। কিন্তু ম্যাচ ম্যানুফ্যাক্টারির অংশ-

নামা বেচিয়া স্রোতের মত আর টাকা আমদানী হইতেছে না, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশ-সেবক বলিয়া সুনামের পতাকাও উড়িতেছে না।

তবে ভোলানাথের উত্তম অসাধারণ। তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র একেবারেই নন। কোন কিছু উপায়জনক কাজ না দেখিয়া তিনি বৃদ্ধ পিতা রাধানাথকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহার বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, জ্ঞানও আছে; তবে বিষয়বুদ্ধি তত বেশী নাই। তাহা না হইলেও, তিনি পুস্তক লিখিয়া ও ছাপাইয়া বেশ দুপয়সা রাখিতে যাইতে পারিবেন। তাঁহার নামে পুস্তক বাহির হইলেই সেগুলি খুব বিক্রয় হইবে।

ভোলানাথের প্ররোচনায় রাধানাথ অনেকগুলি বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক লিখিলেন। ভোলানাথ সেই সমস্ত পুস্তকের সম্পাদন ভার লইলেন। মুদ্রাঙ্কণের ভার লইয়া কলিকাতায় আনাগোনা করিতে লাগিলেন। সেই সুযোগে উমাসুন্দরীকে দেখিয়া যাইতেন।

পিতার পুস্তক রূপ খাদ্য হইতে শতকরা ৫০৲ টাকা খাইতেন। আর উমাসুন্দরীকে তেল জল দিয়া ভবিষ্যৎ বলির জন্য তাঁহার কাঁধ নরম করিয়া যাইতেন; কারণ, ধূমাবতী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ম্যাচ-ম্যানুফ্যাকটরির পর তাঁহার সুখদ প্রিয় খাদ্য—তাঁহার মাতামহী উমাসুন্দরী।

ভোলানাথ দেখিলেন, ধূমাবতী যাহা বলিতেছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। তবে উমাসুন্দরী বিধবা, তাঁহার যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি আছে, কিন্তু অভিভাবক কেহই নাই; এমন সুখদ সুখাদ্য বড় শীঘ্র জোটে না। অসুবিধার মধ্যে, উমাসুন্দরীর খেয়াল কতকগুলি আছে। সেগুলি বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিতে হইবে ও মান্য করিয়া চলিতে হইবে। তা ত' করিতেই হইবে, তা নইলে অর্থ উপার্জ্জন কি অমনি হয়? আর অন্যায় কার? আইন অনুসারে ও সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী, বিষয় যাহাদের

প্রাপ্য তাহাদিগকে বঞ্চিত করা—তাতে ভোলানাথের দোষ কি? যাহাদের যথার্থ প্রাপ্য, তাহারা যদি তাহাকে খুসী করিয়া না লয়, তবে তাহার দোষ, না অপর পক্ষের দোষ?

"সুখাদ্যং প্রাপ্ত মাত্রেণ ভক্ষয়েৎ" এই সার কথার অনুসরণ করিয়া ভোলানাথ কার্য্যে রত হইলেন। এক দিন ভোলানাথ বেলা দ্বিপ্রহরে উমাসুন্দরীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত।

ভোলানাথ। কই গো দিদিমা, কোথায়?

উমাসুন্দরী। এস দাদা এস। কেমন আছ, কবে এলে? ধূমাবতী কেমন আছে, রাহুরাম কেমন আছে?

ভোলানাথ। দিদিমা, প্রণাম করি। আমাদের সব ভাল। তোমরা কেমন আছ? আগামী সপ্তাহে আমাদের বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীর এক পর্ব্ব আছে। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী এই সময়ে বিন্ধ্যাচলে আগমন করেন এবং পুণ্যসলিলা গঙ্গা-জলে অবগাহন স্নান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন। যে যোগে এই পর্ব্ব, তাহা আজ পঞ্চাশ বৎসর পরে হইতেছে। কখনও পঞ্চাশ, কখন পঁচাত্তোর, কখনও একশ' বৎসর পরে এই যোগ হয়। শাস্ত্রে বলে এই যোগে বিন্ধ্যাচলে স্নান করিলে লক্ষ গাভী দানের ফল হয়। আপনাকে লইয়া যাইতে রাহুরামের মা আমাকে পাঠিয়ে দিল। বলিল, দিদিমাকে লইয়া আসিও, এমন সুযোগ জীবনে আর আসিবে না, দিদিমা স্নান করিয়া যাইবেন। আরও বলিয়া দিয়াছে যে, আপনি নিজে হইতে একটি পয়সাও খরচ করিতে পাইবেন না, তার জন্য রাহুরামের মা আমার সঙ্গে ৫০৲ টাকা দিয়াছে।

উমাসুন্দরী। তা ভাই, আমার আর কে আছে? ধূমার মা তার ছেলে-মেয়ে নিয়েই ব্যস্ত। আমাকে ত' দেখে না; খোজ খবরও লয় না। নাতিগুলো লড়ায়ে সেপাই, বাপ বল্‌তে শালা। তা হোক, আমার

ধূমি যে, আমার খবর লইয়াছে সেই ভাল। দেখ্‌ছি, তার বুদ্ধি ভাল। মায়া আছে ; দিদিমা বলিয়া টান আছে।

ভোলানাথ। দিদিমা, সে প্রায়ই আপনার কথা বলে। বলে যে তার মার চেয়ে সে দিদিমার যত্ন বেশী পেয়েছে, সে তার দিদিমাকেই মা বলিয়া জানে। সে অনেকবার আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিল। তা, আমি কেবল রাজি হই নাই। আমি বলিতাম, দেখ, দিদিমার টাকাকড়ি আছে, তার নিজেরও পেটের মেয়ে রয়েছে, যদি আমরা তাকে লইয়া আসি, তবে লোকে বলবে টাকার লোভে দিদিমাকে লইয়া গেল। যদিও তুমি বিন্ধ্যাচলে থাকলে, তোমার ইহকাল, পরকাল দু'কালের পক্ষেই ভাল, কিন্তু পাছে লোকে কিছু বলে, সেই লোক-নিন্দার ভয়ে আমরা এতদিন আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পারি নাই। তবে এই যোগের সুযোগ জীবনে আর হইবে না, সেই জন্যই এইবার আসিয়াছি।

আমাদের বিন্ধ্যবাসিনী-মূর্ত্তি সাক্ষাৎ জগদম্বা। তাঁহাকে রোজ দর্শন করিলে শত জন্মের পাপ মোচন হয়। আর তাঁর প্রসাদ যে কি উপাদেয়, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গা স্নান ও বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন, মধ্যাহ্নে প্রসাদ ভক্ষণ, সন্ধ্যায় আরতি দর্শন, রাত্রে পুনরায় প্রসাদ ভক্ষণ, জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি না থাকিলে এরূপ সৌভাগ্য হয় না। কত সাধু সন্ন্যাসী চিরজীবন এইরূপে অতিবাহিত করিতেছেন।

'মা বিন্ধ্যবাসিনী, তুমিই ধন্য, আর ধন্য তোমার ভক্ত-বৃন্দ'--এই বলিয়া ভূমি মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিলেন। আর মুখে বলিতে লাগিলেন, মা তুমিই ধন্য, আর ধন্য তোমার পুণ্য স্থান।

উমাসুন্দরী। হাঁ, বিন্ধ্যাচল পীঠ-স্থান বটে।

ভোলানাথ। পিঠ-স্থান, ও মাথার স্থান। এ কি যে সে স্থান। এ জাগ্রত বিন্ধ্যবাসিনীর স্থান। এ স্থানে মানুষ ভাল ভাবে বেশী দিন থাকলে সশরীরে বৈকুণ্ঠে স্থান, গ্রহণে-দান আর বৈকুণ্ঠে স্থান।

"হালে একদিন রাহুর মাতা বিছানা হইতে উঠেন নাই। বাবার চা খাবার সময় হ'য়ে গেল। রাহুর মাতাই বাবাকে চা খাওয়ায়, কাজেই বাবার চা খাবার সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল—বাবা "বৌমা" "বৌমা" রব করিতে লাগিলেন। বৌমার সাড়াও নাই শব্দও নাই। খানিক বাদে তাহার ঘরে গিয়ে দেখা গেল, রাহুর মা গোঁ গোঁ করছে। বাবাও ছুটে এলেন—অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে যতটা ছোটা সম্ভব, আস্তে আস্তে আমার ঘরের কাছে এলেন—এবং দেখলেন রাহুর মার দাঁতি লেগে গেছে। অনেক ধস্তাধস্তিব পর তাহার জ্ঞান হইল।

তখন সে বলিতে লাগিল, বাবা, আমার পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, একটা দিদিমা। তাহার প্রতি আমাদের এই কুব্যবহার আমি সহ্য করিলাম, কিন্তু ধর্ম্ম সহ্য করিবে কেন। ভোর রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিলাম—মা বিন্ধ্যবাসিনী মহিষ-মর্দ্দিনী রূপ ধারণ করিয়া আমার গলার উপর চাপিয়াছে। আমি ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মা বিন্ধ্যবাসিনী জলদ-গম্ভীর-স্বরে বলিতে লাগিলেন, পাপীয়সি, তুই নিজে আমার পায়ের কাছে থাকিয়া দিদিমার একবার খবর নিস্ না। তাহার ইহকালের ও পরকালের কি হইবে, তাহারও ত' একবারও খবর রাখিস্ না। যদি তুই তাহার খোঁজ খবর না রাখিস্, তবে তোর সপরিবারে শেষ করিব, আর যদি তোর দিদিমা তোর বলা সত্ত্বেও আমার স্থানে না আসে, তবে তাহার পক্ষেও সম্পূর্ণ অমঙ্গল।

বাবা, এই কথা শুনিয়া বলিলেন, সে কি, তোমার দিদিমাকে বিন্ধ্যাচল ধামে লইয়া আইস। ইহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, তবে

যত দিন তিনি আমার ভদ্রাসনে থাকিবেন, তত দিন তোমরা তাঁহার নিকট হইতে খাইবার খরচ বলিয়া একটি পয়সাও লইতে পারিবে না। এই কথায় যদি রাজি হও, তবে তোমার দিদিমাকে লইয়া আইস, তিনি আমার সংসারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া থাকিবেন। তাঁহার প্রতি বিন্ধ্য-বাসিনীর দয়া হইয়াছে, অতি উত্তম, অতি উত্তম।

তা দিদিমা এরূপ অবস্থায় আপনাকে না লইয়া আর আমি বিন্ধ্যা-চলে ফিরিব না। 'মা বিন্ধ্যবাসিনী, তুমিই সত্য।'

এই বলিয়া মাটিতে মস্তক ঠেকাইয়া বারবার প্রণাম করিতে লাগিলেন।

উমাসুন্দরী। তা ভাই, যখন তোমাদের এত ইচ্ছা, আর বিন্ধ্য-বাসিনীর এত দয়া, তখন আমি এই যোগ সময়ে বিন্ধ্যাচলে যাইব। তবে আমার দলিল দস্তাবেজ টাকাকড়ি, গহনা-আদি কোথায় রাখিয়া যাইব?

ভোলানাথ। না দিদিমা, নিজের টাকাকড়ি, সোনাদানা, দলিল দস্তাবেজ নিজের কাছেই থাকা ভাল। আজ কাল যে দিনকাল প'ড়েছে, বাপকেও বিশ্বাস নাই, তা অন্যে পরে কা কথা। একটা কাজ কর। একটি বড় ভাল মজবুত ষ্টীল ট্রাঙ্ক কিনিয়া আনিয়া দি; দাম তোমার দিতে হইবে না, আমিই দিব। তুমি তোমার গহনা, কাগজ, দলিলাদি সেই ষ্টীল ট্রাঙ্কে পুরিয়া লও। চাবীটি তোমার কাছে কোমরেই রাখ। আমি একটা রূপোর চাবী শিকলী কিনিয়া দিতেছি। আর যত দিন না তুমি ফিরিয়া আস, আমার বন্ধু হরেনবাবু তোমার ভাড়া আদি আদায় করিবেন। তিনি আমার পরম বন্ধু, তোমার কাছ থেকে একটি পয়সাও লইবেন না। আপনার লোকের কাছ থেকে টাকা লওয়া যে গোরক্ত, ব্রহ্মরক্ত।

উমাসুন্দরী মনে মনে বুঝিয়া দেখিলেন, বিনা খরচে তীর্থ দর্শন; ভাল থাকা, ভাল খাওয়া, ভাল দেখা এ সবই পরস্মৈপদে। আর দেবতাও জাগ্রত। এর চেয়ে সুবিধা আর কি হ'তে পারে? তিনি যাইতে রাজি হইলেন। তবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার শ্বাশুড়ী নারীও কি যাইবে?

ভোলানাথ। আজ্ঞে না। তাঁহার সম্বন্ধে কোন স্বপ্নাদেশ হয় নাই। আর এ সব কথা আপনি কাহাকেও বলিবেন না। কেন না ভাল কার্য্যের বিঘ্ন অনেক।

উমাসুন্দরী। (নির্ভয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া) আচ্ছা, তবে যাইব।

ভোলানাথ ষ্টীল ট্রাঙ্ক, রূপার চাবী শিকলি ও একটি চাবী উমাসুন্দরীর হাতে দিলেন। ষ্টীল ট্রাঙ্কের অপর চাবীটি ভুলে নিজের চাবীর থোলোয় রাখিয়া দিলেন। এ কথা কাহাকেও বলিতেও ভুলিয়া গেলেন।

ইহার পাঁচ দিন পরে এক দিন উমাসুন্দরী হঠাৎ তাঁহার বাড়ী হইতে উধাও হইয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু বলিয়া গেলেন না। তবে তাঁহার ঘরে তিনটা চব্‌সের তালা লাগান। সেইদিন হইতে ভোলানাথকেও সে পাড়ায় আর দেখা গেল না, ভাঁড়ের কর্পূরের ন্যায় উমাসুন্দরী যেন উপিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মৃত্যু ভয়ঙ্কর

আজ প্রায় দুই বৎসরের কথা, উমাসুন্দরী তাঁর বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রায়ই বিন্ধ্যাচলে থাকেন, আর সময়ে সময়ে অন্য তীর্থেও যান। তবে এমন সব তীর্থে যান, যেখানে দলিল রেজেষ্ট্রির আফিস আছে।

উমাসুন্দরী ধূমাবতীর বসতবাটীতেই থাকেন। ধূমাবতী, ভোলানাথ ও ভোলানাথের পিতা সকলেই তাঁহাকে খাতির যত্ন করেন। তাঁহার খাওয়া পরা ও থাকা কোন খরচই লাগে না।

তবে তাঁহার যতগুলি কোম্পানীর কাগজ ছিল, সবগুলিই সুদ বাহির করিবার জন্য ভোলানাথকে দেওয়া হইয়াছিল। ভোলানাথ সুদ বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন। তবে উমাসুন্দরী যখন ভোলানাথকে সুদ বাহির করিতে দেন, তখন কাগজগুলি সব সাড়ে তিন পারসেণ্ট, আর যখন সুদ বাহির করিয়া ভোলানাথ কোম্পানির কাগজ ফিরাইয়া দিলেন, তখন সব-গুলি তিন পারসেণ্ট হইয়া গিয়াছে; আর পাঁচ হাজারের কাগজ এক হাজার হইয়া গিয়াছে, হাজারের কাগজ এক শত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উমাসুন্দরী তাহা জানিতে পারিলেন না। যতগুলি কাগজ দিয়াছিলেন ততগুলিই গুণিয়া ফেরৎ পাইলেন। তিনি বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে তাহাকে একখানি দরখাস্ত সহি করিতে হইয়াছিল; তাঁহার

বাটী যাহাতে পুলিশ ভাল করিয়া হেপাজতে রাখে, তিনি দরখাস্তের এই উদ্দেশ্য বলিয়া জানিতেন। আর ভোলানাথ তাঁহার বাটীগুলির ভাড়া আদায় করিয়া আনিয়া দিবে। তাহার জন্যও এক দরখাস্তে সহি করিতে হয়; কিন্তু—ভ্রম ক্রমে এই দুইখানি দরখাস্তের পরিবর্ত্তে উমাসুন্দরী দুই-খানি জেনারল-পাওয়ার-অব-এটর্ণি সহি ও রেজেষ্ট্রি করিয়া দিলেন। একখানি ভোলানাথের নামে ও অপর খানি ভোলানাথের বন্ধু হরেনের নামে।

মাসে মাসে ভোলানাথ ভাড়ার টাকা হিসাব করিয়া আনিয়া দেন। তবে বিন্ধ্যাচলে আসিবার আগে তাহার অস্থাবর সম্পত্তি সকল দায়-সংযুক্ত ছিল না; এখন সেই সম্পত্তিগুলি বিশেষরূপে দায় সংযুক্ত হইয়াছে। এমন কি দুইটি সম্পত্তি হরেনবাবু তাহার 'সাধারণ পাওয়ার-অব-এটর্ণি'র বলে বেশী সেলামি লইয়া কম ভাড়ায় ৯৯ বৎসরের 'লিজ' দিয়াছেন। অর্থাৎ যতদূর সম্ভব নগদ টাকা বাহির করিয়া লইয়াছেন। তবে উমাসুন্দরী সে লিজের বা দায়সংযোগের কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই।

বিন্ধ্যাচলে আসিবার একবৎসর পর হইতে তাঁহাকে মাঝে মাঝে ভাড়ার ও সুদের টাকা হইতে রাহুরামকে গহনা গড়াইয়া দিতে হইত; আর না হয় গহনা গড়নের টাকা ধার দিতে হইত।

দুই বৎসরের পর, ক্রমে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। উমা-সুন্দরী অবশেষে বিছানা লইলেন। এবং ক্রমে যতই তাঁর রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাঁহার সেবা-শুশ্রূষারও ততই অসুবিধা হইতে লাগিল।

ধূম্রাবতী গৃহকর্ম্ম করিয়া তাঁর দিদিমার শুশ্রূষার সময় পান না। উমাসুন্দরী তাঁহার স্বামীকে মৃত্যুশয্যায় যেমন ভাবে রাখিয়াছিলেন, ধূম্রাবতী ও ভোলানাথ বর্ণে বর্ণে উমাসুন্দরীকে ঠিক সেই অবস্থায়

রাখিলেন। সেই ছেঁড়া মাদুর, সেই মড়া-ফেলা বালিশ ও থুথু ফেলিবার জন্য সেই পয়সায়-চারিটা দরের একটা গেলাস, আর আহার গঙ্গাজল ও গঙ্গামৃত্তিকা।

জীবনের শেষ তিন দিন উমাসুন্দরী লক্ষ লক্ষ পিপীলিকার খাদ্য হইলেন। অবশেষে প্রাণবায়ু পিপীলিকার আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে অপরাগ হইয়া ভঙ্গ দিয়া বেলা চারিটার সময় তাহার পূর্ব্বস্থান হইতে পলায়ন করিল। সেদিন বেলা দ্বিপ্রহরে ধূমাবতী ও ভোলানাথ তাহাদের বংশধর রাহুরামকে লইয়া বনভোজনে গিয়াছিল। আসিতে রাত্রি অধিক হয়। অতএব যখন প্রাণবায়ু বহির্গত হইল, তখন পিপীলিকার দল ছাড়া সে স্থানে অপর কেহ ছিল না। প্রাণবায়ু ছাড়িয়া যাইবার আগে উমাসুন্দরী পিপাসায় মুখ বিকৃত করিয়াছিল; কিন্তু কেহই তাহা দেখিতে পাইল না। রোগী ত জল একেবারেই পাইল না।

ধূমাবতী জলসায় যাইবার পূর্ব্বে একটা হিন্দুস্থানী চাকরাণীকে উমাসুন্দরীকে দেখিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। একদিকে যেমন ধূমাবতী ও ভোলানাথ বাটী ছাড়িয়া জলসায় গেলেন, অপর দিকে মোটি (দাসীকে তাহার স্থূলতাপ্রযুক্ত লোকে মোটি মোটি বলিত) তাহার মাসীকে দেখিবার জন্য উমাসুন্দরীকে সেই অবস্থায় রাখিয়া গৃহত্যাগ করিল। আর ধূমাবতী বাটীতে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই বাটীতে আসিয়া পৌছিল।

যখন ধূমাবতী বাটীতে ফিরিয়া মোটিকে আসিয়া উমাসুন্দরীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কিছু না দেখিয়াই ও না জানিয়াই বলিল, সেই রকমই আছে। সেদিন রাত্রে সেইরূপই রহিয়া গেল। পরদিন প্রাতে জানা গেল উমাসুন্দরী ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে।

আর ধূমাবতী জানিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, আর কিছুদিন

দেরীতে মরিলেই ভাল হইত। মরিবার জন্য এত তাড়াতাড়ির কোন প্রয়োজনই ছিল না। তিনি কিছুদিন বাদে মরিলে, তাঁহাদের একটু সুবিধা হইত।

অবশেষে, মুর্দ্দাফরাস আদি ডাকিয়া লাস বাহির করিতে বেলা প্রায় দুইটা বাজিল। কেহই তাঁহার মুখাগ্নি করিল না। কেহই তাঁহার জন্য দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিল না।

ভোলানাথ যতদিন পারিলেন, উমাসুন্দরীর মৃত্যুর কথা চাপিয়া রাখিয়া দিয়া, যাহাতে উমাসুন্দরীর কন্যা নারীসুন্দরী ও তৎপুত্রগণ নালিশ আদি গোলমাল করিয়া ভুক্ত-অর্থ পুনরুদ্ধার করিতে না পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই সব কর্ম্মে তাঁহার পত্নী ধূমাবতীই তাঁহার প্রধান সহায়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ষড়যন্ত্র

উমেশ ডাক্তার মারা গিয়াছেন। তাঁহার—হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণকৃষ্ণ, হরেরাম ও রামরাম এই চারি পুত্র। কন্যারত্নও চারিটী; প্রথমা ধূমাবতী, দ্বিতীয়া ধূলিকা, তৃতীয়া ধূমিকা আর চতুর্থ কন্যা ধূমপ্রভা। উমেশবাবু জীবিত অবস্থাতেই ধূলিকা ও ধূমিকার বিবাহের কথা নরনাথের সহিত প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন ধূমাবতী সে প্রস্তাবের সমর্থন করেন নাই। উমেশ ডাক্তার হুঁসিয়ার লোক ; তিনি জীবিত থাকায় ধূমাবতী তাঁহার ভগিনীকে শ্বশুরের বিষয়ের বখ্‌রাদার করিতে রাজি ছিলেন না। সুতরাং সে সময়ে সেই শুভ কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই।

নরনাথের বয়স এখন প্রায় কুড়ি বৎসর। ভোলানাথের চেষ্টায় তাহার লেখাপড়া বিশেষ হয় নাই। রাধানাথ কনিষ্ঠ পুত্রকে বিশেষ ভাবে বিদ্যাশিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভোলানাথের বিশেষ চেষ্টায় ও অধ্যবসায় গুণে রাধানাথ সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যদিও ধূমাবতীর বিবাহের পূর্ব্বে নরনাথ যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু ধূমাবতীর আগমনের পর তাহারই পরামর্শে ও ভোলানাথের চেষ্টায় নরনাথ বিদ্যালাভ বিষয়ে আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারে নাই।

যখন তাঁহার মাতা জীবিতা ছিলেন, ধূমাবতী ও ভোলানাথ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন, নরনাথের স্বাস্থ্য খুব ভাল নয়, বিদ্যা শিক্ষার পরিশ্রমে

স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারে। যাহা হউক, কিছু শিখিয়াছে, অধিক শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন, নরনাথ বয়ঃস্থ হইলে তাহাকে একটা ব্যবসা করিয়া দেওয়া যাইবে। ভোলানাথের চেষ্টায় ও যত্নে সে ব্যবসায় প্রভৃত অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

যখন এ সব বিষয় লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে, তখন নরনাথের একবার উদরাময় পীড়া হইল। সে পীড়ায় সে একমাস কাল ভুগিল। ভোলানাথের ইচ্ছানুরূপ ডাক্তার বাবু ভোলানাথের মাতাকে জানাইল, নরনাথের শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম একেবারেই নিষিদ্ধ। কাজেই নরনাথের লেখা পড়া স্থগিত রাখা হইল। সেই অবধি নরনাথ আর লেখা পড়া করিল না। নরনাথ নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া মহা আনন্দিত হইল, ততোধিক আনন্দিত হইলেন ভোলানাথ। তিনি ভাবিলেন ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক।

আত্মনাথ শিলিগুড়িতে চাকরী করেন আর ম্যালেরিয়ায় ভোগেন। মাতাপিতা বিন্ধ্যাচলে বাস করেন, তাঁহাদের নিকট ভোলানাথ ও নরনাথ থাকে, আর তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করে। ভোলানাথ আত্মনাথকে প্রায় যে সব চিঠিপত্র লেখেন, সেই সব চিঠির প্রধান মন্তব্য—সে যেন শিলিগুড়িতে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। ভোলানাথ ও নরনাথ বাপ-মার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে; আর আত্মনাথ সংসারে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বাপমার অভাব-মোচন করুক, আর জগতে নিজের উন্নতি সাধন করুক। তাহারা দুই ভায়ে জগতে নিজেদের উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া মাতাপিতার সেবায় আপনাদের কোমল ও সুকুমার প্রাণ কর্ত্তব্যের পদে অঞ্জলি দিয়াছে, আর আত্মনাথ কি তাহার কর্ত্তব্যের অংশ পালন করিবে না? তাহারা তিনজনেই উচ্চ আদর্শস্থানীয় পিতৃদেবের পুত্র, তাঁহার পুত্র হইয়া তাহারা কর্ত্তব্য পালনে

বিমুখ হইবে? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। তাহা হইবার নয়, হইবেও না। আত্মনাথকে এই জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতেই হইবে। তাহার জন্য ক্লেশ সহ্য করিতে হয় ত অম্লান বদনে সে তাহা সহ্য করিবে।

এই ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভোলানাথের পরামর্শ। সেই উপদেশ মত তাহার গন্তব্য পথে চলিবার জন্য আত্মনাথ অম্লান বদনে একাকী শিলিগুড়িতে থাকিয়া অশেষ কষ্টভোগ করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কর্ত্তব্য-পালনে জীবনপাত হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি তিনি কর্ত্তব্যহারা হইবেন না।

অনেকদিন হইল আত্মনাথ তাঁহার মাতাপিতার চরণ দর্শন করিতে আসেন নাই। তাহার মাতা ও পিতা ব্যাকুল হইয়া আত্মনাথের বিন্ধ্যাচলে আগমনের জন্য ভোলানাথকে লিখিতে বলেন। ভোলানাথ তাহাকে সে কথা একেবারেই লেখেন না, পরন্তু, তাহাকে শিলিগুড়িতে থাকিয়া কর্ত্তব্যপালনে বারংবার বিশেষ অনুরোধ করেন। রাধানাথ নিজেও আত্মনাথকে দু একবার বিন্ধ্যাচলে আসিতে লিখিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথও তাঁহাকে লিখিলেন, তিনি যেন কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট না হন। জীবনে কর্ত্তব্য পালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম হইতে আত্মনাথ যেন বিচ্যুত না হন।

কাজেই আত্মনাথ পিতাকে চিঠি লেখেন যে, এখন তাঁহার বিন্ধ্যাচলে যাইবার সময় নাই, সুবিধা করিতে পারিলে তিনি বিন্ধ্যাচলে গিয়া তাঁহাদের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন।

এদিকে ভোলনাথ তাঁহার মাতাপিতাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন যে, আত্মনাথ নিরতিশয় স্বার্থপর। তাঁহার অপেক্ষা স্বার্থপর আত্মনাথের পরিণীতা স্ত্রী, ধৃতি। তাঁহারা নিজের সুখ লইয়াই ব্যস্ত—মাতাপিতার জন্য তাঁহাদের প্রাণ একেবারেই কাঁদে না। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের

প্রতি এত আকৃষ্ট যে, তাঁহারা একেবারেই কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে ভোলানাথ আত্মনাথকে যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার একখানি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"প্রাণপ্রতিম ভাই আত্মনাথ,—

কয়েকদিবস তোমার স্নেহপূর্ণ পত্র না পাইয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন আছি। ভগবান্ জানেন, একদিন তোমার শুভ সংবাদ না পাইলে, প্রাণ কিরূপ ব্যাকুল হয়। তুমি কখনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হও নাই, সেইজন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দায়িত্বপূর্ণ জীবনের ক্লেশের ধারণা করিতে পার না। আমি জানি, বিদেশে একাকী থাকার ক্লেশ অতিশয় তীব্র। কিন্তু ভাই কি করিবে। জীবন কর্ত্তব্যময়, আর কর্ত্তব্য-পালন অশেষ ক্লেশদায়ক। ঘুমাইয়া স্বপনে আমরা দেখি, জীবন হাস্যময়; আর ঘুম ভাঙ্গিলেই দেখি, জীবন কর্ত্তব্যময়। কি করিবে ভাই, কর্ত্তব্য-পালনে কষ্ট আছেই; আর এই কষ্টেই সুখ আছে।

অনেক সময় ভাবি, বাপ-মার চরণ-সেবা-কার্য্য তোমাকে দিয়া আমি বিদেশে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইয়া, পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইব। কিন্তু আবার পরক্ষণেই মনে পড়ে—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্ত্তব্য। তখনি আমার হৃদয় শিহরিয়া উঠে, তখনি আমি পরম করুণাময়, জগৎপিতা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—ভগবান্, আমার মনে বল দিন, আমি যেন দিশেহারা না হই। প্রভো, আমি যেন কর্ত্তব্যপথ না ভুলি। আমি যেন কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রাপ্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত না করি।

আমি নিজের জন্য অর্থ চাহি না, ধর্ম্ম চাহি না, কাম চাহি না, মোক্ষ চাহি না, সুখ চাহি না, কীর্ত্তি চাহি না; চাহি কেবল কর্ত্তব্য-

পালন করিতে, চাহি কেবল ছোট ভাইকে তাহার প্রাপ্য বুঝাইয়া দিতে। তাই ভাই, প্রাণের আবেগ রুদ্ধ করিয়া তোমার সঙ্গসুখে নিজেকে, মাতাপিতাকে ও তোমাকে বঞ্চিত করিয়া, কর্ত্তব্যের যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিতেছি।

মাতাপিতা কয়েকবার তোমাকে এখানে আসিবার জন্যে আমাকে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহাদের বুঝাইয়া দিলাম যে, তুমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহাদিগকে ও আমাকে তোমার সহবাস-সুখে বঞ্চিত করিতেছ। তোমাকে না দেখিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। আর তুমিও আমাদিগকে সে সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে বিশেষ কষ্ট পাইতেছ। ভাই আগুনাথ, আমি বাল্যাবস্থা হইতেই তোমাকে বলিয়া আসিতেছি, জীবন কর্ত্তব্যময়। সেই কর্ত্তব্য পালন করিতে জীবন দুঃখময় হয় হউক, জীবন কষ্টময় হয় হউক, কর্ত্তব্যের কশাঘাতে সকল দুঃখ, সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা অবাধে সহ্য করিতে হইবে। জীবনের অরুণোদয়ে কর্ত্তব্য, জীবনের মধ্যাহ্নে কর্ত্তব্য, জীবনের সন্ধ্যায় কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য প্রথম, কর্ত্তব্য দ্বিতীয়, কর্ত্তব্য সকল সময়ে। কর্ত্তব্যহীন জীবন জীবনই নয়।

ভাই, তুমি কর্ত্তব্যময় পুরুষ, কর্ত্তব্যের খাতিরে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছ। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করিবেন, ভগবান্ তোমার মনে বল দিবেন। ভাই, তুমি বেশ জেনো, যাঁর কার্য্য তিনি করেন, লোকে বলে করি আমি। তুমি মাতা-পিতার জন্য কোনরূপ চিন্তা করিও না। তুমি জান, আমি মাতা-পিতার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি; আমি তাঁহাদের সেবার জন্য কাহাকেও কষ্ট দিতে চাহি না,—সে কষ্ট আমি একাই ভোগ করিব। স্বার্থপরতাকে আমি শয়তানের চেয়ে ঘৃণা

করি এবং সকল সময়েই তাহাকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখি। তবে মাতা-পিতার সেবা বিষয়ে আমি নিশ্চয়ই স্বার্থপর, সে পুণ্য আমি একাই অর্জ্জন করিব। সেই পুণ্যের ভাগ আমি তোমার সহিত বখ্‌রা করিতে রাজী, কিন্তু সেবাজনিত ক্লেশের ভার, তোমাতে আমাতে দুজনে বখ্‌রা করিতে রাজী নহি। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, সওয়ায় ক্লেশের অংশ। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন, মাতা-পিতার প্রতি তোমার ভক্তি অক্ষণ্ণ রাখুন।

তোমার জীবন আদর্শময়। তুমি জীবনে কখন কাহারও অর্থে নজর করে নাই,—এমন কি মাতাপিতার অর্থেও নয়। তুমি চিরকাল পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ, মাতাপিতার দ্রব্যেও তাহাই। ভগবান্ তোমার এই সৎসাহস চিরকাল অক্ষুণ্ন রাখুন।

আশা করি, বধূমাতা তোমার সহিত মনের সুখে শিলিগুড়ির প্রকৃতির নির্ম্মল শোভা উপভোগ করিতেছেন। সেই রমণী অতি ভাগ্যবতী, যে স্বামীর নিজ উপার্জ্জনের অর্থে জীবনধারণ করিয়া স্বামী-সেবায় জীবন অতিবাহিত করিতে পারে; আমাদের বধুমাতা তাহাই করিতেছেন। তিনিই ধন্যা, তাঁহার জীবনই ধন্য, তাঁহার কার্য্য-কলাপই ধন্য। ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল করুন, তাহার জীবনে বল দিন। আমরা সব ভাল আছি, মাতা-পিতা বেশ মনের সুখে আছেন। তাঁহাদের শারীরিক অবস্থা ভাল।

রাহুরাম প্রায়ই মেজকাকা ও মেজ কাকী মা বলিয়া মহাগোলমাল করে। প্রায়ই বলে, মেজকাকা ও মেজকাকীমা কবে আসিবেন? তোমরা তাহাকে এক খানা আলাদা পত্র লিখিবে। ভগবানের অপার লীলা; যেমন মানুষের জন্ম দেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সে নবজাত শিশুদের মনে আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসার বীজ রোপণ করিয়া

দেন, আর সেই বীজ ডালপালা লইয়া ফুল ফল-বিশোভিত এক বৃক্ষে পরিণত হয়। ভগবানের কার্য্য অপরূপ; তাঁহার তত্ত্ব বুঝিবার ক্ষমতা মানুষের অতীত। সেই বহুতত্ত্বদর্শী ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন।

কর্ত্তব্যের পদে বিক্রীত-জীবন তোমার অগ্রজ, ভোলানাথ।"

যে দিন এই চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার পরদিন তাঁহার পিতা রাধানাথ, মাতা কাদম্বরী, ভ্রাতা নরনাথ, ভোলানাথ স্বয়ং ও তাঁহার পত্নী ধূমাবতী সন্ধ্যার পরে ছাদের উপর প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করিতেছিলেন। ঠিক কথা বলিতে গেলে, ভোলানাথ ও তাঁহার পত্নী ধূমাবতী ছাড়া অপর তিন জনেই স্বভাবের শোভা উপভোগ করিতেছিলেন; আর ভোলানাথ ও তাঁহার পত্নী ধূমাবতী নিজ নিজ স্বভাবের তীব্র দুর্গন্ধে সর্ব্বদাই মজগুল হইয়া রহিয়াছেন, কাজেই সেই দুর্গন্ধের মধ্যে অপর কিছুই উপভোগ করিতে পারেন নাই, করিবার ক্ষমতাও নাই।

রাধানাথ। দেখ বাবা ভোলানাথ, আত্মনাথের অনেক দিন কোন সংবাদ পাই নাই। মনটা একটু উদ্বিগ্ন হইয়া আছে। সে অনেক দিন এখানে আসে নাই, তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণটা সদাই কাঁদে।

ভোলানাথ। বাবা, আমি তাহার একখানি চিঠি পাইয়াছি। সে ভাল আছে, আর আপনার বধূমাতাও সেখানে বেশ কুশলে আছে।

রাধানাথ। ভাল আছে সত্য, তবে তাহাদিগকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। তাহারা দুজনেই ছেলে মানুষ, বিদেশে সদাই মনে হয়, হয় ত তাহারা একলা কষ্ট পাইতেছে।

ধূমাবতী। বাবা, তাহারা ইচ্ছা করিলেই ত আপনাদের একবার দেখিয়া যাইতে পারে। বোধ হয়, তাহাতে তাহাদের অসুবিধা হয়,

নহিলে আসিয়া দেখিয়া যায় না কেন? খুব মনের বলের দরকার যে মা বাপকে ভাইদের না দেখিয়া এতদিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। আমার কথা ছাড়িয়া দেন। আপনাদের সেবার অসুবিধা হইবে বলিয়া, আপনাদের চরণসেবা ছাড়িয়া মাতাপিতাকে দর্শন করিতে যাইতে পারি না। মনের ইচ্ছা মনে চাপিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু মেজ ঠাকুরপোর তো তা নয়। সে পুরুষ মানুষ, ইচ্ছা করিলেই আসিতে পারে; তবে প্রবৃত্তির অভাব।

কাদম্বরী। আত্মনাথ ছেলেবেলা হইতেই এক রকম। তাহার পর বিবাহের পর হইতে আরও কি রকম হইয়া গিয়াছে।

ভোলানাথ। ছেলে মানুষ একটু আত্মসুখী, নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা লইয়াই ব্যস্ত, যাতায়াতের কষ্ট স্বীকার করিতে অপারগ। তা নিজের ছেলেপিলে হইলে তবে মাতাপিতা যে কি পদার্থ বুঝিতে পারিবে। আমার কথা ছাড়িয়া দেন। আপনারা আমার আদর্শ পিতামাতা, আমার জাগ্রত দেবতা। আমি আপনাদের পূজায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছি। সকলে ত জীবনটাকে এরূপভাবে বিলিয়ে দিতে পারে না, বলি দিতেও পারে না। ভগবান্ আত্মনাথের মনে বল দিন, সে কর্ত্তব্যের পথে আবার ফিরিয়া আসিবে। আর মেজ বৌমার কথা, সে স্বতন্ত্র; সে পরের মেয়ে। মেয়ে মানুষ মাত্রেই ময়দার তাল, যেমন করিয়া গড়িবে তেমনটী হইবে। আর আমার মাতাঠাকুরাণীর কথা যা বলিবেন তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উনি ত আর মানবী নন, উনি দেবী, শাপভ্রষ্টা হইয়া মানবী বেশে পৃথিবীর আদর্শরূপে এ জগতে আসিয়াছেন। আর, সকলের মায়া ত সমান নয়; আত্মনাথ বাল্যকাল হইতে একটু একলষেঁড়ে; তা ক্রমে সেটা সারিয়া যাইবে।

ধূমাবতী। (নরনাথকে লক্ষ্য করিয়া চুপে চুপে) তোমার মেজদা

এক রকমের। সে একেলা থাকিতেই ভালবাসে। একটু তফাতে থাকিতে চায়, পরের ঠেশ একেবারেই সহিতে পারে না।

নরনাথ। (ধূমাবতীর কথাগুলি শুনিয়া—উচ্চৈঃস্বরে) মেজদা' এক রকমের। একলা থাকিতেই ভালবাসে। একটু তফাতে থাকিতে চায়, পরের ঠেশ একেবারেই সহিতে পারে না।

ভোলানাথ। ক্রমে ভাল হইবে। এখন ছেলে মানুষ, তাই ওরকম; ক্রমে শুধ্‌রাইয়া যাইবে। আমার মাতাপিতা ত সাক্ষাৎ দেবদেবী; আমরা ত তাঁহাদের ভক্তি, পূজা ও সেবা করিবই। যাহারা তাঁহাদের গর্ভে জন্মায় নাই তাহারাও উহাঁদিগকে মাতা পিতা বলিয়া ডাকিতে উদ্‌গ্রীব, তাহারাও উহাঁদের সেবা করিতে উৎসুক। বিশেষ সৌভাগ্য বিনা এরূপ মাতা-পিতা লোকের ভাগ্যে ঘটে না।

রাধানাথ। এরূপ ব্যবহার করিলে নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মারিবে, তাদের আর কি!

ভোলানাথ। বাবা, যতদিন আপনাদের ভোলানাথ জীবিত থাকিবে, ততদিন আপনাদের কেশাগ্রেরও কোন অসুবিধা হইবে না। আপনারা বেশ জানেন যে, আমি আমার সমস্ত প্রাণ, মন, দেহ আপনাদের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছি। এ সেবা করিবার সুযোগ পরম ভাগ্যের কথা। আমি এই সেবাসুখের অংশ কাহাকেও দিতে রাজি নই, আপনাদের পুত্রবধূ ও আমাতে ইহা লইয়া বেশ বাদানুবাদ চলে। আমি বলি, আমার মাতা-পিতার সেবা আমিই করিব, ইহার অংশ আমি তোমাকে দিব না। কিন্তু সে বলে, শাস্ত্রানুযায়ী সে ইহার অংশীদার, যখন সে পুণ্যের অংশীদার, তখন সেই পুণ্যার্জ্জন-কর্ম্মেরও অংশীদার; তাই সে জোর করিয়া আপনাদের সেবায় নিয়োজিত, নতুবা আমি একাই সব করিতে রাজি। নরনাথ সর্ব্ব কনিষ্ঠ, তাহার কথা ছাড়িয়া দিন।

সেই কথাবার্ত্তার পর রাত্রে শুইয়া মাতা-পিতার মনে হইল, ভোলানাথ তাঁদের উপযুক্ত পুত্র, আর আত্মনাথ স্বার্থপর। ভোলানাথ যথার্থ তাঁহাদের ভালবাসে ও ভক্তি করে। তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য সে জীবনের সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। আর আত্মনাথ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দূরদেশে অবস্থান করিতেছে।

ইহার কয়েক দিবস পরে ধূমাবতী ভোলানাথকে বলিল, "দেখ, যেরূপ দেখিতেছি, শ্বশুরশাশুড়ীর মন ক্রমে আত্মনাথের কাছ থেকে সরিয়া যাইতেছে। আমিও সারাদিন সেই বিষয়ে লাগিয়া আছি। সুবিধা পাইলেই আত্মনাথের প্রতি তাঁহাদের বিরূপ অগ্নিতে বাতাস লাগাইতেছি। তবে বাকি রহিল নরনাথ। আমি মনে করিতেছিলাম, আমার এক কনিষ্ঠা ভগ্নীর সহিত নরনাথের বিবাহ দি'। তাহাতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাইবে; আমার মাতা মনে করিবেন, আমি তাঁহাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিলাম, আর আমার শ্বশুরশাশুড়ী ভাবিবেন, নরনাথ যখন আমার ভগ্নীপতি হইলেন, তখন আর তাহার জন্য আমাদের আন্তরিক টানের কোন অভাব হইবে না। এইরূপ করিতে পারিলেই আমাদের কার্য্য অনেকটা এগিয়ে আসিবে।

ভোলানাথ সে পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। ধূমাবতীর এমন কোন পরামর্শ ছিল না, যাহা ভোলানাথ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বুদ্ধিতে তাহাকে চাণক্য বলিয়া মনে করিতেন, এবং চাণক্যকে যেরূপ মান্য করা উচিত তাহাই করিতেন। ভোলানাথ বলিতেন, প্রত্যেককেই তাহার প্রাপ্য অর্থ দাও, আর নাই দাও, তাহার ন্যায্য মান্য দিবে; কেন না তাহা ত অর্থ দেওয়া নয়।

কিছুদিন পরে ধূমাবতীর কনিষ্ঠা ভগ্নী ধূমপ্রভার সহিত নরনাথের

বিবাহ হইয়া গেল। যখন উমেশ ডাক্তার জীবিত ছিলেন, তখন নরনাথের সহিত ধূম্রপ্রভার বিবাহে ধূমাবতীর বিশেষ আপত্তি ছিল; কিন্তু উমেশ ডাক্তারের মৃত্যুর পর এই বিবাহ ধূমাবতীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সে কার্য্যও সম্পন্ন হইল। কাদম্বরী যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ভোলানাথ যদিও পিতৃবৎসল, মাতৃবৎসল ও ভ্রাতৃবৎসল, তথাপি ধূমাবতী ত পরের মেয়ে। যদিও সে দেবরদের ভালবাসে ও যত্ন করে, তবুও ত সে পরের মেয়ে। নরনাথও ত আর তাহার মা'র পেটের ভাই নয়। কিন্তু এখন সহোদরার সহিত নরনাথের বিবাহ হওয়ায়, সে নরনাথকে আরও অধিক ভালবাসিবে, আরও অধিক যত্ন করিবে; আর তিনি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিবেন।

ইহার কিছুদিন পরে ধূমাবতীর ও ভোলানাথের চেষ্টায় ও যত্নে রাধানাথ তাঁহার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি রাহুরামের নামে লিখিয়া দিলেন, তাহার কয়েকটি এইরূপ;—

প্রথম—সকল অনর্থের ও অধর্ম্মের মূল যে অর্থ তাহা পিতৃদত্ত হইলেও ভোলানাথ গ্রহণ করিবেন না। যদি তিনি গ্রহণ না করেন ত তাহার পুত্র রাহুরাম সে সম্পত্তি পাইবে না, তবে রাধানাথ যদি রাহুরামকে দিয়া যান ত সে আলাহিদা কথা।

দ্বিতীয়—আত্মনাথ স্বার্থপর, মাতা-পিতার সেবায় অমনোযোগী আর নিজের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। অতএব তাহাকে তাহার মাতা ও পিতা স্থাবর সম্পত্তির অংশ দিতে একেবারেই নারাজ। আর তাঁহারা আরও দেখাইতে চান, যে লোক টাকা টাকা করিয়া হা হা করে, সে টাকা পায় না; যে টাকা খোঁজে না, টাকা তাহাকেই খোঁজে। ভোলানাথ টাকা চায় না তাহার পুত্রই বিষয় পাইল; আত্মনাথ টাকা চায় সে পিতৃ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইল।

তৃতীয়—নরনাথ সর্ব্ব কনিষ্ঠ, ধূমাবতীর ভগ্নীপতি ; তাহাকে দেশের বাটী ঘর—তাহার দাম খুব বেশী নয়—দিয়া ব্যতিব্যস্ত করা উচিত নয়। ভোলানাথ ত রাহুরামকে বলিয়া বাটীর অংশ দেওয়াইবেই ; অধিকন্তু নগদ কোম্পানির কাগজ যাহা কাদম্বরীর নামে ছিল, তাহার অধিকাংশই নরনাথকে দেওয়া হইল।

চতুর্থ—জায়গা জমির ঝঞ্ঝাট অনেক, বিশেষতঃ বসতবাটী ; তাহাতে আর কোন আয়ের সুবিধা নাই। নগদ টাকায় নরনাথের বিশেষ সুবিধা।

এদিকে রাহুরাম মাতা-পিতার, পিতামহ ও পিতামহীর যত্নে ও আদরে শশিকলার ন্যায় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সে যেমন পিতামহের বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইল, সেই সঙ্গে তাহার মাতা-পিতার নিজস্ব সম্পত্তি—হিংসা, দ্বেষ, দুরভিসন্ধি, ছল, চাতুরী, স্বার্থপরতা, ধর্ম্মহীনতা, অধার্ম্মিকতা, এই সমস্ত অসদ্‌গুণের ষোল-আনার মালিক হইল। মাতা-পিতার যাহা ছিল তাহা ত পাইলই ; আর পিতৃ-মাতৃ দত্ত অসদ্‌গুণের বিকাশ সম্পূর্ণরূপে তাহাতে হইল। সে সমস্ত অসদ্‌গুণের তৃতীয় দ্রবক্রম। এমন দোষ নাই যাহা রাহুরামে বিদ্যমান রহিল্ না ; উপরন্তু সে অত্যন্ত রাগী ও অধৈর্য্য, আর অতিশয় আবেগশীল।

রাহুরামের লেখাপড়ায় একেবারেই অবহেলা হইতে লাগিল। অবহেলার প্রধান কারণ, রাহুরাম সেই বংশের একমাত্র বংশধর। দ্বিতীয় কারণ, তাহার পিতামহ ও পিতামহী জীবিত আর তাঁহাদের কিছু সম্পত্তিও আছে। তৃতীয় কারণ, ভোলানাথ ও ধূমাবতী নিজের নিজের স্বার্থ লইয়া এত ব্যস্ত যে, একমাত্র পুত্রের লেখাপড়ার জন্য তাঁহারা তাহাদের বহুমূল্য সময় নষ্ট করিতে একেবারেই রাজি নন। চতুর্থ, নরনাথের শিক্ষা সম্বন্ধে মাতা-পিতাকে যে ভাবে বুঝাইয়াছিলেন, মাতা পিতা তাঁহার সেই নিঃস্বার্থ পরামর্শে বুঝিয়াছেন, শরীরকে কষ্ট দিয়া

লেখা পড়া শিক্ষা অতীব দোষনীয়। পঞ্চম, লেখা পড়া শিক্ষার কষ্ট সহ্য করিতে রাহুরামের একেবারে প্রগাঢ় অনিচ্ছা।

হিন্দুর প্রধান তীর্থস্থানের রাজপুত্রদের মত রাহুরাম দৌড়িয়া খেলা করিবেন, আর শিক্ষক মহাশয় তাহার পিছু পিছু দৌড়াইবেন, আর বলিবেন, ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মরক্ষক, শ্রীমুখে 'ক' বলিতে আজ্ঞা হয়, 'খ' বলিতে আজ্ঞা হয়। এরূপ করিলে হয় ত রাহুরাম শ্রীমুখে 'ক' বলিতেন, শ্রীমুখে 'খ' বলিতেন। কিন্তু সে রকম বন্দোবস্ত রাধানাথ বা ভোলানাথ করেন নাই। কাজেই রাহুরামের শ্রীমুখে 'ক' বলিতে আজ্ঞা হয় নাই, 'খ' বলিতেও আজ্ঞা হয় নাই।

পুষ্টিকর খাদ্যে রাহুরামের শরীর বেশ বাড়িতে লাগিল। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে ও আসকারার গুণে রাহুরামের ভবিষ্যৎ জীবনের বিষবৃক্ষ রোপিত হইল। রাহুরাম শরীরে ও দুর্ব্বৃত্ততায় বেশ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মোকর্দ্দমার আয়োজন গুণিলোকের চয়ন

কিছুদিন অতীত হইলে পর, নারীসুন্দরী মাতার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন; সে প্রায় মৃত্যুর দুইমাস পরে। মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাহার পুত্র চতুষ্টয় এখন খুব খুসী; বুড়ী মরিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইল। তখন দিন কয়েক তাহারা এক মত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিল; জীবনে কখনও একমত হইয়া মায়ে পোয়ে কার্য্য করে নাই, এখন করিল।

প্রথমেই তাহারা ওল্‌ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের আশ্রয় লইল। দেখিয়া শুনিয়া রামরূপ রায় মহাশয়কে পাণ্ডা নিয়োজিত করিল।

রামরূপ রায় মহাশয়ের পাণ্ডামহলে খুব নামডাক। বয়স অল্প হইলেও কার্য্যে খুব আটা। অতিশয় পচা মোকর্দ্দমা তিনি তাজা করিতে পারেন। তাঁহার আফিসে অনেক রকম লোকের যাতায়াত; মায়ে খেদান, বাপে তাড়ান, সৎকার্য্যে অকর্ম্মণ্য, অসৎকার্য্যে বিশেষ নিপুণ, দুষ্ট সরস্বতীর বরপুত্র অনেক অনেক যুবক দল, প্রৌঢ়ের দল ও বৃদ্ধের দল তথায় আসিয়া জটলা করে। তাহারা যে কি কার্য্য করে তাহা কেহ জানে না, তবে তাহারা এক রকম বেশ চালায়। সেই দলের মধ্য হইতে যে রকম কার্য্যের লোক চাও পাইবে। টাকা ধার করিতে চাও, তাহারা তোমার সহায়। মোকর্দ্দমার আনুষঙ্গিক লোকজন চাও তাহাতেও তাহারা তোমার সহায়। তোমার পুত্র উৎসন্ন যাইতেছে, তাহারা তোমার পুত্রের উৎসন্নের প্রধান সঙ্গী। তাহারা নিজে ত

উৎসন্ন গিয়াছেই। এখন খালি সঙ্গী খুঁজিতেছে, বিদ্যাবুদ্ধিহীন উৎসন্নের দিকে ধাবমান বিত্তশালী অল্পবয়স্ক যুবকবৃন্দ। তাহার একজন পাইলেই তাহাদের দশজন মিলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের একজনকে সুখী করিবার নিমিত্ত এই সাঙ্গোপাঙ্গের দল বিশেষ ব্যতিব্যস্ত। উৎসন্ন যাইবার পথে যাহা কিছু আবশ্যক, তাহারা সকলেই জানে। আর যেথায় যেথায় সেই সব আবশ্যক পদার্থ পাওয়া যায়, তাহারা তাহারও সব খবর রাখে।

পতনোন্মুখ যুবক, তুমি কেবল তাহাদের সঙ্গে আলাপ কর। তোমাকে নরকগামী করিবার জন্য বাকি যা কিছু প্রয়োজন, তাহার জন্য তোমায় কিছুই ভাবিতে হইবে না, সে সমস্তরই প্রাপ্তিস্থান তাহারা তোমাকে দেখাইয়া দিবে, আর প্রাপ্তির উপায়ও উদ্ভাবন করিয়া দিবে।

এক জায়গায় এতগুলি গুণী লোকের সমন্বয় রামরূপ রায় মহাশয়ের আফিসে ভিন্ন সচরাচর আর কোথাও পাওয়া যায় না। গুণী লোকের সাহায্যের জন্য নারীসুন্দরীর উপযুক্ত পুত্রেরা এই আফিস খুঁজিয়া লইল। এই সব পাঁচটি গুণিজনের সাহায্যে রামরূপ রায়ের আফিস হইতে নারীসুন্দরীর মাতাপিতার লুপ্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের আয়োজন প্রবলবেগে চলিতে লাগিল।

নারীসুন্দরীর নগদ টাকা বেশী ছিল না। কিন্তু এসব গুণিগণ থাকিতে অর্থের অভাবে মোকর্দ্দমা করিবার কোন অসুবিধাই হইবার নয়।

রেজেষ্ট্রি আফিস তল্লাস করিয়া জানিতে পারা গেল যে, উমাসুন্দরীর তরফ হইতে গত ত্রিশ মাসের মধ্যে প্রায় লক্ষ লক্ষ টাকা স্থাবর-সম্পত্তি দায়সংযুক্ত এবং অধিক সময়ের জন্য বাটী-আদি অল্প ভাড়ায় বন্দোবস্ত হইয়াছে। লেখাপড়ার ভিতর এই সংবাদ পাওয়া গেল, তাহার তরফ হইতে ভোলানাথ ইহার অনেক অধিক অর্থ শোষণ ও মোষণ করিয়াছে।

এই টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য পাঁচটি গুণি লোকের পরামর্শে নারী-সুন্দরী ও তাহার পুত্র চতুষ্টয় মহাজনের নিকট হইতে দুইটি স্থাবর সম্পত্তি বন্দক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন। মোকর্দ্দমা বেশ বেগে চলিতে লাগিল। এই কর্জ্জের টাকা হইতে নারীসুন্দরীর সংসার খরচও হইতে লাগিল আর মোকর্দ্দমার খরচও হইতে লাগিল।

এতদিন নারীসুন্দরীর এক সংসার ও পুত্র চতুষ্টয়ের চারিটি পৃথক সংসার ছিল। এখন মাতামহীর মৃত্যুর দুঃখসাগরে পড়িয়া সকলেই এক জায়গায় হইলেন। কাজেই এখন নারীসুন্দরীর সংসারে তাহার পুত্র চতুষ্টয়ের সংসার আসিয়া এক বৃহৎ সংসারে পরিণত হইল। নারীসুন্দরী তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর আবার চারিপুত্রের মাতা হইলেন।

উমেশ ডাক্তারের জীবিত অবস্থায় তাঁহারা সব এক জায়গায় ও এক সংসারে ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর মাতা ও পুত্র চতুষ্টয় প্রত্যেকে পৃথক হইয়া যান্ এবং শোকাবেগে যে যে দিকে সুবিধা পাইলেন পলাইয়া আশ্রয় লইলেন। আবার মাতামহী উমাসুন্দরীর মৃত্যুসংবাদের শোকে সকলে একযোগে মাতার সহিত মিলিত হইলেন। এক মৃত্যুতে আলাহিদা হইয়াছিলেন, আর অপর মৃত্যুতে একত্র হইলেন। মৃত্যুর পরাক্রম অদ্ভুত! ইহা পৃথকও করে আবার একত্রও করে।

নারীসুন্দরী ভোলানাথের নামে একলক্ষ টাকার দাবী দিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে মামলা রুজু করিলেন। বিন্ধ্যাচলে শমন ধরাইতে হইবে।

ভোলানাথ কলিকাতায় তাহার বন্ধু হরেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন; আর বলিলেন, ভাই আমাদের ভারী বিপদ। উমাসুন্দরী জীবিত থাকিতে তাহার কন্যা ও দৌহিত্রেরা তাহার একবার খোঁজ খবর লইল না, বুড়ী লোক অভাবে বিনা সেবা-শুশ্রূষায় পুরাতন বাটী চাপা পড়িয়া মরিয়া

যাইবে, সেই ভয়ে দয়া করিয়া আমার বাটীতে লইয়া গেলাম। আজ প্রায় আড়াই বৎসর ধরিয়া নিজব্যয়ে খাওয়াইলাম, পরাইলাম, সেবা-শুশ্রূষা করিলাম। তুমি আমার বন্ধু, তোমাকে বলিয়া তাহার ভাড়া আদায় উসুল করাইলাম। এতদিন তাহার কন্যা ও দৌহিত্রেরা একবারটিও উকি মারিল না; আর যেই তার চিতাভস্ম পুণ্যসলিলা-গঙ্গা-জলে মিলিত হইল অমনি এই মিথ্যা দাবী করিয়া নালিশ রুজু। ইহা কি ধর্ম্মে সহিবে? আমি এ মোকর্দ্দমায় লড়িব না, ধর্ম্ম থাকেন বিনা লড়ায়ে আমি এই মোকর্দ্দমা জিতিব। সমস্ত জগতকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে, উমাসুন্দরীর কন্যা ও দৌহিত্রেরা গত ত্রিশ মাস ধরিয়া তাহার কোন তত্ত্ব লয় নাই, আর আজ যেই সে চলিয়া গিয়াছে, যেই তাহার খাওয়া-পরার দেখাশুনার ভার লইতে হইবে না বুঝিয়াছে, অমনি মিথ্যা দাবী, মিথ্যা মোকর্দ্দমা। কলিকাল, অধর্ম্মের রাজত্ব।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

হরেন্দ্রনাথ

হরেন্দ্রনাথ ঘোষের জন্মস্থান বরিশালে। অতি শৈশবে মাতাপিতা মারা যান। তাহার পর রামনারায়ণপুরে তাঁহার এক দূর আত্মীয়ের বাটীতে হরেন বাস করিতেন। বহুদিন সেখানে ছিলেন; চারটি চারটি খাইতেন আর সেই আত্মীয়ের ফায়ফরমাইস খাটিতেন।

রামনারায়ণপুরে বসবাসকালে হরেন ভোলানাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হরেনের এমন কয়েকটি গুণ ও দোষ ছিল যাহাতে ভোলানাথ বুঝিয়াছিলেন, তাহাকে হাতে রাখিতে পারিলে সে তাহার অনেক উপকারে লাগিবে। সেই জন্য ভোলানাথ তাহার খোজ খবর লইতেন; আর সময় অসময়ে তাহাকে টাকাটা সিকিটা দিয়া হাতে রাখিয়াছিলেন।

আজ প্রায় তিন বৎসর হইল, হরেনের আত্মীয়টি মারা গিয়াছে। ভোলানাথ যখন তাহার পিতার পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের জন্য কলিকাতায় আসেন, সেই সময়ে তিনি রামনারায়ণপুরে যাইয়া হরেনের রক্ষক ও আত্মীয় বিয়োগের কথা জানিতে পারেন। আরও জানিতে পারেন যে, তাহার আত্মীয়ের পুত্র, হরেনকে আর খাওয়াইতে পরাইতে রাজি নন। তখন উমাসুন্দরীর বিষয়ের উপর ভোলানাথের নজর পড়িয়াছিল, আর তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে গেলে হরেনের ন্যায় তিন কুলে

কেহ নাই, বোকা, হাঁদা, অভাবগ্রস্ত বে-পরোয়া একটি লোকের প্রয়োজন।

এই সিদ্ধান্ত করিয়াই ভোলানাথ মাভৈঃ মাভৈঃ রব উচ্চারণ করিলেন। বলিলেন, হরেন্, তুমি আমার বাল্যবন্ধু, দুইজনে বাল্যকাল হইতে এক স্থানে খেলা-ধূলা করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছি। এখন হঠাৎ তোমার অভাব, ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমি এখন তোমাকে সাহায্য করিতে পারি। এরূপ অবস্থায় তুমি জান, আমি কি স্থির করিয়াছি? আমি স্থির করিয়াছি, আমরা দুজনে এক বৃন্তের দুটি ফুল একত্রে মিলিয়া সৌরভ বিলাইব। আমার আত্মনাথ নরনাথও যেমন ভ্রাতা, তুমিও আমার তেমনি আর একটি ভ্রাতা। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাকে ভ্রাতার ন্যায় রাখিব, আর তুমি শপথ কর, তুমি প্রাণপণে আমার উপকার করিবে।

হরেনের যেরকম অবস্থা তাহাতে সে একটি আশ্রয় খুঁজিতেছিল। আরোহীলতার মত তাহার আকর্ষী সব তখন উচ্চগামী, খুঁজিতেছিল কোন বৃক্ষকে আশ্রয় করিবে। ভোলানাথের আশ্বাস পাইয়া সে সপ্তম স্বর্গ হাতে পাইল। সে ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, সারা জীবন ভোলানাথের উপকারে আসিতে চেষ্টা করিবে। সেই অবধি ভোলানাথ তাহার আহার ও বাসের ভার লইয়াছেন, আর হরেনও নিজেকে তাহার কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছে।

হরেন ধর্ম্মভীরু। ধর্ম্মের উপর তাহার বিশেষ আস্থা। যাহাতে অধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে এমন কাজে তাহার বিশেষ ভয়। সে উপকারীর প্রত্যুপকারে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে রাজি, কিন্তু এক বিন্দু অধর্ম্ম করিতে রাজি নয়। পৃথিবীতে অনেক হরেন আছে; তবে আক্ষেপের বিষয় যে, সাধারণ লোকে হরেনকে বোঝে না। মনে করে পয়সার জন্য হরেন সব করিতে রাজি; ইহা সম্পূর্ণ ভুল। হরেনের

কোমল প্রাণ, সরল মন অল্পেই গলিয়া যায়। যখনই দেখে একজন তাহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেছে বা তাহার এক কণাও উপকার করিতেছে, অমনি হরেনের প্রাণ মন আর্দ্র হয়, সে উপকারীর কাছে একেবারে আত্মসমর্পণ করে। তবে অধর্ম্মে রাজি নয়।

আজ তিন বৎসরকাল ভোলানাথ হরেনের খরচ পত্র যোগাইতেছেন। কলিকাতার খাওয়া খরচ, বাসা ভাড়া সবই ভোলানাথ যোগান। তবে তিনি যখন কলিকাতায় আসেন তখন হরেনের ঘরে বাস করেন।

হরেনের পিতা নাই, মাতা নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই, স্ত্রী নাই, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেহই নাই; আছে কেবল ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর ব্যাধি-মন্দির শরীর। একবার এক কায়স্থ ললনার বিবাহের জন্য, কন্যার অর্থ-ক্লিষ্ট পিতা বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলেন, তাই হরেনের আশ্রয়দাতা দয়াপরবশ হইয়া সেই কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্যার্থে হরেনকে বিবাহ-বন্ধনে বন্দী করেন। তাহার দুই বৎসর পরেই সেই কায়স্থ-নন্দিনী পরগৃহবাসজনিত অনেক জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। দেহভার বহনে ক্লান্ত হওয়ায় তাহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন রুদ্ধ হয়; আর সেই সঙ্গে তিনি হরেনের স্কন্ধ হইতে নিজের ভারের বোঝাটি নামাইয়া তাহাকে মুক্তি দেন। সেই অবধি হরেন উন্মুক্ত আকাশের চাতক পক্ষী হইয়া নির্ব্বিবাদে বিচরণ করিতে লাগিল।

হরেন বেশ রসিক পুরুষ, দুটো গালি দিতেও পারে, আর দুটো গালি খেতেও পারে। ভোলানাথ বলিলেন, দেখ হরেন ভায়া, আমার শালারা সব ছুঁচো। শালারা নিজের কর্ত্তব্য করিল না, আবার এখন বুড়ীর টাকার জন্য মিথ্যা নালিশ করিয়াছে। শালারা কিছু কর্‌তে পারবে না, তবে ছুঁচোর ন্যায় দিনকতক ছুঁ ছুঁ করবে। তোমাকেও একটু বেগ দিবে।

হরেন। (সবিস্ময়ে) সে কি ভোলানাথবাবু, আপনার শালারা ছুঁচোই হউক, বেল্লীই হউক আর পাজিই হউক, আপনার সঙ্গে ঠাট্টাবট্‌কেরা করতে পারে, তা—আমাকে বেগ দিবে কি?

ভোলানাথ। কি জান ভায়া, পাজিদের পেজোমোর ত আর অন্ত নাই। তুমি উমাসুন্দরীর দুইটী বাটী বন্দক দিয়াছ সেই লইয়া—

হরেন। কেন, সে ত, তুমি রেজেষ্ট্রি আমমোক্তারনামা আমার নামে দিয়াছ, তাহারই বলে; আর আমি ত যত টাকা পাইয়াছি, সব তোমাকে দিয়াছি, একটি পয়সাও ত রাখি নাই। প্রত্যেকবার কলিকাতা হইতে বিন্ধ্যাচলে গিয়া টাকা দিয়া আসিয়াছি। টাকার পরিমাণ অধিক বলিয়া তুমি রেজেষ্ট্রি চিঠি বা মনি-অর্ডার-যোগে পাঠাইতে নিষেধ করিয়াছিলে, তাই নিজে গিয়া তোমার হাতে দিয়া আসিয়াছি।

ভোলানাথ। আর তুমিও ত জান, তুমি টাকা দিবার পরেই আমি কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে টাকা দিয়া আসিয়া তোমাকে বলিয়াছি, কর্ত্রী-ঠাকুরাণী টাকা পাইয়া খুব খুসী, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

হরেন। তা বটে, তুমি সেই কথা ত বরাবরই বল্‌তে।

ভোলানাথ। আর তুমি ত জান সেবার এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকিল শুকপ্রসাদ বিন্ধ্যাচলে আসিয়া কর্ত্রীর কাছ হইতে সমস্ত টাকা প্রাপ্তিস্বীকার রসিদ লিখাইয়া লইলেন। তুমিও ত তাতে সাক্ষী। লেখার কড়ি কি বাঘে খায়? কখনই নয়, কখনই নয়।

হরেন। হাঁ, তা ত তুমি ব'ল্‌লে। উকিল শুকপ্রসাদকে বল্‌লে, কর্ত্রী ঠাকুরাণী ঢেরা সহি দিয়াছেন। যখন শুকপ্রসাদ বলিলেন, তা মশায়, কর্ত্রী আমার সামনে ত সহি করেন নাই, তখন তুমি বেশ রেগে উঠ্‌লে। বললে, 'মহাশয়, আপনি কি বলতে চান্, নগদ একশ টাকা ফি দিয়া এলাহাবাদ হইতে আপনাকে বিন্ধ্যাচলে আনিলাম জাল কর্‌তে?

দেখুন, এই আপনার ফির টাকা একশত ; হয় সহি করুন আর টাকা নিয়ে এলাহাবাদে ফিরে যান ; আর না হয় কেবল গাড়ী ভাড়া নিয়ে দেশে ফিরে যান।' তখন শুষ্কপ্রসাদ বল্লেন, 'তা না ভোলানাথ বাবু, তবে কি জানেন, নিয়ম এইরূপ। তা থাক, আপনি ভদ্রলোক, আপনি কি আর কিছু অন্যায় করিবেন ? তা নয়, তা নয়।' এই বলিয়া শুষ্কপ্রসাদ দলিল সহি করিয়া একশত টাকা ও রাহা খরচ লইয়া চলিয়া গেলেন।

ভোলানাথ। তবে কি জান হরেন, সকলে ত আর তোমার মত সাদাসিদে লোক নয়, এই দুঃখ। যাহা হউক, শালারা একটু তথ্‌লিফ দেবে ; তোমায়ও দেবে আমায়ও দেবে। সৎসঙ্গে কাশীবাস, তোমার কোন ভয় নাই।

হরেন। আমার আবার ভয়ই বা কি, আর ভরসাই বা কি। আমি চোর জুয়াচোরও নহি, চোর জুয়াচোরের আত্মীয়স্বজনও নহি। তোমার কাজ করেছি, তুমি একমুঠো খাইতে দিয়াছ। দেওয়ানীতে ডিক্রী করে, আমার শরীরের চাম্‌ড়া ক্রোক করা ছাড়া আর কিছু সম্বল নাই ; ফৌজদারীতে—জেল, তাতেই বা বিশেষ অসুবিধা কি ? তিনকুলে কেও কাঁদতেও নাই ককাতেও নাই। বাহিরেও ঘাস জল, ভিতরেও ঘাস জল ; তাতে আর বিশেষ ভয় কি ?

ভোলানাথ। না হরেন, তোমার কোন ভাবনা নাই। "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ"। আমরা ধর্ম্মপথে আছি, আমাদের জয়, শেষে হইবেই হইবে।

হরেন। আর না হয় জেল হইবেই হইবে।

ভোলানাথ। আরে না হে হরেন না, গোলযোগের ভয় কিছুই নাই।

হরেন। না ভয় থাকে খুব ভাল।

আর্জ্জির নকল বাহির করিয়া দেখিলেন যে নালিশের কারণ, আম

মোক্তারনামার বলে তাহারা ভজহরির ষ্টেটের টাকা আদায় করিয়া তাহার হিসাব না দিয়া ঐ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। ভোলানাথ তাহার উকিল কৌন্সিলের সহিত পরামর্শ করিয়া সাফ জবাব দিলেন যে, সত্য বটে আম মোক্তারনামার বলে তাহারা ভজহরির ষ্টেটের স্থাবর সম্পত্তি সকল দায়সংযুক্ত করিয়া ও লিজ্ দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু সে সমস্ত টাকাই উমাসুন্দরীকে দেওয়া হইয়াছে; তাহার স্বাক্ষরিত রসিদ আছে। যাহার সম্পত্তি সে বন্দক ও লিজ্ দিয়া টাকা লইয়াছে তাহাতে ভোলানাথের দায়িত্ব নাই।

উপযুক্ত উকিল নিযুক্ত করিয়া ও মামলার জবাব দিয়া ভোলানাথ বিন্ধ্যাচলে ফিরিয়া গেলেন; আর উকিলের বাটী যাতায়াতের ভার দিয়া গেলেন হরেনের উপর।

হরেনের পূর্ব্বের ন্যায় বাসা রহিল, খরচ চালান—ভোলানাথ। প্রত্যহই এগারটার সময় আহারাদি করিয়া হরেন উকিলবাটী যান, আর সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া আসেন; কাজটা কেমন একঘেয়ে। তবে যাঁহারা চক্ষুকর্ণ ব্যবহার করিতে জানেন, তাঁহারা এখানে অনেক রকমের জানোয়ার দেখিতে পান, আর অনেক রকমের তামাসাও পান; মুস্কিল কেবল মক্কেল খোদের, তাহাকে বিলের টাকা দিতে হয়। এখানে অপর সকলেই বেশ মজায় থাকেন, অনেক রকম চিজ্ দেখেন, আর অনেক বিষয় শোনেন, অন্যত্র কুত্রাপি তাহা দেখিতে বা শুনিতে পাইতেন না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

"ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নি"

মোকদ্দমার পাঁয়তারা করিতেই দুই বৎসর কাল কাটিয়া গেল তথনও লড়াই সুরু হইতে অনেক দেরী। এই সময় ভোলানাথের প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, তিনি নোবেল প্রাইজের জন্য বিলাত যাইবেন। এই জনরব প্রকাশের কিছু পরেই ভোলানাথ অর্দ্ধাঙ্গিনী ধূমাবতীর ও কন্যা সুষমার হস্তে বৃদ্ধ পিতাকে জিম্মা দিয়া ও উত্তমর্ণগণকে কাঁদাইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন।

কলিকাতা হইতে নারীসুন্দরী ও তাহার পুত্র চতুষ্টয়ের উকিলের লোক আদালতের নোটিস জারি করিতে গিয়া, সবিস্ময়ে শুনিলেন যে, ভোলানাথ পগার-পার। অন্দর হইতে দাসী আসিয়া খবর দিল, দাদাবাবু মারবেল খেলিতে বিলাত গিয়াছেন। উকিলের কর্ম্মচারী খুব হুঁসিয়ার লোক হইলেও, প্রথমে দাসীর কথার অর্থ একেবারেই বুঝিতে পারিল না; বরং হাসিয়া আকুল। বলিল, যদি মারবেলই খেলিতে হয় ত বিলাত কেন? বিন্ধ্যাচলে ত খেলিবার অনেক লোক ও স্থান আছে। ইহা লইয়া তাহারা হাস্য-কৌতুক করিতে লাগিল, এমন সময় ধূমাবতী বাহির হইয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, বাবু এখানে নাই, তিনি নোবেল প্রাইজের জন্য বিলাত গিয়াছেন, আসিতে ছয় মাস লাগিবে। শুনিয়া তাহারা একেবারে অবাক্। মনে মনে বলিল, খেলোয়াড় বটে,

এমন খেলোয়াড় বড় একটা শীঘ্র দেখা যায় না। তখন নোটিশ লইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল।

প্রায় এক বর্ষ কাল ভোলানাথ বিলাতে রহিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় স্ত্রী পুরুষের জন্য অনেকগুলি বহুরূপীর পোষাক লইয়া আসিলেন। যখন বিলাতে ছিলেন, তখন ধূমাবতীকে চিঠিতে জানাইয়াছিলেন, সেখানে বহুরূপী সাজিবার ভাল ভাল পোষাক পাওয়া যায়। তাহার উত্তরে ধূমাবতী লিখিয়াছিল যে, ঐ রকম এক ডজন পোষাক তিনি যেন আসিবার সময় কিনিয়া আনেন, ভবিষ্যতে ইহা অনেক কাজে লাগিবে। সেই কারণে ভোলানাথ দেশে আসিবার সময় এক ডজন নানা প্রকারের বহুরূপী সাজিবার পোষাক লইয়া আইসেন, ছয়টা তাহার মাপের আর ছয়টা ধূমাবতীর মাপের।

দেশে ফিরিয়া আসিবার পর এক বৎসর ধরিয়া মোকদ্দমা চলিল। মুলতুবি যত রকমে হইতে পারে, তাহা ভোলানাথ লইলেন। ভোলানাথের প্রধান চেষ্টা, পাঁয়তারায় কার্য্য ফতে করা। কিন্তু নারীসুন্দরীও ছাড়িবার পাত্রী নয়। অবশেষে উকিলের টাকার তাগাদায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভোলানাথ রণে ভঙ্গ দিলেন। তাহার নামে একতরফা ডিক্রী হইয়া গেল। ডিক্রীর পর তিনি একবার ছানির দরখাস্ত করিলেন। একটি দিন মোকরার হইল, আবার তিনি সেইদিন অনুপস্থিত, তখন ছানির দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়া গেল।

পাঠকগণ তাহার এইরূপ আচরণের কারণ যদি জানিতে চান্, তাহা হইলে ভোলানাথ ও ধূমাবতীর নিম্নলিখিত বাক্যালাপ হইতে বুঝিতে পারিবেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার ছয় মাস পরে কথোপকথন হয়।

ধূমাবতী। তাই ত, এ মাম্‌লা এ রকম ক'রে কতদিন চলবে? এ যে শেষ হবার নাম নেই।

ভোলানাথ। ধূম, তুমি কি সব ভুলে গেলে? তোমার মাতা মোকর্দ্দমা রুজু করিবার কয় দিন পরে, আমরা দুজনে বসিয়া তিন চারি রাত্রি পরামর্শের পর এই স্থির করিয়াছিলাম যে, যতদিন সম্ভব এই মামলা টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে। শাশুড়ী বিধবা, শালাগুলো মূর্খ, আর ছেলে মানুষ, নগদ টাকাকড়ি বেশী কিছু হাতে নাই, মায়ে পোয়ে পরস্পরের ভালবাসার টান বেশী নাই। অষ্ট-বজ্র এক হইয়াছে, বিষয়ের আশায়। যত দিন যাইবে, ততই তাহাদের একতার বন্ধন শিথিল হইবে। শালারা নিজের গাঁইট হইতে কেহ এক পয়সাও খরচ করিবে না। বিষয় বন্দক দিয়া যত দিন চলে। সে ত আর চিরকাল চলিবে না, কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতে কয় দিন চলিবে? আর পরস্পরের ভালবাসার টান নেই, মনের মিল নাই, বিষয়ের আশায় আশায় কত দিন এক থাকিবে? আশা থামিয়া গেলে মন নিশ্চয়ই খারাপ হইবে। সেইজন্যই ত এত দেরী করা।

ধূমাবতী। তোমায় আমার ভয় হয়; তুমি ত মোকর্দ্দমার বিশেষ তদ্‌বির করিতেছ না, খালি তদ্‌বির করিতেছ মুলতুবির। ভয় হয় পাছে শেষে মোকর্দ্দমার ফল খারাপ হয়।

ভোলানাথ। এই জন্যই লোকে বলে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"—গণেশজীরও ভুল হয়। আমরা ত পূর্ব্বেই ঠিক করিয়াছি, মোকর্দ্দমার জন্য লড়াইয়ের প্রয়োজন একেবারেই নাই। প্রয়োজন কেবল তোমার মাকে ও ভাইদিগকে এই মোকর্দ্দমায় আটকাইয়া রাখা, আর তাহাদের মধ্যে গৃহ-বিবাদ ঘটান; তাহাদের মধ্য হইতেই একজন বিভীষণ বার করা। অমন সোনার লঙ্কা ছারখার হ'য়েছিল একজন বিভীষণে, আর তোমার বাঁদর ভাইগুলোর মধ্যে একটা বিভীষণ বার ক'রে তাহাদের পোড়ামুখ আবার পোড়াতে পারিব না?

ধূমাবতী। আমার ভাইগুলো যে বাঁদর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তা না'হলে তাদের দিদিমা তাদের হাতছাড়া হইবে কেন? তাহারা একটু যত্ন আয়ত্তি করলে বুড়ী কি খাঁচা ছাড়া হইত, না তোমার হাতে আসিয়া পড়িত? আমার মাও তেমন হুঁসিয়ার নয়, তা নহিলে তাঁহার নিজের মা কি তাঁহার হাতছাড়া হয়?

ভোলানাথ। দেখ, সত্য কথা বল্‌তে গেলে, তুমি সেই গোবর বনে পদ্মফুল। তোমার বাবা খুব হুঁসিয়ার লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই। আর সেইজন্যে যত দিন তিনি বাঁচিয়া ছিলেন, তত দিন আমরা নরনাথের সহিত তোমার ভগ্নীর বিবাহে রাজি হই নাই। তোমার পিতার মৃত্যুর পর ভাবিলাম, মাথা যখন কাটা গিয়াছে, তখন আর ধড়ে কি করিবে। তোমার ভাইগুলি আফ্রিকার পিনাল সেটেল্‌মেণ্টের পয়দা, সে স্থান-মাহাত্ম্য যাবে কোথায়?

ধূমাবতী। স্থান-মাহাত্ম্যের কথা বোলো না, আমিও ত সেথায় জন্মেছিলাম।

ভোলানাথ। তোমার কথা ছাড়িয়া দাও, তোমার তুলনা তুমি নিজেই। স্বাতিনক্ষত্র ত তার পাঁচটা দশটা হয় না, সে একা। যেখানে উদয় হয় সেই স্থানকেই পবিত্র করে, আর তাহার জলে মুক্তাবর্ষণ হয়।

ধূমাবতী। কে বলে, আমার হৃদয়সম্রাট্ কেবল কর্ম্মবীর, বাক্‌পটু নয়? তা কি জান ভাই, আমার ভয় তুমি একা কত দিকে সামলাইবে? আর আমাদের শত্রুও ত কম নয়। শুধু পারে না বলে, ফোঁস করে না। সুবিধা পেলেই ছোবলাইবে। দেখা যাক্, ভগবান্ যা করেন।

ভোলানাথ। এ সব কার্য্যে ভগবানের নাম না নিলেই ভাল। আমি এ সব সাংসারিক কার্য্যে ভগবানকে টেনে আনতে নারাজ।

ধূমাবতী। ডাকাতদের কি ডাকাতে-কালী নাই।

ভোলানাথ। ডাকাতে-কালী কি ভগবান্? না তুমি আমি ডাকাতি করছি? যাহাদের প্রাপ্য সম্পত্তি, তাহারা যদি তাচ্ছিল্য কোরে ফেলিয়া দেয়, তাহারা যদি অলসতা স্বল্পবুদ্ধি হেতু তাহা সংগ্রহ না করে, তবে সে অলসতা স্বল্পবুদ্ধি তাচ্ছিলাকারীদের পরবর্ত্তী ব্যক্তি সেই সম্পত্তি পাইলে লইবে না কেন? যদি না লয় তবে তাহারা বোকা, সুযোগের ব্যবহার জানে না। আমরা সুযোগের ব্যবহার জানি, তাই সেই তাচ্ছিল্য পরিত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছি, মানুষোচিত কার্য্য করিয়াছি। সেই সম্পত্তি আমাদের হাতে পড়িয়া পৃথিবীর অনেক উপকারে লাগিবে।

ধূমাবতী। সমস্তই ঠিক কথা। সেই সম্পত্তি সর্ব্বপ্রথমে রাহুরামের কার্য্যে লাগিবে। আমার প্রধান ভয়, তুমি একা, আর আমার ভায়েরা চারিজন, তুমি কত যুঝিবে? এক, শূন্যের পরেই; কথায় বলে 'একা না ভেকা'। এক শূন্যের চেয়ে ভাল কিন্তু দুই, তিন, চারি শূন্য এক দুই তিনের চেয়ে বেশী নয়।

ভোলানাথ। তুমি হিসাবে একটি ভুল করেছ। আমি শূন্য হইলেও তুমি এক, তোমার পার্শ্বে বসিয়াছি আমার মূল্য এখন দশ, একশ, হাজার; কারণ তুমি এক থাকিতে তাহার পরে গোটা কতক শূন্য দিলেই দাম ক্রমেই অনেক বাড়িয়া যাইবে।

ধূমাবতী। তা ও সব কথা যাঁক। আদত কথাটা—যদি ডিক্রী হয়?

ভোলানাথ। তাতে ক্ষতি কি? লইবে কি? তুমি স্ত্রীলোক। আমার নামে এক পয়সারও সম্পত্তি নাই। পিতাঠাকুরের সম্পত্তি আমি এক কপর্দ্দকও লই নাই, সে সমস্তই রাহুরামের। একটা কেন দশটা ডিক্রী করুক না, সে কাগজের ডিক্রী কাগজেই থাকিবে। আমার লইবে কি?

ধূমাবতী। কেন জেল দিতে পারে।

ভোলানাথ। ক্ষেপি, ইংরাজের রাজত্বে টাকার ডিক্রীতে জেল হয় না বলিলেও চলে, যে একটু বুদ্ধিমান্ তাহার ত একেবারেই হয় না।

ধূমাবতী। কেন?

ভোলানাথ। পাগলি, দেউলিয়া-আদালত আছে সে টাকা ফাঁকি দিবার সুন্দর কল। ইংরাজের আইনে ডিক্রীর টাকা দিতে অপারগ হইলে, "তুমি কেন জেল যাবে না, তাহার কারণ দর্শাইয়া দাও" আর সেই নোটিস পাইলে দেউলিয়া-আদালতের আশ্রয় লও, বল—আমার কিছু নাই, আমি কোথা হ'তে দেব, আর আমি ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করি নাই, ঘটনাচক্রে লোকসান হইয়া গিয়াছে বা ঘটনাচক্রে আমি টাকার দায়ী হইয়াছি। ব্যস্ তা, হইলেই কার্য্য সাফ, আর তোমারও রেহাই।

ধূমাবতী। তা এ ত বেশ মজার কল। তবে সব লোকে খুব বেশী করিয়া টাকা ধার করিয়া এইরূপ করে না কেন?

ভোলানাথ। অসুবিধা এই যে—টাকা বা জিনিস অধিক পরিমাণে ধারে না পাওয়া। যাহার নিজের নামে সম্পত্তি নাই, তাহাকে মহাজনে বেশী টাকা ধার দিতে চায় না; এমন কি অর্দ্ধাঙ্গিনীর নামে সম্পত্তি থাকিলেও ফল তাহাই; যাহারা পরের টাকা লইয়া ফাঁকি দিতে চায়, তাহাদের প্রধান সহায় তোমরা আর দেবতারা।

ধূমাবতী। আমরা আর দেবতারা কি রকম?

ভোলানাথ। এটা আর বুঝলে না? স্ত্রীর নামে সম্পত্তি থাকিলে তাহা স্ত্রীধন হইল, স্বামীর তাতে অধিকার নাই, আর স্বামীর মহাজনদের ত নাই-ই। খালি ব'লে যাও স্ত্রীর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, মেসো, পিসে, যে হউক একজন দিয়াছে। এই সকল কার্য্যে স্ত্রীর বড়লোক আত্মীয়েরা বেশ কাজে লাগে, তাহা পয়সা দিক্ বা নাই দিক্।

আর হিন্দুর দেবতারাও মানুষের চেয়ে বেশী উপকারে আইসে। তোমার সমস্ত সম্পত্তি দেবতার নামে রাখিয়া দাও, মহাজনের পো'কে টাকা আদায় করিতে বেশ বেগ পেতে হইবে। অনেক সময়ে একেবারেই পারিবে না।

ধূমাবতী। তা এ সব ত খুব ভাল আইন।

ভোলানাথ। হাঁ, তা তোমার আমার পক্ষে; মহাজনের পক্ষে নয়, ডিক্রীদারের পক্ষে নয়।

ধূমাবতী। তা যাক্ সে পরের কথা, আমাদের ভাবিবার দরকার নাই। স্বয়ং সরকার বাহাদুর যখন সে বিষয় ভাবেন নাই, তখন আমাদের তা নিয়ে মাথাব্যথার কি দরকার? যাক্ তা হলে, ডিক্রী করুক, কি ক'রে জারি করে দেখা যাবে। ভগবান্ একটা না একটা উপায় ক'রে দিবেন।

ভোলানাথ। সরকার বাহাদুর আইন ঠিক করিয়াছেন, তবে তেমনি তেমনি মানুষে গুছাইয়া নিজেদের সুবিধা করিয়া লয়। ডিক্রী হ'লে পরে তোমার গুণবতী মাতা ও তোমার বাহাদুর ভ্রাতারা ডিক্রীর কাগজ রোজ ধুইয়া ধুইয়া বিপ্রপাদোদক লেহন করিবে, আর মাথায় হাত বুলাইবে।

ধূমাবতী। তুমি তাহাদের মাথায় আগে হাত বুলাইয়াছ, এখন তাহারা নিজের মাথায় হাত না বুলাইয়া কি করে বল। দেখ, আমি ভাব্ছি কি, মা'ত পরে আমাদের দিকে আস্তে পারে।

ভোলানাথ। তাও কি সম্ভব?

ধূমাবতী। মা ধূমপ্রভাকে বড় ভালবাসে।

ভোলানাথ। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় মরে। প্রথমে ডিক্রী পাক্, তার পর জারি করিবার বন্দোবস্ত করুক। তখন দেখা যাবে, কি করা কর্ত্তব্য আর কোন পন্থা ধর্ত্তব্য।

ইহার কয়েক মাস পরে নারীসুন্দরীর নালিশে ভোলানাথের বিরুদ্ধে একলক্ষ টাকা, মায় খরচা, ডিক্রীর হুকুম হইল।

খবর পাইয়া রাধানাথ একটু উতলা হইলেন। ভোলানাথ ও ধূমাবতী অচল ও অটল ; হাইকোর্টের জজের এ হুকুমটা যেন কিছুই নয়, এরূপভাবে চলিতে লাগিলেন। আর মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি, ডিক্রী ত পেলে, নেবে কি ?"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আদ্যনাথ

"সুখ ধনে নয়, সুখ মনে"

যাহার কেহ নাই তাহার ভগবান্ আছেন। আদ্যনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা পরম শত্রু, তবে প্রকাশ্যে শত্রু হইলে তত ক্ষতি ছিল না। বন্ধুর ভান করিয়া শত্রু, সে অতীব ভয়ঙ্কর। আদ্যনাথ জানিত, তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পরম ধার্ম্মিক, কর্ত্তব্যপরায়ণ, পিতৃবৎসল, মাতৃসেবী, ভ্রাতৃগতপ্রাণ—কর্ত্তব্যের জন্য জীবনভার বহন করিতেছেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রকাশ্যে তাহার সহোদর, পরোক্ষে তাহার ঘোর শত্রু।

পিতা পত্নীবিয়োগে শোকাতুর; মনের বল একেবারেই নাই, শরীরের বলও কম; জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী ধূমাবতীর হাতে কলের পুতুল। তিনি নিজের চক্ষে কিছু দেখেন না, নিজের কর্ণে কিছু শুনেন না। তিনি গ্রামোফোনের মেসিন—ভোলানাথ ও ধূমাবতী মেসিনে যে রেকর্ড চড়াইয়া দেন, রাধানাথ সেই গান গাহেন।

আদ্যনাথের মাতা জীবিতা নাই। যখন ছিলেন তখনও ভোলানাথের প্ররোচনায় আদ্যনাথের জন্য তিনি বিশেষ মাথা ঘামান নাই। তাহার শ্বশুরশাশুড়ী ধর্ম্মভীরু, মধ্যবিত্ত ভদ্রপরিবারভুক্ত। তাঁহারা কন্যা ও জামাতার সাংসারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। তাঁহারা ভাবিলেন, রাধানাথবাবু জীবিত, তখন তাহাদের সাংসারিক বিষয়ে আমাদের কথা কহা অকর্ত্তব্য।

তাহার গৃহিণী ধৃতি, নামেও ধৃতি, কাজেও ধৃতি ; সদা আনন্দময়ী, সদা সন্তোষময়ী, ধর্ম্মশীলা, দয়াবতী, দেবদ্বিজে ভক্তিমতী, নরনারায়ণে সেবারতা ও পরদুঃখকাতরা। স্বামী, পুত্র ও কন্যা লইয়া সে বেশ মনের আনন্দে বনে বাস করিতেছে। তাহার স্নেহে, যত্নে ও সেবায় তাহার স্বামীও সদাই সন্তোষময়। তাহার অভাব অল্প, দুঃখকষ্টও অল্প ; হিংসা, দ্বেষ, পরছিদ্রান্বেষণ তাহার কাছে আসিতে পারে না। সে সদাই সন্তুষ্ট, সদাই সহাস্যবদন, সর্ব্বমনোরঞ্জক, সর্ব্বসুখদায়ক। যাহা কিছুর অভাব, একা ধৃতি সে সমস্ত পূরণ করে। ধৃতি স্নেহে মাতা, মনোরঞ্জনে পত্নী, যত্নে ভগ্নী, আর সেবায় দাসী। পুত্র-কন্যাও তাহার নয়নানন্দ ও হৃদয়ানন্দ। তিনি এই বনবাসে প্রিয়তমা পত্নী ধৃতিকে লইয়া ও প্রাণপ্রতিম পুত্র-কন্যাকে পাইয়া পরমানন্দে জীবনযাপন করিতেছেন। সুখ ঐশ্বর্য্যের আতিশয্যে নয়, অভাবের স্বল্পতায় ; সুখ, আকাঙ্ক্ষার অপরিতৃপ্তিতে নয়, মনের সন্তোষে।

প্রথম পাঁচ বৎসর আত্মনাথ শিলিগুড়িতে চাবাগানে চাকরী করিলেন। তাঁহার সদ্‌গুণে ও কর্ম্মদক্ষতায় সকলেই মোহিত। তাহার মালিকগণ সন্তুষ্ট হইয়া এই তিন বৎসরের মধ্যেই তাঁহার যথেষ্ট পদোন্নতি করিয়া দিলেন ; ক্রমে তাঁহারই কিছু কিছু কমিশনেরও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ফলে, বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। আর মনস্তুষ্টি হেতু তিনিও উৎসাহিত হইয়া নবীন উদ্যমে আরও সুন্দররূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

সেখানে তিনি রন্ধনশালার উপযোগী একখানি সুন্দর বাগান করিলেন। তাহাতে রন্ধনশালার নিত্য প্রয়োজনীয় তরিতরকারী প্রচুর পরিমাণে ফলিতে লাগিল। একটি মাত্র মালী লইয়া আত্মনাথ ও ধৃতি এই বাগানের সমস্ত কার্য্য করিতেন ও দেখিতেন। তাঁহাদের

পরিশ্রমের ও যত্নের ফলে ফসলও প্রচুর হইতে লাগিল, কোন তরিতরকারী বাজার হইতে কিনিতে হইত না। তাঁহারা বাগানের একটি কোণে দুটি গাভী রাখিয়াছিলেন। ধৃতি মালীর সাহায্যে নিজেই তাহাদের সেবা করিতেন। তরীতরকারীর ত্যক্ত পাতা, ডাঁটা, খোসা ও মনুষ্যের আহারের অনুপযোগী কিন্তু পশুর আহারের বিশেষ উপযোগী অন্যান্য দ্রব্য সমুদায় নিজহস্তে গাভী দুইটিকে খাওয়াইতেন। ভাতের ফেন এক মৃন্ময়পাত্রে ঢালিয়া রাখিতেন, আর তাহা গাভী দুটিকে খাওয়াইতেন। ফলে নিজেদের পরিশ্রমে ও চেষ্টায়, যত্নে ও স্বল্পব্যয়ে তাঁহারা উৎকৃষ্ট তরি-তরকারী খাইতেন ; আর তাহারই বাছগুলি গাভী দুটিকে খাওয়াইয়া অতি সুমিষ্ট দুগ্ধ পাইতেন ; আর তাহা হইতে ক্ষীর, সর, নবনী, ঘৃত ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া রসনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিসাধন ও শরীরের পুষ্টিবর্দ্ধন করিতেন।

আদ্যনাথ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী প্রতি বৎসর বর্ষার পূর্ব্বে ও পরে নিজেদের আবাসস্থানের চতুর্দ্দিক ও নিকটস্থ স্থানগুলি সম্যক্‌রূপে পরিষ্কার করাইয়া রাখিতেন। জল-নিকাশের পথের প্রতি তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বর্ষার সময় পানীয় জল গরম করিয়া তাহার পর শীতল করিয়া তাহা পান করিতেন।

আদ্যনাথ ও তাঁহার পত্নী ধৃতি, জামা, সেমিজ, জ্যাকেট, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদির ছাট্‌কাট্‌ শিখিয়াছিলেন ; আর একটি সিংগার সোইয়িং মেসিনের সাহায্যে নিজেদের ও ছেলে মেয়েদের জামা, সেমিজ, জ্যাকেট, বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর ইত্যাদি সেলাই করিতেন ; তাহার দরুণ দরজীকে পয়সা দিতে হইত না ; আর কাপড়ের অংশও দিতে হইত না। স্ত্রী পুরুষ দুইজনে প্রত্যহ ভোর পাঁচটায় শয্যা ত্যাগ করিতেন, আর সারাদিন আনন্দের সহিত পরিশ্রম করিয়া সায়ংকালে অবসর পাইতেন। সন্ধ্যার পর সকলে একত্র মিলিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন। একটি

হারমোনিয়াম সাহায্যে ধৃতি গান করিতেন। আত্মনাথ এস্‌রাজ বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার গলাও মন্দ নয়, তিনিও এস্‌রাজ লইয়া স্ত্রীর সহিত গানে যোগ দিতেন এবং পুত্রকন্যাকে গান করিতে উৎসাহিত করিতেন। নিজেদের যত্নে, চেষ্টায়, পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়ে তাঁহারা তাঁহাদের সকল অভাব দূর করিয়াছিলেন এবং জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়া পরম সুখে ও অতীব সন্তোষে জীবনযাপন করিতেছিলেন।

পাঁচ বৎসর পরে আসামপ্রদেশে একটি নূতন চা কোম্পানি খোলা হয়। সেই সময়ে আত্মনাথকে সেই নূতন কোম্পানির ম্যানেজার করা হইল। তিনি অতি সুন্দরভাবে ম্যানেজারের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কোম্পানির কাজ বিশেষ ভালরূপেই চলিতে লাগিল, লাভও বেশ হইতে লাগিল।

ধৃতি ও আত্মনাথ গরীব গৃহস্থের ও কুলীগণের মা-বাপ। তাঁহারা প্রাণপণে তাহাদের শুভানুধ্যায়ে রত, যথাশক্তি তাহাদের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত। সকলেই তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল। কোম্পানির কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই তাঁহারা নরনারায়ণের কার্য্যে, দশের ও দেশের কার্য্যে প্রবৃত্ত। যেথায় লোক রোগশয্যায় শায়িত, সেথায় আত্মনাথ ও ধৃতি। যেখানে চিকিৎসকের ও পথ্যের অভাব, সেখানে তাঁহারা দুইজন সেই অভাব-মোচনে ব্যস্ত। যেখানে মানুষে মানুষে কলহ ও মনোমালিন্য, তাঁহারা সেইখানে উপস্থিত ও পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপনে ব্যস্ত। কলহ, হিংসা ও দ্বেষ তাঁহাদিগকে দেখিলে ভয়ে দূরে পলাইয়া যাইত। তাঁহারা যেখানে যান, সেখানে বিদ্বেষভাব থাকে না, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হয়; সে স্থানে আনন্দের উৎস ছোটে, সুখের নদী বহিয়া যায়।

নূতন কোম্পানির ম্যানেজার হওয়া অবধি তাঁহাদের বাগান বাগিচা

লোকজন দাসদাসী আসবাব-পত্র সকলই বাড়িয়াছে। তাহা কেবল তাঁহাদের নিজের ভোগের জন্য নয়; গরীব, দুঃখী, অনাথ, অনাথাদের উপকারের জন্য। তাঁহারা যেখানে থাকেন, তাহাকে কেন্দ্র ধরিয়া দুই মাইলের মধ্যে কেহ কোন দিন অভুক্ত থাকে না, কেহ চিকিৎসা বা পথ্যের অভাবে মরে না। তাহারা সকল লোককেই পুত্র কন্যা নির্ব্বিশেষে দেখেন ও ব্যবহার করেন। সকলেই তাঁহাদের দয়া দাক্ষিণ্যে ও ভালবাসায় সুখী, তাঁহারা দুজনেও এই সকল লোককে সুখে রাখিয়াই সুখী। তাঁহারা যেখানে ও যে অবস্থায় থাকুন না কেন, কখনও নিজের ভাগ্যদেবতাকে দোষারোপ করেন নাই; আর মন্দ ভাগ্যকে সৌভাগ্যশালী করিতে প্রাণপণে কার্য্য করিয়াছেন; এবং অবশেষে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। আসাম ভ্যালিতে তাঁহাদের বাসগৃহ, বঙ্গের বাহিরে এক পীঠস্থান হইয়াছিল। বঙ্গনরনারী এ অঞ্চলে আসিলে দুদিনের তরেও তাঁহাদের অতিথি হইতে হইত; আর তাঁহারাও অতিথি সৎকার করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন।

একদিন আন্তনাথ ও ধৃতি সন্ধ্যার পরে তাঁহাদের বাগানবাটীতে বসিয়া এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন।

ধৃতি। চল, আমরা একবার শ্বশুরমহাশয়কে দেখিয়া আসি; কতদিন সেখানে যাই নাই। একবার শ্বশুর ও ভাসুর মহাশয়কে দেখিয়া আসা উচিত।

আন্তনাথ। তা সত্য। তবে কি জান, আমার দাদা ইহা একেবারেই পছন্দ করেন না। তিনি বলেন "তোমাদের এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই। পার ত বাবাকে খরচ পাঠাইয়া দিও; তাহাতে পিতাঠাকুরের কাজে লাগিবে; কতকগুলি টাকা রেল কোম্পানিকে খাওয়াইয়া লৌকিকতা করিয়া দেখিতে আসিবার প্রয়োজন নাই। আমি ত এখানে আছি।

পিতাঠাকুরের কোন অসুবিধা হয়, আর আমি যদি তাঁহার সেবায় অপারগ হই, তখন তোমায় লিখিয়া পাঠাইব তুমি আসিয়া সেবা করিও।"

ধৃতি। ভাসুর মহাশয় যা বলেন তা সত্য। কিন্তু আপনার জনকে দেখিবার জন্য ত প্রাণে কতকটা আবেগ হয়; অল্প দিনের জন্য তাঁদের কাছে থাকিতে ও তাঁহাদের চরণ সেবা করিতেও ত বিশেষ ইচ্ছা হয়।

আগুনাথ। আচ্ছা, দাদাকে একখানা চিঠি লিখি। দেখা যাক্, তিনি কি বলেন। তিনি যদি রাজি হন, তখন সেখানে যাওয়া যাইবে।

কিছুদিন পরে আগুনাথ ও ধৃতি পুত্র-কন্যা-সমভিব্যাহারে বিন্ধ্যাচল ধামে যাত্রা করিলেন। সেখানে পিতৃচরণে প্রণত হইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া ও তাঁহাদের পুত্রকন্যাদিগকে দেখিয়া মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বিন্ধ্যাচলে আসিয়া পিতৃচরণ ও জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার, ভ্রাতৃজায়ার চরণ-বন্দন করিয়া যেরূপ উল্লসিত হইলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া সে পরিমাণে উল্লসিত হইলেন না। তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহারা যেন একটু সঙ্কুচিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। আদ্যনাথ ও ধৃতি যেখানে যান, সকলেই তাঁহাদিগকে দেখিয়া উল্লসিত হয়। তাঁহারা দেখিলেন, পিতাও তাঁহাদিগকে তেমন আন্তরিক আদর সম্ভাষণ করিলেন না; বরং ভোলানাথ ও ধূমাবতীর তফাৎ তফাৎ ব্যবহারের অনুকরণ করিতেছেন। এরূপ ব্যবহারে তাহারা অভ্যস্ত নন; স্ত্রী পুরুষ উভয়ে একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন।

এইরূপ ব্যবহারের কোন নিগূঢ় কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া চার পাঁচদিন পরেই দুঃখিত মনে নিজাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে একবার নির্জ্জনে পিতাঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন

না ; হয় ভ্রাতা, না হয় ভ্রাতৃজায়া, না হয় ভ্রাতৃকন্যা—একজন না একজন পিতার নিকটে থাকে। পিতাকে একাকী পাইলেন না, পিতার মনোভাবও জানিতে পারিলেন না। পাছে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিছু মনে করেন এই ভয়ে স্পষ্ট কিছু বলিতেও পারিলেন না। এরূপ অবস্থায় মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া বিদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রহস্য অভেদ্য রহিয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নরনাথ

নরনাথের এখন বয়স হইয়াছে। সে এখন পূর্ণবয়স্ক যুবা। বিবাহের দুই বৎসর পর হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি পরবর্ত্তী তিন বৎসরে বন্যার জলের ন্যায় তিন কন্যারত্ন লাভ করিলেন। তাঁহার আর কিছুরই অভাব রহিল না। বাঙ্গালী জীবনে যাহা কিছু অবশ্যম্ভাবী, সে সকলই তাঁহার জীবনে ঘটিল। পত্নী পাইলেন, ধূমপ্রভা, সন্তান প্রসবে অতিশয় কার্য্যতৎপরা, উপর্য্যুপরি তিনটি কন্যারত্নও পাইলেন; আর তাহাদের ভরণপোষণের আনুষঙ্গিক গুরু ভারবহনের অধিকারীও হইলেন—বহনে স্কন্ধদেশ শক্ত হউক আর নাই হউক।

যে পরিমাণে নরনাথের সন্তানদল বাড়িতে লাগিল, ভোলানাথের ভ্রাতৃস্নেহও সেই পরিমাণে কমিতে লাগিল। যতদিন কাদম্বরী জীবিত ছিলেন, ততদিন ভোলানাথের ভ্রাতৃস্নেহ খুব প্রবল ছিল। কিছুদিনের জন্য সেই স্নেহপ্রবাহের স্রোত কিছু ক্ষীণ হইয়াছিল, আবার শ্যালিকার সহিত বিবাহের পূর্ব্বে সেই স্রোত প্রবল বেগে বহিয়াছিল। মাতার মৃত্যুর পর হইতে স্রোত একেবারেই কমিয়া গেল। তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-নদীর ন্যায় অতি ক্ষীণ ভাবে বহিতে লাগিল। কোথাও প্রবাহের অস্তিত্ব জানা যায়, আবার কোথাও একেবারেই জানা যায় না।

নরনাথ কোন কাজকর্ম্ম করেন না। এ দোষ শুধু তাঁহার নয়। মাতা পিতা কোন দিন কোন কার্য্য করিতে শিখান নাই বা তাহার

বন্দোবস্ত করিয়া দেন নাই। যতদিন মাতা জীবিতা ছিলেন, ততদিন তাঁহার আদরের অবধি ছিল না। তিনি সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান, মাতার নয়নের মণি, পিতার নয়নানন্দ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কণ্ঠহার, হাই তুলিলে তুড়ি দিবার লোক অনেক। যাহা কিছু স্ত্রীধন ছিল, মাতা সমস্তই তাঁহাকেই দিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার আদরের অভাব ছিল না, অর্থেরও অভাব ছিল না, কোন কিছুরই অভাব ছিল না,—অভাব ছিল কেবল অভাবের।

তিনি বুকে অগাধ আশা পুষিয়াছিলেন। তখনও পর্য্যন্ত নৈরাশ্য কাহাকে বলে তাহা জানেন নাই বা বোঝেন নাই। কাজেই খুব সুখে সময় কাটাইতেছিলেন; আর বর্ষে বর্ষে নব নব কন্যারত্নের মুখচুম্বন করিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছিলেন।

দুনিয়াটা তাঁহার প্রতি বেশ সুব্যবহার করিতেছিল, আর তিনিও ততদিন দুনিয়ার উপর খুব খুসী ছিলেন। পৃথিবীটা একখানা প্রকাণ্ড দর্পণ; যতদিন সে তোমায় সুখী রাখে, ততদিন তুমি তোমার সুখের হাসি হাসিয়া তোমার আনন্দ তাহাতে প্রতিফলিত কর। আর যখনই সে তোমায় দুঃখের কশাঘাত করে, অমনি তুমিও তাহাকে মুখ ভেঙ্গচাইয়া তাহার প্রতি তোমার মনোভাব প্রতিবিম্বিত কর। তুমি যেমন ব্যবহার পাও, এ জগৎ দর্পণে তুমি সেইরূপ প্রতিফলিত কর।

মাতার মৃত্যুর পর হইতে জগৎ তাঁহার প্রতি বেসুরো তান ধরিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা একটু কেমন কেমন ভাব ধারণ করিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া ও শ্যালিকা, তাঁহাকে তিনি বিশেষ আপনার ভাবিয়াছিলেন,—তিনিও যেন আর পূর্ব্বের ন্যায় হাসেন না; তাঁহার মুখশশী যেন কিছু মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে। পিতা রাধানাথ, স্ত্রীবিয়োগের

পর যেন সংসারের উপর একটু বিরক্তির ভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বের সে উৎসাহ নাই, পূর্ব্বের উদ্যম নাই, কোন বিষয়ে পূর্ব্বের ঐকান্তিকতা নাই, পূর্ব্বের স্ফূর্ত্তি নাই, পূর্ব্বের প্রফুল্ল বদন নাই, পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণে আর জোয়ার ভাঁটা খেলে না। এখন বাঁচিতে হয় তাই বাঁচিয়া আছেন। পূর্ব্ব জীবনের কোন বৃত্তিরই আর বিকাশ নাই। তাহার জীবন এখন মরুভূমি। খালি আছে হা হুতাশ, খালি আছে, পিপাসা, খালি আছে অভাব, খালি, আছে অভিযোগ। জীবন আছে, জীবনী শক্তি নাই; জীবন আছে, জীবনে আনন্দের বিকাশ নাই। বাহির হইতে দেখিতে সবই আছে; অথচ পূর্ব্বের আর কিছুই নাই। তাঁহার সব গিয়াছে খালি তাহার কায়া আছে, তিনি চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় খাড়া আছেন। কলের পুতুলের ন্যায় চলেন, ফেরেন, বলেন; কিন্তু জীবনী-শক্তির একেবারে অভাব। প্রাণ কায়া প'ড়ে আছে, অধিষ্ঠাত্রী দেবী চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার সব আছে, অথচ কিছুই নাই। তাঁহার নিকট-আত্মীয়-স্বজন বিন্ধ্যাচলে আর কেহই নাই। লোকজন যে সব আছে, সবই ভোলানাথের হাতের পুতুল। ভোলানাথ যেমন খেলান, তাহারা তেমনি খেলে।

ভোলানাথ প্রায়ই নালিশ করেন, নরনাথ বদ সঙ্গে খারাপ হইয়া যাইতেছে। সে সংসারের কিছুই দেখে না, সংসারের কিছুই করে না, নিজের গোঁয়েতেই কার্য্য করে। এক কথায়, নরনাথ খারাপ হইয়া যাইতেছে। ভোলানাথ নরনাথকে একটি চাকরী করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু নরনাথ সে কার্য্য করিতে রাজি হইলেন না, তবে ভোলানাথ কি করিবে ভোলানাথ প্রায়ই তাঁহার নামে পিতার কাছে নালিশ করিতে সুরু করিলেন, আর ছোট বড় অনেক

নালিশই করিতে লাগিলেন। পিতা ক্রমান্বয়ে নরনাথের বিপক্ষে নালিশ শুনিতে লাগিলেন। ধূমাবতীও কথায় কথায় পিতাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, নরনাথ অধঃপাতে যাইতেছে। সে নিজেও মজিল, আর তাহার কচি ভগ্নীটাকেও মজাইল ও মেয়েগুলোকে পথে বসাইল। ধূমাবতী বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহার ভগ্নীর জন্য তাঁহার নাড়ীর টান, আর নরনাথের জন্য তাঁহার স্বামীর নাড়ীর টান—টানাটানি সত্বেও তাঁহারা নরনাথকে শুধরাইতে পারিলেন না; নরনাথ নিজের ঝোঁকেই থাকে। পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে; ভালর দিকে তাহার কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে পূর্ব্বে তাহার কার্য্যে তেমন কিছু অন্যায় দেখা যাইত না; এখন তাহার সকল কার্য্যই অন্যায় পূর্ণ।

পূর্ব্বে, কিন্তু যখন তাঁহার মাতা জীবিতা ছিলেন, তখন তিনি নরনাথের সকল কার্য্যই সুন্দর দেখিতেন। তাঁহার বাক্যগুলি মিষ্ট ছিল, তাঁহার কার্য্য কলাপ সুন্দর ছিল, তাহার দুষ্টামিগুলি পর্য্যন্তও মধুময় ছিল। আর তাঁহার রাগ, একগুয়েমিগুলিও কোনরূপ দুষণীয় ছিল না। কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে পিতার কাছে একটিও রূঢ় কথা বলিতে সাহস করিত না। মাতাপিতার সম্মুখে সকলেই তাঁহার অশেষ গুণের কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিত, তাহারাও নিজে ধন্য হইত তাঁহার মাতাপিতাকেও ধন্য করিত। আর এখন তাঁহার গুণকীর্ত্তনের লোক একজনও নাই। অধুনাতন নীতি অনুসারে তিনি নিজেও তাঁহার নিজের গুণ কীর্ত্তন করিতেন না। তাঁহার ছিদ্রান্বেষণ করিবার লোক যথেষ্ট, আর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভোলানাথ এই দলের নেতা। ফলে এই হইল, রাধানাথ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নিন্দাবাদই শোনেন, সুখ্যাতির কথা একেবারেই তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে পায় না।

নরনাথও ক্রমান্বয়ে নিজের বিরুদ্ধে দোষারোপ শুনিয়া মনে করিতে

লাগিলেন, বাস্তবিকই হয় ত তিনি দোষী। একটা বিষয় পুনঃ পুনঃ শুনিলে লোকের মনে এইরূপই ধারণা হয়।

এই সময়ে ভোলানাথের পূর্ব্ব বন্ধু গ্রহকুমার ও তাহার কতিপয় বন্ধু বিন্ধ্যাচল গগনে আ'সয়া উদয় হইল। আসিয়া তারা দশ দিন ধরিয়া বিন্ধ্যাচল-গগন সমুজ্জ্বল করিল।

গ্রহকুমার একদিন সদলবলে নরনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিল; এবং নরনাথ কি কাজ-কর্ম্ম করিতেছে, সেই বিষয়ে তত্ত্বাদি লইতে লাগিল। যখন তাহারা শুনিল, নরনাথ কিছুই কাজ কর্ম্ম করে না, তখন তাহারা একেবারেই অবাক্ হইয়া গেল এবং বলিতে লাগিল,—'কি আশ্চর্য্য, আপনি কোনরূপ কাজ কর্ম্ম করেন না! এই কাঁচা বয়সে বৃথা সময় কাটাইতেছেন! আপনি একজন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ যুবক, উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ভোলানাথবাবু আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর। আপনি জানেন, আমরা ম্যাচ-ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেডের কার্য্যে তাঁহাকে কত টাকা পাওয়াইয়া দিয়াছি। আপনি এক কাজ করুন, চল্লিশ কি পঞ্চাশ হাজার টাকা যোগাড় করিয়া দিন, আমরা আপনাকে দশ লক্ষপতি করিয়া দিব'।

নরনাথ তাহাদের এই সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইলেন এবং তাহাদিগকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন।

নরনাথ। গ্রহকুমার বাবু, আমার প্রতি আপনাদের আন্তরিক ভালবাসায় ও সৌজন্যে আমি ধন্য হইলাম। আপনাদের সৎপরামর্শ অমূল্য। তবে কি জানেন, এত টাকা আমি কোথায় পাইব?

গ্রহকুমার। কি বলেন! আপনি রাধানাথ বাবুর প্রিয় পুত্র,—বিশ্ব-প্রেমিক ভোলানাথ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা,—আপনার টাকার অভাব! এ অসম্ভব, এ হইতেই পারে না।

নরনাথ। হইতে পারে না কি মহাশয়, ইহা অতি সত্য। আমার এত টাকা নাই, আমি এত টাকা কোথায় পাইব ?

গ্রহকুমার। কি বল্লেন, আপনার টাকা নাই! আপনি আপনার পিতাকে এ কথা বলিয়াছিলেন ? আপনার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে এ কথা বলিয়াছিলেন ?

নরনাথ। আজ্ঞে না।

গ্রহকুমার। তা ত বুঝেছি। তা নহিলে, আপনি এমন কথা বলিবেন কেন ? আচ্ছা যান্ আপনি, আজকেই আপনার পিতার কাছে এই টাকা চান, দেখুন তিনি কি বলেন। আপনি আগামী পরশ্ব আমাদের সঙ্গে দেখা করিবেন। দেখি, আমরা আপনার কতটুকু উপকার করিতে পারি।

সেইদিন বৈকালেই ভোলানাথ পিতাকে যাইয়া সংবাদ দিলেন, নরনাথ কুসঙ্গে পড়িয়া অনেক টাকা ধার করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে তাহার সঙ্গীদের বলিয়াছে যে, সে যেমন করিয়াই হউক পিতার কাছ থেকে হাজার পঞ্চাশ টাকা যোগাড় করিয়া আনিবে। না হয় তাহার নিজের নামে কোম্পানির কাগজগুলি বেচিয়া আপাততঃ কিছু টাকা আনিবে ; পরে পিতার কাছ থেকে বক্রি টাকা আনিয়া দিবে। সে জানে পিতার লোহার সিন্ধুকে টাকা থাকে।

পিতা এই কথা শুনিয়া অগ্নিশর্ম্মা। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমার নরনাথটা একেবারে গোল্লায় গিয়াছে। আমি পূর্ব্ব হইতে ইহার আভাষ পাইয়াছি। আমার সহিত দাগাবাজি! আমি সব জানি। সব খবর রাখি।

সেই দিন সন্ধ্যার পর নরনাথ পিতার কাছে আসিয়া বসিল এবং টাকা পাইবার প্রস্তাব করিল। পিতা শুনিয়া একেবারে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন।

নরনাথ যে উদ্দেশ্যে টাকা চাহিতেছিলেন, তাহা বলিলেন না। ফলে, পিতার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, নরনাথ কু-অভিপ্রায়ে এই টাকা সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। আর তিনি ভোলানাথের বুদ্ধিমত্তা ও তাহার সকল বিষয়ে নজর রাখার জন্য তাহার গুণে আরও আকৃষ্ট হইলেন।

পরদিনই পিতা, ভোলানাথকে ডাকাইয়া নরনাথের প্রস্তাবের কথা সমস্ত জানাইলেন ; আর বলিলেন—বাবা, তুমিই আমার উপযুক্ত পুত্র। তুমি সকল বিষয়ে নজর না রাখিলে, নরনাথটা ত আমার সর্ব্বনাশ করিত ; আমার যাহা কিছু আছে, আমাকে ভুলাইয়া সমস্ত বাহির করিয়া লইত। বাবা, এখন আমার এই বয়সে, তুমি আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, আমার পিতার কার্য্য করিতেছ। আত্মনাথটা ত নিজের লইয়া ব্যস্ত, নরনাথটা ত একেবারে উৎসন্ন গিয়াছে। কিসের জন্য টাকার প্রয়োজন, তাহা বার বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও কিছু বলিল না। সে মনে করে, আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নাই, আমরা বোকা। জানে না যে, আমার সম্মুখের দিকে দুটো চোখ, আর পশ্চাৎদিকে দুটো চোখ। যতদিন আমার ভোলানাথ আমার কাছে আছে, ততদিন আমার পশ্চাদ্‌ভাগের চোখ উজ্জ্বল থাকিবে, আর আমি সব দেখিতে পাইব, সব জানিতে পারিব।

ভোলানাথ। বাবা, আমার একটা ভয় হয়, পাছে ওর নামের মাতৃদত্ত কোম্পানির কাগজগুলি ভাঙ্গাইয়া ফেলে।

রাধানাথ। তা, আশ্চর্য্য কিছুই নয়। আমারও ঐ ভয় হয়। আচ্ছা, তবে নরনাথকে ডাক, আমি তাহার কাছ থেকে ঐ কাগজগুলি নাম পাল্‌টাইয়া লই।

নরনাথকে ডাকান হইল। নরনাথ আসিলে রাধানাথ তাঁহার নিজের লোহার সিন্দুক খুলিয়া, পত্নীদত্ত নরনাথের নামে লেখান

কাগজগুলি বাহির করিয়া নরনাথের হাতে দিয়া রুক্ষ কণ্ঠে বলিলেন, নরনাথ এইগুলি সহি করিয়া দাও।

নরনাথ কাগজগুলি হাতে লইয়া পিতার মুখের পানে চাহিলেন। রাধানাথ স্বর আরও কঠোর করিয়া বলিলেন, চাহিয়া রহিয়াছ কি জন্য, শীঘ্র সহি করিয়া দাও। আমার সম্পত্তি, তুমি রোজগার কর নাই। তোমার সহি করা কাগজ আমার কাছেই থাকিবে। তুমি উপযুক্ত হও, ফেরৎ দিব ; তা নহিলে তোমার তিন তিনটি কন্যা,—তাহাদের বিবাহের জন্য এই টাকা রহিল।

নরনাথ বাক্যব্যয় না করিয়া কাগজগুলি এন্‌ডোরস্ করিয়া দিলেন। সহি করিয়া দিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। রাধানাথ তাহা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, দেখছ, বেটার আবার রাগ। যতদিন আমি আছি। তার পর বেটার দুর্দ্দশায় শেয়াল কুকুর কাঁদবে। বেটা এখনও বুড়ার স্কন্ধে চালাইতেছে। তবে উপায় কর্‌বে কবে ?

ধূমাবতী। বাবা, আমিও ত তাই বলি, আমার দুর্ব্বুদ্ধি, বোনটাকে টেনে এনে জলে ফেলে দিলাম। আপনি যতদিন আছেন, তার কোন ভাবনা নাই। সে রাজার বউ। আর আমরা যতদিন আছি, একবেলা খেয়েও আর তাহার ছেলেদের একবেলা খাওয়াইব। ভাবনা, তার পরে। আর পাঁচজনকার জন্য ভাবতে পারি না। উনি ত ভেবে ভেবে আধখান হইয়া গিয়াছেন,—আমার শরীরও ভাঙ্গতে বসেছে। আমাদের নিজের জন্য একেবারেই ভাবি না, ভাবনা কেবল আপনার সেবার ক্রুটি না হয়। তাহা হইলে ইহকালও যাইবে, আর পরকালও যাইবে।

ইহার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে একদিন রাহুকুমার রাত্রিভোজের জন্য নরনাথকে নিমন্ত্রণ করিল ; উপলক্ষ তাহাদের বাসায় একটা ভাল গাইয়ে

গান গাহিবে। নরনাথ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ রাহুকুমারের বাসায় গিয়াছেন। রাত্রি দশটার মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া, পিতাকে কিছু বলিয়া যান নাই।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় একজন লোক রাধানাথের শয়ন-গৃহ হইতে বেগে বাহির হইয়া গেল। সেই ঘরে রাধানাথের একটী লোহার সিন্দুক থাকিত। তাহার মধ্যে রাধানাথের নিজের নামের কয়খানি কোম্পানির কাগজ ছিল, আর ছিল কাদম্বরী-প্রদত্ত নরনাথের কতকগুলি কাগজ। আর কয়েক দিবস পূর্ব্বে নরনাথের ব্লাঙ্ক এন্‌ডোরস্‌ করা কতকগুলি কাগজ। রাধানাথ খাবার ঘরে খাইতেছিলেন, আর ধূমাবতী রাধানাথকে খাওয়াইতেছিলেন। সেই মুহূর্ত্তে সেই লোকটা বাহিরে আসিল। আ'ব্‌ছায়ায় দেখা গেল, নরনাথ পলাইয়া গেল। বাটীর দাসী মোটকী তাহাকে স্পষ্ট দেখিয়াছিল; সে কর্ত্তার ঘরের ভিতর ঠক্‌ ঠক্‌ আওয়াজ শুনিয়া চোর চোর করিয়া চেঁচাইয়া উঠে ও স্পষ্ট দেখিতে পায়, তিনজন ঘর হইতে বাহির হইয়া পলাইয়া গেল। তাহার মধ্যে একজন ছোটবাবু—সে স্পষ্ট দেখিয়াছে।

যে ঘরে রাধানাথ খাইতেছিলেন, তাহার কিছু দূরে রাধানাথের শয়ন-গৃহ, তাহার আলো নিবিয়া গিয়াছে। আলো লইয়া ঘরে গিয়া দেখা গেল, লোহার সিন্ধুকে তিন চারিটা লম্বা লম্বা দাগ। রাধানাথ চোর চোর শব্দ শুনিয়া ভয়ে থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। মোটকী "ছোটবাবু" "ছোটবাবু" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। রাধানাথ ঘরে আসিলে, ধূমাবতী লোহার সিন্দুকের দাগ দেখাইল—লোহার দ্বারা তিন চারিটা আঁচড়ান দাগ। মোটকীর 'ছোটবাবু, ছোটবাবু' চীৎকার থামিল না; আর ধূমাবতী 'চুপ কর মাগী, চুপ কর' বলিয়া ধমকাইতে লাগিল।

মোটকী। তা আর—'চুপ কর মাগী', "চুপ কর মাগী' কি?

তোমাদের ভদ্রঘরে হ'লেই 'চুপ চুপ" হয়; আর আমাদের গরীবের ঘরে হইলেই 'চোর' 'চোর' হয়, আদালতে চালান হয়, আর জেল হয়।

রাধানাথ। আরে মোটকী কি হয়েছে, চেঁচামেচি কচ্ছিস্ কেন?

মোটকী। কর্ত্তাবাবু, আমি আপনার ঘরে খট্ খট্ আওয়াজ শুনিয়া দৌড়ে গিয়া দেখি, ঘরে আলো নাই, অন্ধকার ঘোরঘোট্টি। চোর চোর করে চেঁচিয়ে উঠিলাম। দেখিলাম, তিনটা লোক বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া পলাইল; তাহাদের মধ্যে ছোটবাবু একজন। তাই বলেছি বলে, বৌমা, আমাকে 'চুপ কর মাগী, চুপ কর মাগী' ব'লে ধমকাচ্ছে। তা চুপ করবো কেন বাপু। চুরি ত আমি করি নাই, আর আমার বাপ দাদাও করে নাই, তা চুপ চুপ কিসের?

ধূমাবতী। চুপ না ত কি রে, মোটকি? ছোট ছেলে যদি একটা অন্যায় কাজ করেই থাকে, তা হয়েছে কি? যদি ছোট ঠাকুরপো, না ক'রে আমার রাহুরাম ক'রত, আমি কি চাপ্‌তাম না? আর যদি নিয়ে থাকে ত নিয়েছে। কার জিনিস, সে ত তার বাপের, না হয় ভায়ের, না হয় আমার। ফের বল্‌ছি মোটী, এ কথা আর একেবারেই তুলবি না, মাটিতে পুঁতে ফেল।

(রাধানাথের দিকে ফিরিয়া) বাবা, ও কিছু নয়। ছোট ঠাকুরপো ছেলেমানুষ, কি ক'রেছে না করেছে—তা নিয়ে গোলযোগ করিবার প্রয়োজন নাই। কথায় বলে "নিজের পাগল বেঁধে রাখ।" লোকে শুন্‌লে হাস্‌বে আর আর টিটকিরি দেবে; বল্‌বে, রাধানাথ বাবুর ছেলে চোর, ভোলানাথবাবুর ভাই চোর। আমার সর্ব্বস্ব যাউক, আমি পথে পথে ভিক্ষা ক'রে খাব, তথাপি তাহা সহ্য করিতে পারিব না। আমার রাহুরামে ও নরনাথে কি কিছু তফাৎ আছে? কিছু না। আমার রাহুরাম যদি

খারাপ হ'ত ত, কি করিতাম? তা নিয়ে কি 'উলো উলো ফুলো ফুলো' করিতাম? কখনই না। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, আমার দ্বারা এরূপ হইবার নয়, হইবে না। আমার এরূপ জন্ম কর্ম্ম নয়, আমার এরূপ শিক্ষা দীক্ষা নয়।

এইরূপ গোলযোগ হইতেছে, সেই সময় ভোলানাথ কোথায় হইতে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া ধূমাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের জন্য এত গোলযোগ? ধূমাবতী, না ও কিছু নয়, বলিয়া কথাটা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল।

রাধানাথ বলিলেন, রোস, ওরূপ করিয়া কথা চাপিলে চলিবে না। রোগ হইয়াছে, চিকিৎসা করা চাই, ঔষধ দেওয়া চাই। রোগ চাপিলে, ক্রমে বাড়িয়া যাইবে; চাই কি প্রাণান্ত পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই বলিয়া তিনি যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিলেন এবং লোহার সিন্দুকের দাগের কথা বলিতেও ভুলিলেন না।

ভোলানাথ তখন তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়া লোহার সিন্দুক দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন, ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন। আমি জানি, নরাটা একেবারে গোল্লায় গিয়াছে। আজ প্রায় দুই বৎসর হইতে টাকাকড়ি চুরি করিতেছে। সংসার খরচের জন্য, এই টাকা রাখিয়া গেলাম, আর এসে দেখি নাই। আপনাকে বলি নাই নিজের উপর ধিক্কারে। আপনার পুত্র—দেবতুল্য মানুষের পুত্র, সে এ কার্য্য করিতেছে—এ কথা বলা পাপ, মনে করা পাপ, আর সত্য হইলে ত পাপ বটেই। তাই এত দিন বলি নাই। তবে এখন আর না বলিলে চলে না। শরীরে পচ্ ধরিয়াছে, কষ্ট হইলেও সে স্থান কাটিয়া ফেলিতে হইবে। নরনাথ একটু দুষ্ট হইয়াছে, তাহাকে শোধরাইতে হইবে, যে সব পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তাহা কষ্টদায়ক ও সময়ে

সময়ে হৃদয়-বিদারক,—তাহা হইলেও তাহা করিতে হইবে। তাহাকে ভাল করিবার জন্য হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে। আর একটু কেহ না দেখিলে, সে ত লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ফেলিত, লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিলেই কাগজগুলি নিয়া সরিয়া পড়িত। উদ্দেশ্য ত তাহাই। বাবা তাহার উপকারের জন্য কাগজ-গুলি সহি করাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছেন; ভিজা-বিড়ালটির মত বিনাবাক্য-ব্যয়ে সেদিন সেগুলি সহি করিয়া দিল; আর আজ পনের দিন যাইতে না যাইতে একেবারে ডাকাতি। তা যাই হউক, বাবা, ওকে ডাকা যাক, আর জিজ্ঞাসা করা যাক, ও কেন এমন করিল—কি কৈফিয়ৎ দেয়া শোনা যাক্।

ধূমাবতী। তুমি যেমন, বাবার ন্যায় দেব-চরিত্র, অতিশয় সরল প্রকৃতির—তাই তুমি মনে করিতেছ, ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার সদুত্তর দিবে। সে যখনি ধরা পড়িয়াছে, তখনি পগার-পার। আমার ভয় কাগজগুলোর জন্য নয়; সে ত তুচ্ছ দশ বিশ হাজার টাকার মামলা। আপনার আশীর্ব্বাদ থাকিলে দুই মাসেই ও টাকা আসিতে পারে। আমার ভয় আপনার অমূল্য জীবনের জন্য। আপনি একলা এই ঘরে শুয়ে থাকেন; লোহার সিন্দুক আপনার ঘরে; কোন দিন টাকার লোভে আপনার প্রাণের উপর আঘাত করিতে পারে। আমার কেবল সেই ভয়। প্রাণের কাছে টাকা অতি তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। টাকা ত হাতের ময়লা।

ভোলানাথ। ওগুলো কোম্পানির কাগজ না হইয়া পূতিগন্ধযুক্ত ইন্দুর পচা হইত, আর সেটা যদি ঘরে রাখাই প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে পিতার প্রাণরক্ষার জন্য সেটা তাহার ঘর হইতে আমার নিজের ঘরে রাখিতাম; তার জন্য যে কষ্ট ভোগ, তাহা করিতেও স্বীকার। কিন্তু এ যে অর্থ সকল অনর্থের মূল।

ধূমাবতী। তা যাহাই হউক, বাবার লোহার সিন্দুক হইতে ও-সর্ব্বনেশে কাগজগুলি সরাইয়া রাখিতে হইবেই হইবে। তা বাবা, ও গুলো আর আপনার ঘরে রাখিয়া কাজ নাই।

সেই রাত্রেই নরনাথের সেই কোম্পানির কাগজগুলো ও অপরাপর কোম্পানির কাগজ যাহা সেই সিন্দুকে ছিল, সব ভোলানাথের ঘরের লোহার সিন্দুকে চলিয়া গেল। ভোলানাথের ও ধূমাবতীর এ কার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য—রাধানাথের প্রাণরক্ষা,—তাঁহার রক্ষার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের নিজের জীবন বিপদ্-সঙ্কুল করিলেন। কে বলিতে পারে, নরনাথ ঐ সব কাগজের জন্য তাঁহাদের ঘরে ডাকাতি করিবে না—তাহাদের জীবনে আঘাত করিবে না?

ইহার কিছুদিন পরেই ধূমাবতীর ও ভোলানাথের প্ররোচনায় নরনাথকে আলাহিদা করিয়া দেওয়া হইল। তাহাদিগকে মাসিক কিছু কিছু ভাতা দেওয়ার বন্দোবস্ত হইল। আর যে অংশে থাকিতে দেওয়া হইল, পিতার প্রাণরক্ষার্থ সে অংশ এক বৃহৎ প্রাচীর দিয়া পৃথক করিয়া দেওয়া হইল। অর্থব্যয়, তাহাতে কি হইবে? পিতার মঙ্গলের জন্য সবই করিতে হইবে।

নরনাথ উপায়ান্তর না দেখিয়া, নীরবে এ সব অত্যাচার সহ্য করিল। প্রত্যহই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষারোপে পিতার মনকে তাহার প্রতি এরূপভাবে বিরূপ করিয়া রাখিয়া দিল, যে, নরনাথের পক্ষ হইতে পিতা মনকে এই বৃথা নিন্দাবাদ কুয়াসা হইতে মুক্ত করা একেবারে অসম্ভব। বিশেষ এ কার্য্যে যখন তাহার কোন সহায় নাই, কোন সহযোগী নাই, সকলেই তাহার অসহযোগী, সকলেই তাহার বিপক্ষ, এরূপ অবস্থায় স্বয়ং বিরূপাক্ষ হারিয়া যান, মানুষ কোন ছার?

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

অতি কাছে—অতি দূরে

নারীসুন্দরী ও তাহার পুত্রচতুষ্টয় আজ প্রায় চারি বৎসর একত্র থাকিয়া প্রত্যহ ছোট-খাট খিটিমিটি লইয়া কাটাইত। পরস্পরের প্রতি তাহাদের স্নেহ-ভালবাসা খোলা পাত্রে কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গিয়াছে। সকলে একসঙ্গে আছে সত্য, কিন্তু বন্ধন কিছুই নাই। প্রত্যেকেই অর্থের বখরা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। ক্রমে প্রকাশ্য কলহ আরম্ভ হইল। প্রত্যেকেই অপরের প্রতি অসৎ ও স্বার্থপর উদ্দেশ্যের দোষারোপ করিতে লাগিল। ফলে প্রত্যেকের মন প্রাণ অপরের প্রতি বিশেষ ভাবে শুকাইয়া গিয়াছে, কাহারও অন্তরে কোন রস-কস নাই।

নারীসুন্দরী সুমিষ্টান্নের একটু বিশেষ পক্ষপাতী। স্বামীর জীবিতাবস্থায় অনেক সময়, গাত্রের স্বর্ণাভরণ বিক্রয় করিয়া রসনেন্দ্রিয়ের সেবা করিয়াছেন। পরে উমেশ ডাক্তারের মৃত্যুর পর তাঁহার রসনেন্দ্রিয়ের সেবার একটু অসুবিধা হইয়া পড়ে। উমাসুন্দরীর মৃত্যুর পর তাহার স্থাবর সম্পত্তির মালিক হইলে পর যখন বাটী বন্ধক দিয়া সংসারের খরচ ও মোকর্দ্দমার খরচের সুবন্দোবস্ত করিলেন, তখন আবার জিহ্বাদেবীর ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন করিলেন। প্রথমে সকলকারই জিহ্বাদেবীর পূজার বিশেষ বন্দোবস্ত হইল। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, বাটী-বন্ধক-দিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ কলসীর জলের ন্যায় ব্যবহার হেতু কমিতে লাগিল। আবার নারীসুন্দরীর সুমিষ্টভোজনের বিশেষ অসুবিধা

হইতে লাগিল। ছেলেরা বেশ খরচ-পত্র করিতে লাগিল। যত গোলযোগ কেবল নারীসুন্দরীর বেলা। তিনি ক্রমশঃই ছেলেদের প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়িলেন। তাহার চারিটি কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা ধূমাবতী ছাড়া, অপর তিনটিকে কিছু কিছু উপঢৌকন দিবার তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা, কিন্তু পুত্রেরা তাহার অন্তরায়। তাহারা মাতামহের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও কাহাকেও দিতে রাজী নহে। তাহারা বলে, যখন আমাদের ছিল না, তখন কি ভগ্নীরা আমাদের সাহায্য করিয়াছিল। তাহারা আমাদের কোন সাহায্য করে নাই। আমরাও এখন তাহাদের কোন সাহায্য করিতে রাজী নই। ফলে মাতা পুত্রে ঘোর মনোবিবাদ, ঘোর অশান্তি, পরস্পরের মধ্যে একবিন্দুও ভালবাসা নাই, সকলের মনই অতিশয় শুষ্ক, নীরস, উগ্র ও রুক্ষ। সকলের মনের অবস্থা বারুদের ন্যায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অপেক্ষায় রহিয়াছে। কোনরূপে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িলেই সব জ্বলিয়া যাইবে।

একদিন ধূমাবতী ভোলানাথকে কথাচ্ছলে বলিল, দেখ আমি খবর পাইয়াছি মাতাঠাকুরাণী আমাদের ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের উপরে বিশেষ নারাজ। বধূগুলিও মাতার কোনরূপ সেবা যত্ন করে না, নিজে নিজে সুখ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, মাতার প্রতি কোনরূপ ভক্তি ভালবাসা তাহাদের নাই। এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে একটু চেষ্টা করিলেই তিনি পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের কাছে আসিতে রাজি হইবেন। আমি বলিতেছিলাম, একবার চেষ্টা করিলে হয় না।

ভোলানাথ। চেষ্টা করিতে বাধা কি আছে? তবে আমরা তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে তিনি আমাদের পুনরায় মুখ-দর্শন করিতে রাজি হইবেন, আমার বিশ্বাস হয় না।

ধূমাবতী। কেন, আমরা তাঁহার প্রতি কি কু-ব্যবহার করিয়াছি।

তিনি ও তাঁহার পুত্রেরা তাঁহার বৃদ্ধ মাতাকে দেখিতেন না। তুমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা আর আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা; তাঁহার তরফ হইতে তাঁহারই কর্ম্ম করিয়াছি। তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন নাই। তিনি যাহাতে কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচ্যুত না হন সেই জন্য আমরা তাঁহার কার্য্য করিয়াছি।

ভোলানাথ। কেবল কর্ত্তব্য করিয়াছি তাহা নহে, তাহার পুরস্কারও পাইয়াছি।

ধূমাবতী। যে কার্য্য করিবে, সেই পুরস্কার পাইবে। তাহাতে যে পুরস্কার পায় তাহার দোষ কি? অগ্রে কার্য্য, তবে পুরস্কার। পুরস্কার ত' অগ্রে নয়, কার্য্য অগ্রে পুরস্কার পশ্চাৎ।

ভোলানাথ। তা সব সত্য বটে, তবে তিনি কি আমাদের বিশ্বাস করিবেন?

ধূমাবতী। বিশ্বাসের কথা কি আছে; এ' ত কেনা বেচার কথা, আদান প্রদানের কথা। তিনি যাহা চান, আমরা তাঁহাকে তাহাই দিব। তার পর আমরা যাহা চাই, তিনি আমাদিগকে তাহা দিবেন। আমরা অগ্রে তাঁহার প্রাপ্য তাঁহাকে দিব। তার পর আমরা যাহা চাই, তিনি আমাদের তাহাই দিবেন। এখানে বিশ্বাসের কথা কিছুই নাই। তবে অবিশ্বাসের কার্য্য করিলেও পুনরায় কি বিশ্বাস-ভাজন হওয়া যায় না? নিশ্চয়ই যায়। এখন পুনরায় চেষ্টা করিয়া কার্য্য দ্বারা তাঁহার বিশ্বাস-ভাজন হইতে হইবে। ফণাধারী সর্পকে তাহার ফণা নোয়াইয়া, পায়ের কাছে আনিতে হইবে, তবে ত' কার্য্যসিদ্ধি হইবে। কার্য্যসিদ্ধি করিতে গেলে কার্য্য করা চাই; আর সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা চাই। তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

ভোলানাথ। পূজা করিতে পুরোহিতের প্রয়োজন।

ধূমাবতী। আমি কি বলিতেছি, বিনা পুরোহিতে কার্য্য কর।

ভোলানাথ। সকলকেই অসন্তুষ্ট করিয়াছি; আমাদের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিবে কে?

ধূমাবতী। তুমি অতিশয় অদূরদর্শী। একটু চেষ্টা করিলেই পুরোহিত মিলিবে। চতুর্দ্দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, নিকটেই পুরোহিত মিলিবে।

ভোলানাথ। পুরোহিত মিলিত, কিন্তু ব্যবহারদোষে আমরাই তাহাদিগকে তফাৎ করিয়া দিয়াছি। তাহারা সাহায্য করিবে কেন?

ধূমাবতী। তফাৎ করিলে কি ফের কাছে আনা যায় না, পর করিলে কি তাহাকে আত্মীয় করা যায় না?

ভোলানাথ। সব সময়েই কি পৌরোহিত্য কেনা বেচার জিনিস? আন্তরিক ভালবাসা ও আন্তরিক টান না থাকিলে কি সব সময়েই অর্থের জন্য লোকে কাজ করিতে রাজি হয়?

ধূমাবতী। নিশ্চয়ই! ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ থাকিলেও অর্থবারি-সিঞ্চনে আর ভালবাসার ভানে ঘৃণা, হিংসা ও দ্বেষের স্থানে সহযোগিতা আনা যায়। আমি যে পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ জগতে আদান প্রদানের কিছু চেষ্টা ও ব্যয় স্বীকার করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

ভোলানাথ। তা সব সময় হয় না। তবে এ ক্ষেত্রে হইতে পারে; তা তোমার এ ক্ষেত্রের পুরোহিত কে?

ধূমাবতী। চেষ্টা, অর্থ, বুদ্ধি—এই তিনেই সিদ্ধি। এই তিন বজ্র একত্র হইলে অষ্ট-বজ্রের কাজ করে। তোমরা, পুরুষগুলো, অতিশয় উদ্যমহীন; তোমাদের ভরসা অতি কম। তোমরা বিশেষ উদ্যমশীল হইলে, এ পৃথিবীটা অন্য রকম হইয়া যাইত। যাহা হউক, এ পূজায় পুরোহিত আমার কনিষ্ঠা সহোদরা, ধূম-প্রভা। সব মাতাই কনিষ্ঠ

পুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যার পক্ষপাতী। আমার মাতাও সেই নিয়মের বহি-ভূর্তা নন, বিশেষতঃ তিনি তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার পক্ষপাতী।

ভোলানাথ। তোমার সহোদরা ধূমপ্রভা ও আমার সহোদর নরনাথ, তাহাদের দুজনের প্রতি আমরা দুজনে যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে তাহারা আমাদের কোন সাহায্য করিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না; আর তোমার মাতা মিষ্টান্নের চেয়ে কোন মেয়েকে ভালবাসেন কি না সন্দেহ।

ধূমাবতী। তাহারা আমাদের সাহায্য না করিতে পারে, তাহারা নিজে নিজেকে সাহায্য করিতে ত' রাজি হইবে; তাহা হইলেই হইল। আমরা তাহাদের প্রতি মন্দ ব্যবহার করিয়াছি সত্য, এখন আবার ভাল ব্যবহার করিব। বলিব, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই কিছু দিন তোমাদিগকে কষ্ট দিলাম; এখন দেখিতেছি, তোমরা অনেক শুধরাইয়াছ, ভালবাসা ও সদ্ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়াছ। এখন আবার তোমাদিগকে কোলে টানিয়া লইব। তোমাদের তফাৎ করিয়াছিলাম, তোমাদের কার্য্যের দোষে; আবার তোমাদিগকে কোলে তুলিয়া লইতেছি, যখন দেখিতেছি তোমরা শুধরাইয়াছ। তোমাদের প্রতি আমাদের ভালবাসা ফল্গুর স্রোতের ন্যায় ক্রমান্বয়েই বহিতেছে; কখনও দেখা যায়, কখনও বা যায় না। স্রোত কিন্তু সর্ব্ব সময়েই আছে, তা, প্রকাশ্যেই হউক আর অপ্রকাশ্যেই হউক।

ভোলানাথ। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ধূমাবতী। তথাস্তু।

ধূমাবতী সেই দিনই তাঁহার নিজ কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ধূমপ্রভার মহলে গেলেন। আজ প্রায় দুই বৎসর হইল তাঁহাদের পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলেন। এই দুই বৎসরের মধ্যে একটি দিনও তাঁহার মহলে যান নাই। ধূমপ্রভা তাঁহাকে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া গেলেন,

আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আজকে হঠাৎ এ অমঙ্গল আমার দিকে কেন? এ একাধারে অশ্লেষা ও মঘা, ইহার আগমনে অমঙ্গল ছাড়া কোন মঙ্গলই হইতে পারে না। মা মঙ্গলচণ্ডি, এ কি করিলে মা! আবার বোধ হয় কোন নূতন বিপদ আসিতেছে, সেটি আমার সহোদরা সঙ্গে সঙ্গে আনিতেছে।

ধূমাবতী তাঁহার মহলে আসিয়াই দেখিল, ধূমপ্রভার তিনটি কন্যা খেলা করিতেছে। একে একে তাহাদের কোলে লইলেন, মুখচুম্বন করিলেন, আর কত আদর করিতে লাগিলেন। অল্পবয়স্কা ছেলে মেয়েরা বুঝি স্বতঃই ভাল মন্দ বুঝিয়া লইতে পারে। তাই বুঝি তাহারা সর্ব্ব প্রথম তাঁহাকে দেখিয়া অবাক্; কোলে চড়িতে একেবারেই নারাজ। ধূমাবতী কিছু মিষ্টান্ন ও কিছু লজেঞ্জুস তাঁহার কাপড়ের অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়া ছিলেন, তাহা কলাপাতায় মোড়া ছিল, খুলিয়া মেয়ে তিনটিকে দিলেন। মিষ্টান্ন ও লজেঞ্চুস্ পাইয়া তাহার ভগ্নি-কন্যারা ধূমাবতীর সহিত যুদ্ধ শেষ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিল।

ক্ষাণিকক্ষণ কন্যাদের আদর করিয়া ও তাহাদের সহিত সদ্ভাব-স্থাপন করিয়া ধূমপ্রভার চুলে হাত দিয়া চুল ফুলাইয়া বলিলেন, হ্যাঁরে প্রভা, তোর চুলের অবস্থা এ কি? জটা পড়িয়া গিয়াছে। তোর ছেলেবেলায় এত চুল ছিল, লোকে তোকে 'ঝুলানী' বলিত, আজ দুই বৎসর আমি তোর চুলের যত্ন করি নাই, ব্যস্ একেবারে চুলের কি দুরবস্থা। তোর সে সোণার রং কোথায়? এ যে কালী মেরে গেছে। তা তোদের ভবিষ্যৎ ভালর জন্য আমি না হয় দেখি নাই, তুই ত' বোন বড় হ'য়েছিস্, তুই নিজেও কি শরীরের যত্ন করিতে পারিস্ না। এ যে তোকে দেখ্‌লে চেনা যায় না। হ'ল কি,—একেবারে সোণার প্রতিমা মাটি হ'য়ে গিয়াছে।

এখানে পাঠককে বলিয়া রাখা উচিত যে, ধূমপ্রভা মোটেই সুন্দরী

নন্, তিনি পাঁচপাঁচি রকমের। তবে আত্মীয়তার স্থলে যদি তাঁহাকে কেহ সুন্দরী বলেন, তবে সে অন্য কথা। অনেক পাঠিকাই জানেন, ভগবান্ যদিও তাঁহাদিগকে বিশেষ সুন্দরী করিয়া পাঠান নাই, তথাপি তাঁহাদের মাতা পিতা তাঁহাদের মধ্যেও সৌন্দর্য্য দেখিতে পান। আর দেখেন, তাঁহাদের স্ব স্ব স্বামী। যে চক্ষে তাঁহারা দেখেন, অপরের সে চক্ষুর অভাব,—কাজেই অপরে সে সৌন্দর্য্য দেখিতে পান না। তবে মাঝে মাঝে দেখিতে পান পাড়ার ঠান্‌দিদি ; আর স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে সব লোক তাহাদিগকে তোষামোদ করিতে বাহির হইয়াছেন তাঁহারা। ধূমাবতী ধূমপ্রভার নিকট আত্মীয়া হইলেও শেষোক্ত দলে পড়িয়াছিলেন।

ধূমপ্রভা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার গণ্ডস্থল বাহিয়া অশ্রু-প্রবাহ বহিতে লাগিল। ধূমাবতী অশ্রু মুছাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কি করিব বোন, তোমাদের ভালোর জন্যেই আমাকে এতদিন বুক বেঁধে থাকিতে হইয়াছিল। মাতা যেমন রোগের সময় পুত্রকে কুপথ্য দিতে নারাজ, রোগ-আরোগ্যের জন্য সন্তানকে শুকাইয়া রাখেন, সেইরূপ নরনাথের রোগ আরোগ্যের জন্য এতদিন তোমাদিগকে শুকাইয়া রাখিতে হইয়াছিল। তবে বেশী কষ্ট এই যে, তোমাদের জন্য এই সোণার পুতুলগুলিকেও কষ্ট দিতে হইল। তা কি করি বোন, তাহার কোন চারা ছিল না। এরূপ না করিলে তোমাদের আরও গুরুতর অমঙ্গল হইত। সেই অশুভ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তোমাদিগকে কষ্ট দিতে হইয়াছে। ছোট বোনটি আমার, তাহাতে রাগ করিও না।" এই বলিয়া তাঁহার চিবুক ধরিয়া ধূমাবতী ধূমপ্রভাকে আদর করিতে লাগিলেন। সেই দিন এই পর্য্যন্তই রহিল। আর বলিয়া গেলেন, বোন আমি খবর পাইয়াছি, নরনাথ অনেক শুধরাইয়াছে।

সেই দিন হইতেই প্রায় রোজ ধূমাবতী তাঁহার সহোদরা ভগিনী

ধূমপ্রভাকে দেখিতে যাইত তাহার খবর লইত, আর সময়ে সময়ে অর্থ সাহায্যও করিত। ভোলানাথও নরনাথের খবর লইত, আর পিতাকে বলিত, নরনাথ ত আমার স্নেহের সহোদর, এতদিন কঠোর হইয়া দেখিলাম; এখন কোমল হইয়া দেখি, ওর বেশী উপকার করিতে পারি কি না। আপনার মার পেটের ভাই—যেমন করিয়া পারি, উহাকে সৎপথে আনিতেই হইবে।

পিতা রাধানাথও নরনাথের প্রতি ভোলানাথের এরূপ ব্যবহার দেখিয়া, একেবারে সন্তোষরসে গলিয়া গেলেন, আর মনে মনে বলিতে লাগিলেন, কত জন্ম-জন্মান্তের তপস্যা করিলে তবে এমন সৎপুত্র জন্মে।

এইরূপ ভাবে প্রায় দুইমাস কাটিয়া গেল। দুইমাস ভোলানাথ নরনাথ ও তাহার স্ত্রী ও কন্যাগণের প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ধূমাবতীও ধূমপ্রভা আর তাহার কন্যাগণকে খুব যত্ন করিতে লাগিলেন। নরনাথ ও ধূমপ্রভার এই দুই মাস খুব সুখে কাটিয়া গেল। একদিন দ্বিপ্রহরে ধূমাবতী ধূমপ্রভার নিকট আসিয়া উপস্থিত। পেট কাপড় হইতে একজোড়া সোণার বালা বাহির করিয়া ধূমপ্রভার হাতে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, বোন, এতদিন তোমাকে কিছু দিতে পারি নাই, মনে কিছু করিও না, তোমার ভালোর জন্যই তোমাকে পূর্ব্বে কিছুই দিই নাই।

তাহার পর কথাচ্ছলে বলিলেন, দেখ্ প্রভা, আমি শুনিতেছি, আমাদের গর্ভধারিণী জননীর বিশেষ কষ্ট হইতেছে। আমাদের কর্ত্তব্যহীন ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহার অর্থ লইতেছে; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার কোনরূপই সেবা করিতেছে না, তাঁহাকে নানারূপ জ্বালা যন্ত্রণা দিতেছে। মাতা আমার প্রতি অন্যায়রূপে বিরূপ, তা না হইলে আমি নিজে গিয়াই তাঁহাকে লইয়া

আসিতাম। কিন্তু মাতার প্রতি তোমার ত একটা কর্ত্তব্য আছে, তুমি গিয়া মাতাকে লইয়া আইস। সহজে না আসেন, ছলে বলে কৌশলে লইয়া আইস। "উদ্দেশ্য মহান্ হইলে, উদ্দেশ্য সাধনের উপায় খুব প্রশস্ত না হইলেও তাহা গ্রহণীয়।" তুমি এ বিষয়ে বেশ করিয়া বিবেচনা কর; আর নরনাথকে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে বল। তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর, তাহাই করিও। অর্থ ব্যয় করিতে আমি রাজি আছি, যত টাকা লাগে আমি দিব। তবে মাতার দুঃখ মোচন করিতেই হইবে, তাহা না করিলে আমার জীবনে শান্তি পাইবে না।

ইহার কয়েক দিবস পরে নরনাথ ও ধূমপ্রভা মাতার কাছে আসিলেন। আসিয়া তাঁহাকে কিছু টাকা দিয়া গেলেন, আর বলিয়া গেলেন, কিছুদিন পরে আবার আসিবেন। বিন্ধ্যাচল যে অতি পবিত্র ও মনোরম, স্থান আর সেখানে সর্ব্ববিষয়ে সুখ, সেই কথা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া, মাতাকে বুঝাইয়া দিয়া গেলেন। বিন্ধ্যাচলে গিয়া দুইখানি পত্রও মাতাকে লিখিলেন; আর তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী যে মাতার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন, তাহা তাঁহাকে জানাইয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে ধূমাবতী ও ধূমপ্রভা দুই ভগিনী ও নরনাথ কলিকাতায় আসিলেন। ভোলানাথ বিলাত হইতে যে দ্বাদশটি বহুরূপীর পোষাক আনিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের পরচুলা ও মুখোস্। ধূমাবতী সেই মুখোস ও পরচুলা পরিয়া আসিলেন। তিনি নরনাথ ও ধূমপ্রভাকে বুঝাইয়াছিলেন মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে দেখিলে রাগান্বিতা হইতে পারেন। সেইজন্য তিনি এইরূপ পোষাক করিয়া আসিয়াছেন। ধূমপ্রভা তাহাকে মাতাজী বলিয়া সম্বোধন করিবেন, আর কেহ জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় দিবেন যে তিনি সন্ন্যাসিনী, পৃথিবীর উপকারের জন্য সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। নরনাথ মাতাজীর

বেশে ধূমাবতীকে দেখিয়া একেবারে হাসিয়া আকুল। বলিলেন, জমকাল মাতাজী বটে, সংসারে একেবারে বীতরাগিনী।

তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া ভোলানাথের বাসায় উঠিলেন। হরেন তাঁহাদের থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। নরনাথ ও ধূমপ্রভা নারীসুন্দরীর বাটীতে গিয়া উঠিলেন ; ও দেখাশুনার পর তাঁহাকে বলিলেন কাশীধামে শীঘ্র অন্নকূট পর্ব্ব হইবে, কাশীধাম বিন্ধ্যাচল হইতে খুব সন্নিকট। এইবার তাঁহারা তাঁহাকে অন্নকূট পর্ব্বে বিন্ধ্যাচলে লইয়া যাইবেন। তাঁহাদের এক তপস্বিনী সঙ্গিনী আছেন ; তিনি কলিকাতা হইতে তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন এবং কাশীধাম, বিন্ধ্যাচলধাম ও অপরাপর নিকটবর্ত্তী তীর্থসকল দেখাইয়া আনিতে স্বীকার করিয়াছেন।

পরদিন প্রত্যূষে নরনাথ, ধূমপ্রভা ও নারীসুন্দরী কালীমাতা দর্শন করিতে বাহির হইলেন। সেখান হইতে তিনজনে ভোলানাথের বাসা হইতে মাতজীকে তুলিয়া লইলেন, এবং কালীঘাটের দিকে চলিলেন। কালীঘাটধামে পূজা-আদি করিয়া প্রসাদ পাইয়া হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত। সেখান হইতে চারিজন কাশীধামে রওনা হইলেন। ভোলানাথ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, নারীসুন্দরীকে আপাততঃ বিন্ধ্যাচলে আনিবেন না, কাশীধামে একটি বাটী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। নরনাথ, নারীসুন্দরী ও তাহার দুইকন্যা সেই বাটীতে আসিয়া উঠিলেন এবং খুব ধূমধামে বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা ও অন্যান্য দেবদেবী আদি দর্শন ও পূজা করিলেন। পনর ষোল দিন পরেই নারীসুন্দরী বুঝিতে পারিলেন যে এত আদর অভ্যর্থনার মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি নজর বন্দিনী। মাতাজী এখনও আসেন ও তাঁহার তত্ত্ব লয়েন, আদর অভ্যর্থনাও করেন।

একমাস কাশীধামে বাস করিবার পর একদিন গ্রহকুমার আসিয়া ইহাদের সকলকে কাশীধাম হইতে দশ ক্রোশ দূরে লইয়া গেলেন। গ্রহ-

কুমারও সেইখানেই রহিয়া গেলেন। তাঁহাদের ভোজনাদি খুব ভাল ভাবেই চলিতে লাগিল। ভাল খাবাবের কোন অভাবটি নাই ;—উত্তম উত্তম মিষ্টান্ন, প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত, দুগ্ধ, ছানা, নবনী, টাটকা ফল মূল, তরিতরকারী শাকসব্জী—এসমস্ত প্রচুর ও পর্য্যাপ্ত। প্রত্যহ পায়সান্নের বন্দোবস্ত। তবে এই সমস্ত সুবিধার ভিতর হইতেও নারীসুন্দরী অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তিনি বন্দিনী।

একদিন ভোলানাথ, ধূমাবতী ও তাঁহার কন্যা, নারীসুন্দরী যে বাটীতে থাকেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। তিন জনেই তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও যদি কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, সেইজন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

ধূমাবতী বলিলেন, মা, আমি ত তোমারই কন্যা, বরং সর্ব্বপ্রথমা। যদি আমরা দিদিমার কিছু খাইয়া থাকি, সে ত তোমারই কন্যা ও জামাতা খাইয়াছে, অপর লোক ত কেহ খায় নাই। আপনি আসিয়া বিন্ধ্যাচল-ধামে বাস করুন, আপনার পিণ্ডাধিকারী রাহুরাম ও আমরা আপনাকে দেখিব ও আপনার সেবা করিব। সেইদিন এইরূপ কথাবার্ত্তার পর ভোলানাথ, ধূমাবতী ও তাঁহার কন্যা চলিয়া গেলেন। মাতাজী কিন্তু রোজ আসেন আর খবর লয়েন ; তবে এখন আর তীর্থ দর্শনের কথা বলেন না।

এ সব দেখিয়া শুনিয়া নারীসুন্দরীর ঘোর সন্দেহ হইল যে, ভোলানাথ ও ধূমাবতী ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে এইখানে আনিয়াছে, উদ্দেশ্য ডিক্রীর টাকা ফাঁকি দেওয়া। এই ঘোর সন্দেহের পর তিনি একবার কলি-কাতায় যাইবার প্রস্তাব করিলেন ; কিন্তু নরনাথ, ধূমপ্রভা ও মাতাজী কেহই তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। বরং বারবার বলিলেন, কলিকাতা অতিশয় অধর্ম্মের স্থান,—সে নরক বিশেষ,—তিনি কেন

সেথায় যাইতে চাহিতেছেন। এ স্থান কাশীধামের অতি সন্নিকটে। কিছুদিন এ স্থানে থাকিয়া, নরনাথ, ধূমপ্রভা ও তাঁহার শরীর একটু ভাল হইলে তাঁহারা সকলে গিয়া সেই পরম পবিত্র তীর্থস্থান বিন্ধ্যাচলে বাস করিবেন; তাহা হইলে তাঁহাদের ইহকাল পরকাল দুই কালেরই মঙ্গল হইবে।

পূর্ব্বে যদি নারীসুন্দরীর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল, এখন তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল। তিনি এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে বন্দিনী। কিন্তু এখন তাহার উপায় কি? মা অন্নপূর্ণা, এ কি করিলে! তোমার এ কি খেলা মা!

প্রায় গত একমাস হইতে মাতাজী আসিয়া অর্থের অসার্থকতা, জীবনের নশ্বরতা, ধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে প্রায়ই কথকতা করিতে লাগিলেন। ক্ষমা অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই, শত্রুকে ক্ষমাগুণে বশ করিবে, দয়াগুণে জয় করিবে—অস্ত্রে নয়, বলে নয়।

একদিন প্রাতঃকালে আসিয়া মাতাজী নারীসুন্দরীকে বলিতে লাগিলেন, দেখুন, গতকল্য রাত্রে আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি; তাহা অতি অদ্ভুত। আপনি কি আপনার এক পরমাত্মীয়ের উপর নালিশ রুজু করিয়াছিলেন, তাহার নামে ডিক্রী পাইয়াছেন? গতকল্য খুব গভীর রাত্রে মা ভৈরবী আসিয়া আমার কাছে উপস্থিত। বলা বাহুল্য, সকল জাগ্রত দেবদেবীই আমাকে দর্শন দেন; আর পৃথিবীর ভার হরণের মানসে আমার কাছে আসিয়া হুকুম জারি করেন। মা ভৈরবী আসিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে আমাকে বলিলেন, মাতাজি, তোর ঘোর বিপদ, তোর এক প্রিয়তমা শিষ্যা আমার হাতার বিশ ক্রোশের মধ্যে বাস করিতেছে। সে আমার পূজা না করিয়া অর্থের পূজা করিতেছে। সে বিন্ধ্যাচলবাসী আমার এক প্রিয় শিষ্যের নামে আদালতে ডিক্রী করিয়া রাখিয়াছে। তুচ্ছ এক লক্ষ টাকার ডিক্রী মায় খরচা, সে যদি তিন দিনের মধ্যে এই ডিক্রী

ছাড়িয়া না দেয়, তবে আমি তাহাকে সপরিবারে ধ্বংস করিব ; আর তাহারও পরকালে ঘোর দুর্গতি করিব। সেই কথা শুনিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাই আজ অতি প্রত্যুষে তোমাকে দেখিতে আসিলাম, আর জানিতে আসিলাম এ কথা সত্য কি না। যদি সত্য হয় ত, ডিক্রীর টাকা আপনার খাতককে ছাড়িয়া দিন।

নারীসুন্দরী সমস্তই শুনিলেন, আর উত্তর দিলেন, মাতাজি, যে স্থানে আমি রহিয়াছি, ইহা অতি পবিত্র তীর্থস্থান। কাশীধামের বিশক্রোশের মধ্যে—এই স্থানে থাকিয়া সকল অনর্থের মূল অর্থ সম্বন্ধে কোন কথা কহিব না বা কোন বিষয় কার্য্য করিব না। অতএব আপনি আমাকে ধর্ম্মের কথা যা হয় বলুন, সাংসারিক টাকা পয়সার কথা এখানে আমাকে বলিবেন না। আমি যখন কলিকাতা ছাড়িয়া আসি, তখনই পূত সলিলা গঙ্গার পূর্ব্বপারে বিষয় বিভবের কথা পুঁতিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, কলিকাতায় যাইয়া আবার অর্থ অনর্থের ভাবনা পুনরায় ভাবিব, এ পুণ্যধামে নয়।

এই রকম চারিটি ছোট ছোট টোপ ফেলিয়া ভোলানাথ বুঝিতে পারিলেন, নারীসুন্দরী স্বেচ্ছায় ডিক্রীর টাকা ছাড়িয়া দিবেন না। তখন তিনি গ্রহকুমারের সহিত পরামর্শ করিয়া কয়েকজন গুণীলোকের সাহায্যে একখানি রিলিজ বা ফারখত পত্র প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে, নারীসুন্দরী তাঁহার ডিক্রীর সমস্ত টাকা মায় খরচা তাঁহার প্রতিবাদী ভোলানাথের কাছ হইতে বুঝিয়া পাইয়াছেন, তাঁহার আর এক পয়সাও পাওনা নাই। এই দলিলে সাক্ষী—এলাহাবাদের উকিল শুকপ্রসাদ, গ্রহকুমার ও নরনাথ। এই দলিল প্রস্তুতের পর ভোলানাথ মহামান্য হাইকোর্টে এই দলিল দাখিল করিলেন, হাইকোর্ট হইতে নোটিস বাহির হইল।

এদিকে নারীসুন্দরীর পুত্রগণ মাতার উদ্ধারার্থ মাতার হাজিরি পরোয়ানা বাহির করিল; এবং বিন্ধ্যাচল পুলিশের সাহায্যে নারীসুন্দরীর অনেক তাল্লাস করিল; কিন্তু কোন ফল হইল না; নারীসুন্দরীর কোন খবরই পাওয়া গেল না।

ভোলানাথ, তাঁহার শ্যালকেরা যাহা কিছু পয়রারি করিতেছে, হরেনের মারফৎ তাহার সমস্ত খবরই রাখিতেছেন। যখন তিনি দেখিলেন, তাঁহার শ্যাককেরা বিশেষ তদবীর করিতেছে, তখন হইতে তিনি নারীসুন্দরীর উপর আরও জোর পাহারা রাখিয়া দিলেন। আর যেমন খবর পাইলেন নারীসুন্দরী গোপনে তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন, অমনি তিনি আরও সতর্ক হইলেন—আরও লোক রাখিয়া দিলেন। আর দুই এক দিন অন্তর তাঁহাকে এক মহাল্লা হইতে অপর মহাল্লায় স্থানান্তরিত করিতে লাগিলেন।

যে বাটীতে নারীসুন্দরী থাকেন, সে বাটীর বহির্দ্বারে বাহির হইতে চাবী দেওয়া থাকে, পার্শ্বের বাটীর দ্বার দিয়া এই বাটীতে আনাগোনা হয়। কখন কখন তিনি, তিন চারিটি বাটী লয়েন, পাশাপাশি তিন খানি বাটীর বহির্দ্বারে বাহির হইতে কুলুপ দেওয়া, খালি সর্ব্বশেষের বাটীর দরজা খোলা। সেই দরজা দিয়া আসিয়া সর্ব্বপ্রথম বাটীতে আসিতে হয়। তাহাতে, যাহারা সন্ধান জানে, তাহারা ব্যতিরেকে অন্য লোক আসিতে পারে না। নারীসুন্দরী এইরূপ বন্দী ভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ের ব্যবধানে নারীসুন্দরী তাঁহার পুত্রদের দুর্ব্যবহার সব ভুলিয়া গিয়াছেন, বাধা পাইয়া তাঁহার অপত্য-স্নেহ আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কেবল নিজের উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাঘিনী যেন পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া বহির্গত হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তিনি বাহিরে আসিবার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত রহিলেন।

চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। তবে যতদিন না ঠিক সময়ে চেষ্টা হয়, ততদিন চেষ্টাতে মানুষ সফল হয় না। উপযুক্ত সময় না হইলে যথেষ্ট চেষ্টাতেও কোন ফল হয় না। রোগই বল আর অপর বিপদই বল, ভোগের সময় পূর্ণ না হইলে, তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। ঠিক সময় আসিলে অল্প চেষ্টাতেই কার্য্য সফল হয়।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

"অর্থকৃচ্ছ্রতায় সুহৃদ্ ভেদ"

গ্রহকুমার ও তাহার বন্ধুরা এতদিন ভোলানাথের বন্ধু ছিল। ভোলানাথের মারফৎ তাহাদের অর্থ সমাগম হইতেছিল, তাহারাও ভোলানাথের সর্ব্ববিষয়ে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল। ভোলানাথ নারীসুন্দরীকে তাঁহার কবলে আনিবার পর, তাঁহার বন্ধুদিগের জন্য অধিক অর্থব্যয় ব্যয়বাহুল্য মনে করিলেন। তিনি ভাবি-লেন, গ্রহকুমার আদির দ্বারা যে কার্য্য হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে, তবে তাহাদের জন্য আর ব্যয়বাহুল্যেরই বা প্রয়োজন কি? তিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা ত অর্থের জন্যই গ্রহকুমার ও তাহার বন্ধুরা তাঁহার সাহায্য করিয়াছে সেই অর্থাগমের জন্যই। তবে সেই পাপলব্ধ অর্থের অধিকাংশই তাঁহার পাপকার্য্যের সহযোগীরা খাইয়া ফেলিবে, তাহাতে তাঁহার কি লাভ হইল? তিনি পাঁক মাখিবেন, আর মাছ খাইবে অপরে? ইহা হইতেই পারে না। আর নারীসুন্দরী যখন আজ তিনমাস তাঁহার হাতের ভিতর, তখন ত কার্য্য ফতে। তবে তিনি গ্রহকুমারের জুলুমে বাধ্য হইবেন কেন? তিনি তাহাকে আর চৌথ দিবেন না, গ্রহকুমারের সাহায্যেরও আর বিশেষ প্রয়োজন নাই। যতদিন জমিতে চাষ দিতে হয়, বীজ পুঁতিতে হয়, ফসল আগলাইতে হয়, কাটিতে হয়, বাটীতে আনিতে হয় ততদিন অপরের সাহায্যের প্রয়োজন; শস্য কাটা হইয়া নিজের মরা'য়ে উঠিলে, জনের

আর প্রয়োজন কি? গ্রহকুমার ও তাহার বন্ধুদের আর টাকা দিতে ভোলানাথ রাজি নন, তিনি একেবারেই হাত গুটাইলেন।

গ্রহকুমার এণ্ড কোং দেখিলেন যে, ভোলানাথ ফসল খামারে তুলিয়াছেন,—আর অধিক দিন তিনি তাহাদের হাতে থাকিবেন না। তিনি ফসল কুড়াইতেছেন, এই তাহাদের শেষ মরসুম; এখন ছাড়িয়া দিলে ভবিষ্যতে তাহাদের সব আশা ভরসা নষ্ট হইবে।

গ্রহকুমার এণ্ড কোং স্নেহ, দয়া, করুণা, ভালবাসা—এ সব মানসিক দৌর্ব্বল্যের ধার ধারে না; তাহারা মনোবৃত্তি লইয়া কার্য্য করে না। সেগুলি খেলার সামগ্রী। যখন কার্য্য নাই—খেলার সময়, তখন মনোবৃত্তি লইয়া তাহারা খেলা করে; কিন্তু কার্য্যের সময়ে মনোবৃত্তি-গুলিকে তাহাদের কাজের অন্তরায় হইতে দেয় না।

খটখটে, টকটকে কার্য্যময় জগতে তাহারা কার্য্য করে। তুমি টাকা দাও, তাহারা তোমার সাহায্য করিবে। তুমি যদি টাকা বন্ধ কর, তোমার অপর পক্ষ যদি টাকা দেয়, তাহারা তাহাদের সাহায্য করিবে। তাহারা ভালবাসার ধার ধারে না, টাকার ধার ধারে। তাহারা দয়া, দাক্ষিণ্য, করুণা ইত্যাদি মনোদৌর্ব্বল্যের ধার ত ধারেই না। তাহারা শয়তানের চেলা, শয়তানকে আত্মবিক্রয় করিয়াছে; মানুষকে আত্ম-বিক্রয় করে না। যত দিন তুমি তাহাদিগকে পয়সা দিবে, ততদিন তাহারা তোমার কার্য্য করিবে। তুমি পয়সা বন্ধ কর, তাহারাও সহযোগিতা বন্ধ করিবে, একেবারেই অসহযোগিতা গ্রহণ করিবে।

তুমি তোমার আত্মীয়ের সর্ব্বনাশে নিয়োজিত,—উদ্দেশ্য অর্থলাভ। তুমি মনুষ্যসমাজের শত্রুতাসাধন করিবে,—উদ্দেশ্য পাপ-ধন-লাভ, তোমার স্বার্থ আছে তাই তুমি এই পাপকার্য্যে রত। অপরে তোমার এই পাপকার্য্যের সহযোগিতা করিবে কিসের জন্য? অবশ্যই সকল

কুকর্ম্মই অর্থের জন্য। তুমি অর্থ প্রদান বন্ধ করিবে, তাহারাও তোমার সহিত কুকার্য্যের সহযোগিতা বন্ধ করিবে। তোমার সহিত তাহাদের ত কোন রক্তের সম্বন্ধ নাই, কোন আত্মীয়তা নাই, কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। তুমি তোমার আত্মীয়ের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত, আর গ্রহকুমার তোমার পিতা নয় ভ্রাতা নয়, নিকট আত্মীয় নয়,—সে তোমার নিকট বা দূর আত্মীয়ের প্রতি পাপকার্য্যের সহায়তা কেন করিবে? করিতে পারে শুধু পাপ অর্থ লোভে। যতদিন অর্থদান, ততদিন সহযোগিতা; অর্থদান বন্ধ, সহযোগিতাও শেষ।

ভোলানাথের এ বিষয়ে দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। তিনি বীজ পুঁতিয়াছেন, ফসল সংগ্রহ করিবেন। তেঁতুল গাছ পুঁতিয়া আম ফলের আশা করা দুরাশামাত্র। কামরাঙ্গা গাছ পুঁতিয়া আনারস কাটিতে আশা করিতে পার না। তুমি লোকের সর্ব্বনাশ করিবে, আর লোক তোমার মঙ্গল করিবে,—তোমার এ আশা দুরাশামাত্র। লোকে যখন পাপকার্য্যর সহায়তা করে,—তোমার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ভালবাসার জন্য নয়, তোমার অর্থের বখ্‌রার জন্য।

যখন লোকে "কবে ম'রেছে মেশো" বলিয়া তোমার চৌর্য্য-বৃত্তির জিনিসগুলির খাটে কাঁধ দেয়, তখন তোমার জন্য নয়, তোমার চোরাই মালের বখ্‌রার জন্য। এই সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র গল্প আছে।

তিন জন চোর মিলিয়া একটি গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি করিয়া তৈজস-পত্রাদি লইয়া পলাইতেছিল। তাহারা একখানা খাটিয়াও সেই সঙ্গে চুরি করে। সেই খাটিয়ার উপর তৈজসপত্রাদি রাখিয়া একখানি চোরাই চাদর ঐ তৈজসপত্রের উপর ঢাকা দিয়া তিনজনে খাটিয়াখানি কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছিল। যাইবার সময় "বাপ ম'লরে বাপ" বলিয়া

চাপা স্বরে চীৎকার করিতে করিতে যাইতেছিল। এক বেটা পুরাতন চোর খুব ভোরে মাঠে শৌচকার্য্যের জন্য বসিয়াছে, এমন সময় ঐ তিনজন চোর বামাল সমেত খাটিয়া লইয়া যাইতেছে, আর মুখে বলিতেছে "বাপ ম'লরে বাপ"! একটা পিতলের গাড়ুর মুখটা চাদর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পুরাতন চোরটা ঐ গাড়ুর মুখ দেখিয়া সমস্ত ব্যাপারই বুঝিতে পারিল; এবং ঐ তিনজন চোরকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "গাড়ুর মুখটা ঢাক।" চোর তিনজন উহার কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিল, এ বেটা একজন পুরাতন চোর, বিশেষ গুণী লোক। তখন তাহারা বুঝিল, এ বেটাকে বখরা না দিলে সব গোল করিয়া দিবে,—আমরা ধরা পড়িব, আর সব বামালই যাইবে। তখন তাহারা একটু পরামর্শ করিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "ভাগ নেবে ত এস।" এই মধুর আহ্বান শুনিয়া পুরাতন চোর বেটা তাড়াতাড়ি শৌচকার্য্য সম্পন্ন করিয়া কোমরের কাপড় সামলাইতে সামলাইতে ঐ স্থানে আসিয়া ঐ খাটিয়ার খালি পায়াটিতে কাঁধ দিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "কবে ম'রেছে মেসো, ওগো, কবে ম'রেছে মেসো।"

অনেক সময়ে যখন একজন বাহিরের লোক তোমার অসৎ কার্য্যের সহায়তা করে, তখন নিশ্চয় জানিবে ঐ চোরাই গাড়ুর বখরার জন্য। অতএব অসৎ কার্য্যের সহযোগীকে কখনও বিশ্বাস করিও না। তুমি তোমার আত্মীয়ের প্রতি, বন্ধু বান্ধবের প্রতি, বিশ্বাসঘাতকা করিয়াছ বা প্রতারণা করিতেছ; তোমার দুষ্কর্ম্মের সহযোগীরাও সময় পাইলেই তোমার প্রতি সেইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। যেমন পুঁতিবে, তেমনি ফলিবে,—নিছক লাভ পাঁক মাখা।

গ্রহকুমার এণ্ড কোং যখন দেখিল, ভোলানাথ হাত গুটাইয়াছেন,

তখন তাহারা নূতন সহযোগী খুঁজিতে লাগিল; এবং সন্ধান লইয়া নারীসুন্দরীর কনিষ্ঠ পুত্র রামরামের সহিত সাক্ষাৎ করিল; এবং তাহার সহিত নিম্নলিখিত ভাবে কথাবার্ত্তা হইল।

গ্রহকুমার। আমার নাম গ্রহকুমার, কাশীধামের একজন অধিবাসী। কাশীধামে আমাদের বংশের বিশেষ খাতির। আমার পিতামহকে সকলেই চেনে ও মান্য করে। আপনার ভগিনীপতি ভোলানাথ বাবুর সহিত আমার আজ প্রায় দশ বার বৎসরের বন্ধুত্ব। আমি যতদূর সম্ভব তাঁহার সাহায্য করিয়া আসিয়াছি। আমি পূর্ব্বে ভিতরকার কথা জানিতাম না, তাই তাঁহার বরাবর সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছি। এখন দেখিতেছি, তিনি ভাল কাজ করেন নাই। বিশেষ অধুনা তাঁহার দুষ্কর্ম্মের মাত্রা বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমি ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপের সহায়তা কেন করিব। তাই মনে করিয়াছি, আপনাদের প্রতি তিনি যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছেন, যতদূর সম্ভব তাহার প্রতিবিধান করিব। আর সেই মনে করিয়াই এখানে আসিয়াছি।

রামরাম। আপনার সদুদ্দেশ্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। দেখুন, ভোলানাথ বাবু আমার নিকট আত্মীয় হইয়া আমাদের অনেক দিন ধরিয়া শত্রুতা করিয়াছেন। তিনি দুশ্চরিত্র হইলেও বুদ্ধিমান্, অর্থবান্। বুদ্ধি আর অর্থ হেতু অনেক লোকজন তাঁহার হাতে। তাই আমরা আমাদের বিপদ হইতে উদ্ধার পাই নাই। আপনারা যদি সাহায্য করেন ত এই গরীব পরিবারের অনেক উপকার হয়। দেখুন, সে আপনাদের দয়া।

গ্রহকুমার। দেখুন, শুধু কথায় চিড়ে ভিজে না। শুধু দয়া বলিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না।

আপনি নিতান্ত অল্পবয়স্ক, আপনার সহিত প্রতারণা করিব না। আপনি যদি আমাদের দয়া চান, তাহা কিনিতে হইবে; আমাদের সহযোগিতা চান তাহাও কিনিতে হইবে। আপনাদের পক্ষ আমি যতদূর বুঝিয়াছি ধর্ম্মপক্ষ, সেইজন্য স্বল্পমূল্যে আমাদের দয়া বা সহযোগিতা কিনিতে পারেন। অধর্ম্মপক্ষে যোগ দিলে যত মূল্য চাহিতাম, ধর্ম্মপক্ষ বলিয়া অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে সাহায্য করিব। বিশেষতঃ অবস্থা বিশেষে আমরাও স্বল্পমূল্যে, এমন কি যৎসামান্য কাঞ্চনমূল্যে সহযোগিতা বেচিয়া থাকি। এরূপ করিলেও আমরা মানুষ, আর মানুষ বলিয়াই আমরা সময়ে সময়ে মনোবৃত্তির কম বেশী দাসত্ব করি। সে আমাদের দোষ নয়, আমাদের মনুষ্য জন্মের দোষ। ভগবান্ যখন আমাদিগকে এ জগতে পাঠাইয়াছেন, তখন মনুষ্যজনিত মনোবৃত্তিগুলি কাড়িয়া লইয়া পাঠান নাই। ফলে সময়ে সময়ে আমরা মানসিক দৌর্ব্বল্যের অধীন হই, দয়া করি, মায়া করি, ভালবাসি ও করুণা করি।

রামরাম। মহাশয় যখন ভোলানাথের এতদিনের বন্ধু, তখন আমাদের আসল হাল আপনি অবশ্য জানেন। আমাদের ভগ্নীপতির দয়াতে আমরা একেবারে নিঃস্ব, তবে কিছু সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা আছে, সেগুলি উদ্ধার হইলে আপনাকে কিছু দিব।

গ্রহকুমার। মহাশয়, আপনি বিশেষ ভুল বুঝিয়াছেন। আমি একা আপনার বিশেষ উপকার করিতে পারিব না। আমার দলে আরও অনেক লোক আছে, তাহারা সুবিধামত দাম লইয়া পরের উপকার করিয়া থাকে। আমরা ভবিষ্যৎ আশায় কোন কার্য্য করিব না। নগদ কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য নিশ্চয়ই চাই, যদি তাহা দিতে রাজি না হয়েন তবে বেশী কথার প্রয়োজন নাই।

রামরাম। তা যৎকিঞ্চিৎ পাইয়া আপনারা সন্তুষ্ট হইলে আমি

না হয় যোগাড় করিয়া মোকর্দ্দমা-খরচার ন্যায্য হিসাবে ব্যয় করিব; তবে আপনারা যদি মজুরি পাইয়া কার্য্য না করেন?

গ্রহকুমার। রামরাম বাবু, আমরা আর যাহাই হই, নিমকহারাম নই। আমরা নুন খাইয়া বেইমান হই না। আমরা আপনার দলে আসিবার পূর্ব্বে ভোলানাথকে আমাদের দামের জন্য বলিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, আমাদের পাপ-সহযোগিতার মজুরি দিন। তিনি দিলেন না, তাই আপনাদের তরফে আসিয়াছি। তিনি উচিত মূল্য কিম্বা কিঞ্চিৎ স্বল্পমূল্য দিলেও আপনার দলে আসিতাম না। আর দেখুন, আমরা অধিক শিক্ষিত, বিশেষ উচ্চদরের ভদ্রলোক নই, যে দাম লইব কাজ করিব না। আমরা নগদা মুটে; পয়সা নি আর মোট ফেলি।

রামরাম। আপনাদের যে টাকা দিব, তাহাতে বিশেষ কি উপকার হইতে পারে? আদালতে ত পুনরায় টাকা খরচ করিতে হইবে।

গ্রহকুমার। আমাদের সাহায্য ব্যতিরেকে আদালত আপনাদের কি সাযায্য করিবে? ইংরাজরাজের যে আইন তাহা প্রমাণের উপর স্থাপিত। প্রমাণ করিতে পারিলে তবে ত আইনের সাহায্য পাইবেন। আইন বাঁধাধরা; "দুই আর দুয়ে চারি হয়" এইরূপ ধ্রুবসত্য নাই হউক, কতকটা সেইরূপ। প্রমাণ আপনাকে যোগাড় করিতে হইবে, আমরা প্রমাণের দ্বারা আপনার সাহায্য করিব। প্রমাণ বিনা বিচারকের হাত পা বাঁধা। তিনি বলিবেন আপনার মামলা প্রমাণ হইল না। বিচারক কিরূপে আপনার সাহায্য করিবে। দেবতা যেমন সর্ব্বজ্ঞ, বিচারক ত সেরূপ নহে। মানুষের বিচার সত্যের উপর নয়, প্রমাণের উপর। অথণ্ড প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারিলে মনুষ্য-ধর্ম্মাধিকরণে জয় হয়, তা আপনার মামলা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক। দেখুন, সকলে যদি সত্যবাদী হয়, তবে বিচারও নির্ভুল হয়। প্রথমে, মানুষ সকল অবস্থায়

সত্যবাদী নয়; দ্বিতীয়তঃ, যে আপনার মামলার সমস্ত বিষয় জানে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা বড় কষ্টকর।

অনেক কথাবার্ত্তার পর এই স্থিরীকৃত হইল যে রামরাম, গ্রহকুমার ও কোংকে এক হাজার টাকা দিবে; আর তাহারাও প্রাণপণে তাহার সাহায্য করিবে।

গ্রহকুমার। দেখুন রামরামবাবু, ভোলানাথ যদি আমাদের সঙ্গে বেইমানি না ক'রিত তবে আমরা এত সস্তায় আপনার কার্য্য করিতাম না। তাহার বেইমানির জন্য আমরা ভোলানাথের উপর রাগান্বিত হইয়াছি; সেইজন্য এত সস্তায় আপনার কার্য্য আমরা করিতেছি। আর ইহাও বেশ জানিবেন, আমরা মনের সহিত কার্য্য করিয়া আপনার বিশেষ উপকার করিব; নইলে আপনি গ্রহকুমারকে, সর্ব্বাপেক্ষা যে বেশী ভৎর্সনা, বেইমান বলিয়া গালি দিবেন। আমরা যাই হই না কেন, কখনও বেইমান নহি। বেইমানি জানি না, তবে কেহ যদি আমাদিগের সহিত বেইমানি করে আমরাও তাহার উত্তর গাহি।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

"ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে"

গ্রহকুমার ও তাহাদের সঙ্গিগণের সাহায্যে নারীসুন্দরীর খোঁজ হইল এবং আদালতের সাহায্যে নারীসুন্দরীর উদ্ধার হইল। বিচারকের সম্মুখে নারীসুন্দরী এজাহার করিলেন, ভোলানাথ প্রতারণা করিয়া অপরের সহিত যোগসাজসে তাঁহাকে কলিকাতা হইতে লইয়া যায়। তবে তিনি নরনাথের ও ধূমপ্রভার নাম করিলেন না; আর সে সম্বন্ধে তাঁহাকে কেহই বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করে নাই।

ভোলানাথ আদালতে যে ডিক্রীর টাকা জাল রোকশোধ দলিল দাখিল করিয়াছিল, গ্রহকুমার তাহা জানিত; সে তাহার সাক্ষী ছিল। রামরাম ও তাহার ভ্রাতারা তাহাদের মাতাঠাকুরাণীকে দিয়া দরখাস্ত করাইল যে, ভোলানাথ একখানি জাল দলিল দাখিল করিয়াছে, সে দলিলে তিনি কখনও সহি করেন নাই। আর তাহার কথা কিছু তিনি জানেন না। তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তিনি একটি পয়সাও পান নাই।

এই দরখাস্তের পর ভোলানাথের উপর নোটিশ জারি হইল। যখন ভোলানাথ দেখিলেন, গ্রহকুমার তাহার বিপক্ষে আর নরনাথ ও ধূমপ্রভা তাহাকে সাহায্য করিতে বিশেষ উৎসুক নয়, তখন তিনি বুদ্ধিমানের ন্যায় মোকর্দ্দমা লড়িবার আশা ছাড়িয়া দিলেন, আর মামলা লড়িলেন না।

গ্রহকুমার এফিডেবিট করিলেন—যখন তিনি ডিক্রীর পূরা টাকা

প্রাপ্তিস্বীকার দলিল সহি করেন, তখন ভোলানাথ তাঁহার সম্মুখে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে হাজির করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তিনিই নারীসুন্দরী। কিন্তু এখন তিনি প্রকৃত নারীসুন্দরীকে দেখিয়াছেন, আর তিনি শপথ করিয়া বলিতেছেন, যে স্ত্রীলোকটি নারীসুন্দরী বলিয়া দলিল সহি করেন, সে নারীসুন্দরী রামরাম আদির মাতা নারীসুন্দরী নন।

আর এক সাক্ষী নরনাথ। তিনি এফিডেবিট করিলেন—তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভোলানাথের কথায় বিশ্বাস করিয়া দলিল সহি করেন, তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে তিনি সহি করিতে দেখেন নাই।

নারীসুন্দরী নিজে হলপান জবানবন্দীতে বলিলেন যে, তিনি ডিক্রীর এক পয়সা পান নাই, দলিলও তিনি সহি করেন নাই; দলিল সম্পূর্ণ জাল।

ডিক্রীর পূরা টাকার জারির হুকুম হইল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মামলার কাগজ পত্র সবই হাইকোর্টের সরকারী উকিলের কাছে প্রেরিত হইল। এই হুকুম হইল যে, কাগজপত্র দেখিয়া যদি উকিল বাহাদুর দেখেন, বিশেষ প্রমাণ আছে, তবে ভোলানাথের নামে জাল দলিল ব্যবহারের জন্য জজের (স্যাংশান—Sanction) হুকুম লওয়া হউক, আর ভোলানাথকে ফৌজাদারি সোপরদ্দ করা হউক।

উকিল সরকার কাগজপত্র পড়িয়া দেখিলেন, ভোলানাথের বিরুদ্ধে মামলা ঠিক আছে। তিনি জজের কাছে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৯৫ ধারা অনুসারে স্যাংশানের (Sanction) দরখাস্ত করিলেন। জজ সাহেব ভোলানাথের উপর নোটিশ জারির পর, ভোলানাথের অনুপস্থিতিতে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ৪৭১ ৪৬৭ ও ১৯৬ ধারা অনুসারে জাল দলিল ব্যবহারের জন্য স্যাংশান দিলেন। সি, আই, ডি

পুলিশ গ্রহকুমার আর নরনাথের সাহায্যে প্রমাণ সংগ্রহ করিল। দলিল যে জাল তাহার বিশেষ প্রমাণও সংগৃহীত হইল।

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই, যে কারণে গ্রহকুমারের সাহায্য বন্ধ করিয়াছিলেন সেই কারণে ভোলানাথ ও ধূমাবতী নরনাথ ও তাঁহার স্ত্রীকন্যাগণের প্রতি আবার নরম ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি আর তাঁহার পাপলব্ধ টাকার বখ্‌রা ভাইকেও দিতে রাজি নন। গাছে উঠিয়া মই ফেলিয়া দিলেন। সেই কারণে যে দিবস পুলিশ গ্রহকুমারের সাহায্যে নারীসুন্দরীকে উদ্ধার করিল, সেই দিনই নারীসুন্দরী, নরনাথ, ধূমপ্রভা ও তাহার কন্যাদিগকে সঙ্গে করিয়া, আনিলেন। সেই অবধি নরনাথ ও ধূমপ্রভা নারীসুন্দরীর কাছেই রহিল।

যেদিন হইতে নারীসুন্দরী বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা ও কন্যার কাছে বন্দিনী, সেইদিন হইতে তিনি নরনাথ ও ধূমপ্রভাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিতেন। আর নরনাথ ও ধূমপ্রভা সব কথা বেশ বুঝিতে পারিলেন। বেশ ভাল করিয়া বুঝিলেন যে, এ সমস্তই ভোলানাথ ও ধূমাবতীর চাতুরী, প্রতারণা করিয়া তাঁহাদের, স্ত্রী পুরুষের, সাহায্য লইয়া নিজের কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছেন; তাঁহাদের দুজনের মুখে দধির হাত মাখাইয়া দিয়া নিজেরা সমস্ত দধিভাণ্ড উদরস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সেইদিন হইতেই তাঁহারা দুইজনে নারীসুন্দরীর উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু গ্রহকুমারের সাহায্য ব্যতিরেকে কৃতকার্য্য হন নাই। ভোলানাথ নিজকার্য্য সিদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে ভালবাসা ও যত্নের ভান দেখাইয়াছিল মাত্র; অতএব তাঁহাদের সদুপদেশ শুনিবেন কেন? সেইজন্য তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যসত্ত্বেও, বারম্বার তিনি নারীসুন্দরীকে ছাড়িয়া দিবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও ভোলানাথ তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন নাই। তাই যখন

পুলিশ অনুরোধ নারীসুন্দরীকে উদ্ধার করিল, ধূমাবতী স্পষ্ট বলিলেন, এর ভিতর নরনাথ ও ধূমপ্রভাও আছে। সেইজন্য নারীসুন্দরীর আহ্বানে তাঁহারা সে স্থান ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলেন।

দুর্বৃত্তেরা সময়ে সময়ে অল্প বাধা পাইলেই একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহারা পরকে বিপদে ফেলিতে যেমন মজবুত, তেমনি নিজে বিপদে পড়িলে একেবারেই অতিশয় ভীত, সশঙ্কিত, ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। তাহারা অতিশয় কাপুরুষ, ভীরু। সৎ কিছুই নাই, তাই তাহাদের সৎসাহসও নাই।

ভোলানাথ ও ধূমাবতীর তাহাই হইল। যতদিন তাঁহারা চালের পর চালে কিস্তি দিতেছিলেন, বাজিমাৎ করিতেছিলেন, ততদিন তাঁহারা অতিশয় সাহসী, অতিশয় বুদ্ধিমান্, অতিশয় ধীমান্; আর যেই তাঁহারা এক কিস্তি খাইয়া মাৎ হইলেন, অমনি তাঁহাদের সাহস, বুদ্ধি, বল, ভরসা বালির বাঁধের ন্যায় বর্ষার স্রোতে ভাসিয়া গেল। পড়িয়া রহিল খালি শরীরের খোলসখানা। দুষ্টেরা দুর্দ্দিনে অতিশয় কাপুরুষ।

উপর্য্যুপরি দুই তিনটি ধাক্কায় ভোলানাথের আশা, ভরসা, বলবুদ্ধি, সব কোথায় উড়িয়া গেল, রহিয়া গেল কেবল তাহার কায়া ও ভীতি। পদে পদে মতিভ্রম হইতে লাগিল।

দুর্ব্বৃত্তেরা অধিকাংশ সময়ে ভীরু ও কাপুরুষ হয়। তাহারা যেমন পুনঃপুনঃ বিজয়ী হইলে খুব সাহসী হয়, তেমনি দুই একবার পরাজিত হইলে অতিশয় ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া পড়ে। ভোলানাথের তাহাই হইল। প্রথম বিপদেই তিনি হাল ছাড়িয়া দিলেন। দুর্দ্দৈবের প্রবল ঝড়ে তরী ডুবিল। এ সময়ে ভাই তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, সেই জন্য ভোলানাথ দুঃখিত। শুধু ভাই হইলে এ সময়ে অত দুঃখ হইত না। দুঃখের প্রধান কারণ—তিনি ভায়রাভাই, তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর বিশেষ

প্রিয় জামাতা। তাহার চেয়ে তিনি বেশী দুঃখিত, গ্রহকুমার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তবে সময়ে সময়ে তিনি মনে করিতে লাগিলেন, গ্রহকুমারকে ত' আমিই বুদ্ধিবলে যোগাড় করিয়াছিলাম। এক গ্রহকুমার যায় ত' আর পাঁচটি গ্রহকুমার আসিবে। ইহা কেবল মনকে চোখ ঠারা মাত্র। মনে মনে বুঝিলেন, যেমন ভোলানাথও অনেক জন্মায় না, তেমনি গ্রহকুমারও অনেক মেলে না। যে দিন ভোলানাথ ও গ্রহকুমার দলে দলে পাওয়া যাইবে, সেই দিন এই পৃথিবীর সুখ-শান্তি শেষ হইবে; সেই দিন এই পৃথিবী শ্মশান হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্টে ভোলানাথ ধৃত হইয়া কলিকাতায় আনীত হইলেন। তিনি সকলের সহিত এরূপ প্রতারণা-পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন যে, কেহই তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হইল না। এমন কি হরেন যখন দেখিল যে ভোলানাথ জাল জুয়াচুরিতে পশ্চাৎ-পদ নন, তখন সেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। ধূমাবতী চেষ্টা করিয়াও জামিনদার যোগাড় করিতে পারিলেন না। মন্দ কর্ম্মার্জ্জিত অর্থ বেশী দিন থাকে না, মন্দ কর্ম্মে সকলের যে পরিণাম হয় ভোলানাথেরও তাহাই হইল।

তাহার পুত্র রাহুরাম এখন কলিকাতায়, কিন্তু সে নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত, পিতার খোঁজখবর লইবার তাহার সময় নাই। ধূমাবতী আদালত সংক্রান্ত তদ্বিরের একটী লোকের নিকট কাঁদিয়া কাটিয়া তাহাকে মোকর্দ্দমা তদবীর করিতে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু যে টাকা দিয়া পাঠাইয়াছিল, নিম্ন আদালতের দুই তিন দিন শুনানীর পর সে সব টাকা শেষ হইয়া গেল। যাহা কিছু টাকাকড়ি, বিষয় সম্পত্তি সে সব রাহুরামের নামে। রাহুরাম আবার একরকম নিরুদ্দেশ। অতএব আর টাকা কোথায়? আবার কলিকাতা সেসনের মামলা-লড়ার গোলযোগ অনেক। এখানে উকীল যত ভালই হউক না কেন, তিনি কলিকাতা সেসনকোর্টে

মামলা করিতে পারিবেন না। এই নিয়মের সার্থকতা কেহই বুঝিতে পারে না। এখনকার দিনে হাইকোর্টের উকিল জজ হইতে পারেন, তিনি সেসন কোর্টের জজিয়তি করিতে পারেন, কিন্তু সেই সমস্ত গুণ লইয়াও সেসন কোর্টের ওকালতী করিতে পারিবেন না। এখানকার দিনে একচেটিয়াগিরি সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বস্থানে উঠিয়া যাইতেছে। সর্ব্ব ব্যবসায়ে নাই, কেবল আছে কলিকাতা হাইকোর্টে অরিজিনাল্ সাইডে। সকল ফৌজদারি আদালতে মোক্তারদিগকে ওকালতি করিতে দেওয়া হয়—মায় ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসনজজের আদালতে। কিন্তু উকীল স্যার রাসবিহারী ঘোষ হইলেও তাঁহাকে কলিকাতা সেসনকোর্টে ওকালতি করিতে দেওয়া হইত না। এই নিয়মের সার্থকতা কোথায়, তাহা একেবারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। মনুষ্যের ব্যাধি হইলে যে কোন লোক চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী না হইলেও রোগ আরাম করিবার সুবিধা তাহাকে দেওয়া হয়; তাহাতে কোন বাধা নাই, তাহাতে কোন প্রতিবন্ধক নাই। কিন্তু খুব যোগ্যতম উকিল, তিনি হাইকোর্টে জজ হইতে পারেন, সেসনকোর্টে হাকিমি করিতে পারেন, কিন্তু সেসনকোর্টে ওকালতি করিতে পারেন না। কেহ কি ইহার সার্থকতা নির্দ্দেশ করিতে পারেন? এ একচেটিয়াগিরির মানে কি? উকীলরা একযোগে কার্য্য করিতে পারেন না বা করেন না, কৌন্সুলিরা তাহা পারেন ও করেন। আমার বিশ্বাস উকীলদিগের এই অন্তরায়টি এরূপ অন্যায় ও অসঙ্গত, যে এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে একটু বুঝাইয়া দিলে, ইহা নিশ্চয়ই অপসারিত হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বল্প অর্থ-ব্যয়ে উপযুক্ত উকীল পাইতে পার, কিন্তু এই অন্তরায় বশতঃ, তাহার দশগুণ খরচ করিয়া অনুপযুক্ত কৌন্সুলি দিতে বাধ্য হইবে। ফলে অনেক মোকর্দ্দমায় অর্থাভাবে উপযুক্ত আইনজ্ঞ ব্যক্তি নিযুক্ত হয় না এবং

কয়েদীর মোকর্দ্দমা যথাযথভাবে আদালতের কাছে বিবৃত করা ঘটে না। সেই হেতু সময়ে সময়ে বিচারবিভ্রাট ঘটে। গুছাইয়া মোকর্দ্দমাটি আদালতের কাছে পেশ করা যার তার কাজ নয়, ইহাতে বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কথায় বলে, "সহস্রমারী চিকিৎসক।" অনেক মোকর্দ্দমা করিলে তবে সে বিষয়ে পারদর্শিতা জন্মে। সে বিষয়ে বেশী দিনের উকীলদের বেশী সুবিধা আছে, অল্পদিনের কৌন্সুলিদের সে সুবিধা একেবারেই নাই।

ব্যাধির সুচিকিৎসা না হইলে প্রাণান্ত হয়, ফৌজদারি সোপরদ্দ ব্যক্তির মোকর্দ্দমা ভালরূপে আদালতের কাছে পেশ না হইলে তাহার স্বাধীনতা যায়, কখন কখন প্রাণও যায়। উৎকট ব্যাধি ও উৎকট ফৌজদারি মোকর্দ্দমা—এই দুটির মধ্যে কোনটি অধিক বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর, তাহা অনেক সময়ে ঠিক করা দায়। তাই বলিতেছিলাম, সরকার বাহাদুর অতি সত্বরই যেন এই অতীব অন্যায় বিধানের প্রত্যাহার করিয়া দিয়া সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন করেন। আর আমাদের দেশের এম, এল, এ, মহোদয়দিগকে ও বড় লাট কৌন্সিলের আইন মেম্বরকে এ বিষয়ে নজর দিতে অনুরোধ করি। এ প্রথাটি অতিশয় অন্যায়, ইহার শীঘ্রই উচ্ছেদ হওয়ার প্রয়োজন। কথায় বলে "যাক্ প্রাণ থাক্ মান।" যে দেশে এই প্রবাদ, সে দেশে উৎকট ব্যাধির চেয়ে উৎকট ফৌজদারি মামলা অধিকতর ভয়াবহ ও বিপদ্-সঙ্কুল।

যাহা হউক ভোলানাথের মামলা হাইকোর্ট সেসনে সোপর্দ্দ হইলে ধূমাবতী অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে কৌন্সুলি দিয়া আর বৃথা অর্থ ব্যয় করিবেন না। বাটী ঘর কোম্পানীর কাগজ সমস্তই রাহুরামের নামে। আর কাদম্বরী যে কাগজগুলি নরনাথের নামে করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা পিতার আজ্ঞায় নরনাথ ব্ল্যাঙ্ক্ সহি করিয়া

দিয়াছিলেন। সে কাগজগুলি পিতার লোহার সিন্দুকেই থাকিত। তবে যে দিন মোটকী ঝি নরনাথকে লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিতে দেখিয়াছিল, সেই দিনই সেই কাগজগুলি ভোলানাথের লোহার সিন্দুকে স্থানান্তরিত করা হয়। তাহাদের সুবিধা মত ভোলানাথ ও ধূমাবতী পরামর্শ করিয়া সহির উপর ফাঁকা জায়গায় রাহুরামের নাম বসাইয়া দিয়াছিল। এখন সে রাহুরাম নিরুদ্দেশ। সেই জন্য অর্থের যোগাড় একেবারেই হইল না। ভোলানাথ হাজতে, নরনাথ নারীসুন্দরীর তরফে কলিকাতায়, ধূমপ্রভা মায়ের কাছে, রাহুরাম নিরুদ্দেশ, রাধানাথ বৃদ্ধ, আত্মীয়-স্বজন ভোলানাথের ও ধূমাবতীর মন্দ ব্যবহারে বিমুখ, হরেন রাহুগ্রাসমুক্ত ; গ্রহকুমার ও তাহার সঙ্গীরা অপর পক্ষে। কাজেই বিনা অর্থে বিনা আত্মীয়ে, ভোলানাথের মোকর্দ্দমার তদ্‌বির একেবারেই হইল না। তদ্‌বির হইলেই যে সুবিধা হইত তাহা নহে, তবে তদ্‌বিরও হইল না, চেষ্টা-চরিত্রও হইল না। নারীসুন্দরী শেষটা যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার হৃত অর্থ উদ্ধারের উপায় নাই, বরং জামাতা ভোলানাথ জেলে যাইতেছে, তখন তিনি মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু এ মোকর্দ্দমার বাদী ভারত-সম্রাট্, নারীসুন্দরী কেবলমাত্র সাক্ষী বই ত' নয়। কাজেই সে চেষ্টায় কোন ফল হইল না।

সে মোকর্দ্দমায় সরকারের তরফ হইতে প্রধানতঃ সাক্ষ্য দিলেন—নারীসুন্দরী, নরনাথ, গ্রহকুমার, তাহার অপর তিনটি লোক আর হরেন ঘোষ। জজ ও জুরির বিচারে ভোলানাথ দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইল। জজ সাহেব চারি বৎসর সশ্রম কারাবাসের হুকুম দিলেন।

ভোলানাথকে ডক্ হইতে নামাইয়া লইয়া গেল, একটি লোকও তাহার বিপদে ও দুঃখে সহানুভূতি করিতে আসিল না। সে চিরজীবন

অধর্ম্মের সেবা করিয়াছে, সকল বিপদ উপেক্ষা করিয়া অধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছে। তাহার এই ঘোর বিপদেও অধর্ম্ম তাহাকে ছাড়িল না, কোন সাহায্যও করিল না। কেবল কৃত কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিবার জন্য তাহাকে ধর্ম্মাধিকরণের হাতে তুলিয়া দিল; তাহার সকল দুষ্কর্ম্মের জন্য তাহাকে ন্যায় ও ধর্ম্মের হাতে তুলিয়া দিল; কোনরূপ সাহায্য করিল না, কর্ম্মফলের কর্ম্ম ভোগ হইতে তাহাকে কণামাত্র রক্ষা করিল না। স্বকৃত কর্ম্মফল হইতে কাহারও রক্ষা নাই।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

পাপলব্ধ অর্থের পরিণাম

বিনোদিনী ওরফে রায়বাঘিনী কলিকাতার পাঁচু দত্তের গলিতে বাস করে। তাহার চারিটি কন্যা—একটি গর্ভজাতা ও আর তিনটি পালিতা। একটি তাহার গর্ভে জন্মায় আর তিনটি সে পোষে। এই চারিটি কন্যা লইয়া সে একজন ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল, চারিটি কন্যা তাহার চারিটি ব্রিগেড্। ইহাদের সাহায্যে ও নিজের কার্য্যদক্ষতায় সে সকল যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে।

সে পাঁচু দত্তের গলির একখানি ত্রিতল বাটীর 'লেসী'। বাটীখানি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। আসবাবগুলি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্, সেগুলি দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে এগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়াছে, সে আসবাব্ সম্বন্ধে একজন পাকা জহুরী। বাটীর দোতলায় ও তেতলায় সর্ব্বশুদ্ধ বারখানি ঘর। তাহার মধ্যে ছয়খানি শুইবার, চারিখানি বসিবার ঘর অর্থাৎ বৈঠকখানা, আর দুইখানি আসবাব পত্র রাখিবার ঘর। চারিটি শোবার ঘর চারিটি কন্যার, আর একখানি তাহার নিজের। আর একখানি বাড়্‌তি শয়নাগার প্রয়োজন মত ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক ঘরেই একখানি করিয়া লেজারাসের খাট। তাহাতে স্প্রীংএর গদী, তোষক ও সেলাই-বিহীন প্রমাণ চাদর, নেটের মশারি কড়িকাঠ হইতে ঝুলিতেছে। প্রত্যেক শয়নাগারে একটি করিয়া বেভেল 'মিরার'যুক্ত আলমারী। মেজেতে একটি করিয়া দুধের ফেণার ন্যায় শুভ্র নরম ঢালা বিছানা, তাহাতে চারিটি

তাকিয়া ও চারিটি ছোট গালবালিশ। কতকগুলি নানা রকমের সুন্দর পুতুল ও সুন্দর ছবি, আর তিনখানি করিয়া বড় বড় আয়না। ছবিগুলি প্রায় অধিকাংশই সুন্দরী স্ত্রীলোকের, ছবিগুলির হাবভাব মন মাতান, সবগুলিই কন্দর্পরাজের প্রজা ও আজ্ঞাবহ ভৃত্য। প্রত্যেক ঘরেই একটি করিয়া রূপার ফুলদানি, তাহাতে সদ্য প্রস্ফুটিত তাজা ফুলরাজি। ঘরগুলি এসেন্স, অটো ও লেভেণ্ডারের গন্ধে মজগুল। বসিবার ঘরগুলিতে ঢালা বিছানা, তাহাতেও অনেকগুলি করিয়া ছবি, উৎকৃষ্ট কাষ্ঠের ও পাথরের আসবাব্, বড় বড় আয়না, সবগুলিই বেভেল মিরার। ঘরগুলি পরিপাটী করিয়া সাজান।

একতলার ঘরগুলিতে ভোজপুরী ও মির্জাপুরী দ্বারবান ও পালোয়ানের বাস, আর কাহারকুর্ম্মি চাকরদের বাস। একতলার ঘরগুলিতে যে কয়জন দ্বারবান, পালোয়ান ও চাকর থাকে তাহারা সকলেই রায়বাঘিনীর লোক।

বিনোদিনী ওরফে রায়বাঘিনী এক সময়ে অপেক্ষাকৃত সুন্দরী ছিল। সে তাহার সময়ে অনেক বদ্ধিষ্ণু বংশতিলকের কাঁচা মাথা চর্ব্বণ করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। কিন্তু ভগবানের পাণ্টা সাজা-নিয়মের কি অপূর্ব্ব মহিমা! তাহার প্রপৌত্রের বয়সের একজন নীচ-বংশোদ্ভব টিন মিস্ত্রির প্রেমে পড়িয়া বিনোদিনী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। কিন্তু সে খুব হুঁসিয়ার, তাই আবার মেয়েদের সাহায্যে তাহার নষ্ট ধনের অনেকটা উদ্ধার করিয়াছে।

কন্যা চারিটি এখন গঙ্গার বন্যার ন্যায় অর্থার্জ্জন করিতেছে। তাহাদের নাম—শঙ্খিকা, শঙ্খিনী, শুষণা ও ভণ্ডহাসিনী। তাহার বাটী ও আসবাব্ পত্র দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বাটীটি ব্যবসাদারি হিসাবে সজ্জিত। মেয়েগুলি কথায় তুবড়ী, গমনে হাউই, আক্রমণে বাঘিনী, জয়ে

স্কটিশ 'ফিউজিলিয়ার'। প্রত্যেকের এক পন্থা, গমন, ভাষণ—আক্রমণ ও জয়; এ পর্য্যন্ত কখনও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

ইহাদের আক্রান্ত জীব, বিশ লক্ষ দশ লক্ষপতির মূর্খ অথবা ধর্ম্মশিক্ষা-হীন অপোগণ্ড বালকদল। পিতা নিজ কার্য্য লইয়া ব্যস্ত—প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, দেশের কাজ করিতেছেন, দশের কাজ করিতেছেন, সকলেরই কাজ করিতেছেন; কেবল নিজের সংসারের কাজ ছাড়া আব সকলেরই তত্ত্ব লয়েন; দেখেন না কেবল নিজ সন্তানদের। এইরূপ পিতাদের পুত্রেরাই বিনোদিনীর প্রধান ভোজ্য। পিতা অগাধ বিষয় রাখিয়া গিয়াছেন, পুত্র তাহা লইয়াই ও নিজের আমোদ প্রমোদ লইয়াই ব্যস্ত। পিতাব পুত্রদের লেখাপড়া সম্বন্ধে বা স্বভাবগঠন সম্বন্ধে দেখিবার সময় একেবারেই নাই বা তিনি সময় করিতে পারেন না। তাহাদের পুত্রেরাই বিনোদিনীর প্রধান ভোজ্য।

বিনোদিনীর পণ্টনের জন্য রাস্তা তৈয়ারের লোক আছে; রাস্তা সাফ করিবার লোক আছে, গোয়েন্দা আছে, বরকন্দাজ আছে, রসদ সরবরাহের লোক আছে, মহাজন আছে, জহুরী আছে। ছেলেধরার জন্য যাহা কিছু সাজসরঞ্জমের প্রয়োজন তাহার কিছুরই অভাব নাই। গোলমাল হইলে রক্ষার জন্য পুলিশ আছে, উকিল আছে, কৌন্সুলি আছে—নাই কি? সর্ব্ব বিষয়ে কার্য্যকারী দিগ্বিজয়ী সৈন্যদলের যাহা কিছু দরকার বিনোদিনীর সে সমস্তই ছিল। ফলও তদ্রূপ, প্রত্যেক যুদ্ধেই জয়,—অবলোকন, পর্য্যবেক্ষণ, পছন্দকরণ, স্পর্শন, ভক্ষণ ও লুণ্ঠন।

কত লক্ষপতি সন্তানের অল্পবয়স্ক মস্তক এই গৃহে চর্ব্বিত হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই; কত শত অল্পবয়স্ক যুবক, তাহাদের অস্থি, চর্ম্ম, মস্তক এই স্থানে স্তূপাকারে রাখিয়া গিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে—তাহার গণনা করা যায় না।

বিনোদিনীর খবর লইবার দল খুব পুষ্ট। অনেক লোক এই কার্য্যে নিযুক্ত। কোন অল্পবয়স্ক বালকের যথেষ্ট অর্থ আছে, কোন যুবার নিজ নামে পিতা বা পিতামহ বিষয় রক্ষার জন্য বেনামি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসারেরা তাহার সঠিক খবর আনিয়া দিত এবং এই খবরের উপর নির্ভর করিয়া বিনোদিনী ভক্ষ্য পছন্দ করিয়া লইত।

কাশীর একজন গোয়েন্দা রাহুরামের খবর আনিয়া দিল, রাহুরামের নামে অনেক স্থাবর বিষয় সম্পত্তি ও কোম্পানির কাগজ আছে। গোয়েন্দার খবর ঠিক কি না তাহার তদ্‌বির করা হইলে, যখন সন্ধানের পর খবর পাওয়া গেল, খবরটি ঠিক, তখন গোয়েন্দা রাহুরামের সন্ধানে গেল এবং কলিকাতার বাসা হইতে রাহুরামেকে আনিয়া বিনোদিনী-ধামে তুলিল।

রাহুরামের পিতা ম্যাচম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং লিমিটেডে প্রায় ৫০ হাজার ও উমাসুন্দরীর প্রায় লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। তাহা সমস্তই কোম্পানির কাগজে রাহুরামের নামে ছিল, আর সে সমস্তই ভোলানাথের লোহার সিন্দুকে থাকিত। তাহার পিতা যখন মেজেষ্টারি আদালতের বিচারে সোপরদ্দ ছিলেন, সেই সময়ে গ্রহকুমারের পরামর্শে রাহুরাম সেই সমস্তগুলি নিজের হস্তে লয়েন। আর কাশীর যে গোয়েন্দা বিনোদিনীকে খবর দেয় সে গ্রহকুমারের লোক।

গ্রহকুমারের সহিত বিনোদিনীর পূর্ব্ব হইতেই জানা-শুনা ছিল। এই কার্য্যে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়িয়া গেল। বন্দোবস্ত—রাহুরামকে আনিয়া বিনোদিনীর জালে ফেলিয়া দিবে, যাহা আদায় হইবে গ্রহকুমার তাহার অর্দ্ধেক বখ্‌রা পাইবে। বিশ্বাসের কাজ নয়, ধারে কারবার নয়, গ্রহকুমার হাতে হাতে তাহার বখ্‌রা লইবে; অথচ উপরন্তু তাহার

মধ্যমা কন্যা শঙ্খিনীর ঘরে বিনা-ব্যয়ে বসিতে পাইবে, আমোদ-প্রমোদ করিতে পাইবে।

যখন ভোলানাথ সেসনে সোপরদ্দ, তখন রাহুরাম বিনোদিনী-গৃহে নজর-বন্দী; প্রহরী চারি ভগিনী, তন্মধ্যে ভণ্ডহাসিনীই প্রধানা। গ্রহকুমার তখন নারীসুন্দরীর মোকর্দ্দমা তদ্‌বির করিতেছেন, আর বিনোদিনীর মামলারও তদবির করিতেছেন। বিনোদিনীর মামলার প্রধান নূতন আসামী রাহুরাম।

রাহুরাম দেখিল, এক জায়গায় সকল সুখ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বিনোদিনীও তাহার কন্যাদের আদর, অভ্যর্থনা ও যত্নে সে একেবারে বিমোহিত, সংজ্ঞা-হীন। ভণ্ড-হাসিনীর সেবাই বা কিরূপ? ভণ্ড-হাসিনী তাহাকে প্রমাণের সহিত বুঝাইয়া দিল যে, সে তাহার জন্মের দিন থেকে রাহুরামের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। এতদিনে তাহার আজন্ম তপস্যার ফল ফলিল। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া কত কত লক্ষ-পতি রাশি রাশি অর্থ আনিয়া তাহার মাতাকে দিয়াছিল, তথাপি সে ভণ্ড-হাসিনীকে বিক্রয় করে নাই তাহার অপেক্ষায় ছিল। এখন যাহার জিনিস, তাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া সে ধন্যা হইল।

ফলে দুই মাসের মধ্যে রাহুরাম মজকুর অর্দ্ধেক কোম্পানির কাগজ ভাঙ্গাইয়াছে। সে বিনোদিনীর বাটীতেই থাকে, আর কখন কখন বিনোদিনীর অন্য অন্য কন্যারি সহিত বাগানে যাইয়া জীবন সার্থক করে। তাহার মাতাপিতা অর্থের অন্বেষণে জীবনের অমূল্য সময় কাটাইয়াছেন, যেন তেন প্রকারেণ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, পুত্রের সুশিক্ষার কথা ভাবেন নাই বা ভাবিবার সময়ও পান নাই। নিজেদের কার্য্য লইয়া এত ব্যস্ত যে, সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য করিবার সময় পান নাই। ফলে তাঁহাদের সংগৃহীত অর্থ তাঁহাদের একমাত্র পুত্র রাহুরামের মারফতে পুনরায় অন্য

হস্তে চলিয়া গেল। তাঁহারা রাহুরামের ধর্ম্ম-শিক্ষায় সময় অতিবাহিত করেন নাই, রাহুরামও তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য একটি কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত উত্তোলন করিল না। এমন কি বিনোদিনীর খপ্পরে পড়িয়া মাতাপিতার কথা ভাবিবার একেবারে সময় পাইল না। যখন ভোলানাথ জেলে যাইতেছেন, তখন রাহুরাম বিনোদিনীর ব্যারাকে ভণ্ড-হাসিনীর কক্ষে হারমোনিয়াম বাজাইতেছে। এ জগতে অধর্ম্মের সংসারে এই রকমই হয়।

রাহুরাম যথা সর্ব্বস্ব লইয়া কলিকাতায় আসিল ; অর্থাভাবে ও লোকাভাবে ভোলানাথের মোকর্দ্দমার তদ্‌বির হইল না। পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে ভোলানাথ জেলে বন্দী হইলেন, আর তাঁহার পাপলব্ধ অর্থ লইয়া রাহুরাম বিনোদিনীর ব্যারাকে বন্দী হইল। ফল একই—দুজনেরই প্রায়শ্চিত্ত।

পরবর্ত্তী ছয় মাসের মধ্যে রাহুরামের প্রত্যেক কপর্দ্দক চলিয়া গেল। তাহার পিতামহ যে সম্পত্তি তাহার নামে করিয়া দিয়াছিলেন, সে সমস্ত সম্পত্তি মাথায় মাথায় দায় সংযুক্ত হইল। ভোলানাথের পাপলব্ধ অর্থ বিনোদিনীর করতলে আসিল। সব শেষ হইল ; কেবল কর্ম্ম ভোগ—পাপ কার্য্যের ফল-ভোগ আরম্ভ হইল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

পাপের পরিণাম

ভোলানাথের জেল হইয়া গিয়াছে। নরনাথ ও ধূমপ্রভা কলিকাতাতেই মাতাঠাকুরাণীর কাছে রহিয়াছেন। রাধানাথ একাকী বিন্ধ্যাচলে আছেন, সঙ্গের সাথী কেবল দাস-দাসী ও পাচক ব্রাহ্মণ। ধূমাবতী বিন্ধ্যাচলেই আছেন ; তবে তিনি বিশেষ শোকাতুরা, রাহুরামের কোন খোঁজ-খবর নাই। তিনি বড় ধড়ীবাজ স্ত্রীলোক হইলেও, একেবারে উৎসাহ-হীনা হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম একেবারেই চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার মাথা এতদিন খুব খেলিতেছিল, কিন্তু ভোলানাথের এই বিপদে তিনি একেবারে হিতাহিত জ্ঞান-হীনা। মাতা ও ভ্রাতাদের সহিত তিনি অতিশয় অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজনের সহিত অতিশয় কদর্য্য ব্যবহার করিয়াছেন, কলিকাতায় বা রামনারায়ণপুরে তাহার প্রতি সহানুভূতি করে এমন কোন লোক নাই। গ্রহকুমার ও তাহার বন্ধুরা তাহাদের বিপক্ষতাচরণ করিতেছে, হরেন তাহাদের সহিত একেবারে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছে। তিনি ভাবনায় আকুল, মস্তিক বিচলিত, ভাবিয়া ভাবিয়া প্রায়ই মাথা ধরিতেছে। কোন বিষয় সহজে সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, কোন বিষয় চিন্তা করিয়া কোন্ পথ অবলম্বন করা উচিত, তাহা ঠিক করিতে পারেন না। সদাই যেন চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন, কোনরূপ কূল-কিনারা নাই। ক্রমে ভাবনার ভার তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি আর

বহিতে পারেন না। ভাবনার বোঝা তাঁহার বহিবার শক্তির অতিরিক্ত হইয়া পড়িল। তিনি বোঝার ভারে শুইয়া পড়িলেন, তাঁহার মস্তিকের বিকৃতি-লক্ষণ দেখা দিল।

রাধানাথ দেখিয়া শুনিয়া একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। তিনি বৃদ্ধ, তাঁহাকে তাঁহার পুত্র ও পুত্র-বধূরা দেখিবেন, সেবা শুশ্রূষা করিবেন, না তাঁহাকে তাঁহাদের সংবাদ রাখিতে হইবে। ইহা তাঁহার পক্ষে এই শেষ বয়সে অতিশয় কষ্টকর। বিশেষ তাঁহার বংশের তিলক ভোলানাথের পুত্র রাহুরাম নিরুদ্দেশ। শুধু সে পৌত্র নয়, সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বেনামাদার। সে এখন সাবালক হইয়াছে, যদি সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে, তবে তাঁহার জীবনের সব আশা শুকাইয়া যাইবে।

পুত্র-বধূ ধূমাবতীর অবস্থা দেখিয়া তিনি একটু ভীত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! এ অভাগিনী পাগল হবে না কি!

শেষে ভোলানাথের জেল হইবার দুই তিন দিন পরে রাধানাথ ও ধূমাবতী তাঁহার জেলের খবর পাইলেন। খবর পাইয়া রাধানাথ একেবারে কাঠ হইয়া গেলেন। তিন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। কিছু বাক্যালাপও করেন না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রা তাহাকে পরিত্যাগ করিল, সাংসারিক কোন বিষয়ে তাঁহার আর স্পৃহা রহিল না।

ধূমাবতীর এ সংবাদ সহ্য করিবার শক্তি রহিল না। তিনি একেবারে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় একভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন 'এত শীঘ্র জেলে গেল' 'এত শীঘ্র জেলে গেল' 'দুদিন সবুর সহিল না'—'রাহুরাম' এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। রাধানাথ শয্যা লইলেন।

আদ্যনাথ 'ইংলিশ-ম্যান' খবরের কাগজে ভ্রাতার মোকর্দ্দমার সংবাদ

পাইয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতার এ বিপদের কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই। প্রায় এক মাসের উপর হইল চিঠি পাইতে দেরী হইয়াছিল। তবে ভোলানাথ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, মোকর্দ্দমার জন্য ব্যস্ত আছেন। মোকর্দ্দমা তাঁহার জীবনের নিত্য কার্য্য, সেই জন্য এ বিষয়ে আগুনাথ কোন বিশেষ অমঙ্গলের কথা ভাবেন নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জেলের খবর পাইয়া আগুনাথ প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া একদিন থাকিয়া সমস্ত খবর সংগ্রহ করিলেন এবং যখন দেখিলেন মোকর্দ্দমার আর কিছু তদ্‌বির করিবার নাই, হাইকোর্টের দায়রা বিচারের কোন আপীল নাই, তখন তিনি নরনাথ ও তাঁহার পত্নীকে ও কন্যাগণকে লইয়া বিন্ধ্যাচলে আসিলেন।

আগুনাথ বিন্ধ্যাচলে আসিবার পূর্ব্বে রাহুরামের সন্ধান লইবার জন্য অনেক চেষ্টা চরিত্র করিলেন, কিন্তু রাহুরামের কোন সন্ধানই পাইলেন না। অবশেষে রাহুরামের উদ্ধারে আপাততঃ ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া বিন্ধ্যাচলধামে আসিলেন। পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া তিনি নারীসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নারীসুন্দরী মর্ম্ম-বেদনায় একেবারে শয্যা-শায়িনী। যতক্ষণ আগুনাথ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন, দর দরিত অশ্রুতে তাঁহার গণ্ডস্থল একেবারে সিক্ত হইয়া যাইতেছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি যদি অগ্রে এরূপ দুর্দ্দৈব হইবে জানিতাম, তাহা হইলে এ বিষয়ে কোনরূপ আন্দোলন করিতাম না। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমার নষ্ট অর্থের উদ্ধার হইবে। আমি কি জানি যে আমার ভোলানাথের জেল হইবে।

আগুনাথ বিন্ধ্যাচলে ফিরিয়া গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃৎপিণ্ডের সঞ্চালন একেবারেই বন্ধ হইবার উপক্রম। পিতা শয্যাশায়ী, আহার, নিদ্রা এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছেন; আর হা হুতাশ

করিতেছেন। আর থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতেছেন, আমি কি এমন পাপ করিয়াছিলাম, যাহার জন্য এই সাজা হইল ? ভোলানাথ তোর মনে কি এই ছিল ?

ধূমাবতীর অবস্থা আরও শোচনীয়। তিনি মানবজীবনের অমূল্য নিধি জ্ঞান সংজ্ঞা হারাইয়াছেন, এখন ক্ষিপ্ত ও বায়ু-গ্রস্তা। মাঝে মাঝে আস্তে আস্তে আপন মনে বলিতেছেন,—"এত শীঘ্র জেলে গেলে, কিছু দিন দেরী করিতে পারিলে না। গেলে ত' রাহুরামকে রাখিয়া গেলে না কেন ? সে কচি ছেলে, তাহাকেও সঙ্গে নিলে।'

পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আস্তনাথ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের এখানে একলা থাকা আর যুক্তিযুক্ত নয়। এখানে তাঁহাদের কে দেখিবে ? ধূমাবতী ক্ষিপ্তা ও বায়ু-গ্রস্তা আর নরনাথ ছেলেমানুষ। অতএব আপাততঃ তাঁহাদের সকলেরই আস্তনাথের কাছে গিয়া থাকাই শ্রেয়স্কর।

পিতা, আস্তনাথের আগ্রহাতিশয্যে, ও তাহাদের সকলের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আসামে কামাখ্যা-প্রদেশে আস্তনাথের নিকটে যাইতে রাজি হইলেন। ধূমাবতীর জ্ঞান সংজ্ঞা নাই, তবে যখন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বলা হইল, তাঁহারা ভোলানাথের ও রাহুরামের সন্ধানে যাইতেছেন, তখন তিনি তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে রাজি হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সকলে মিলিয়া কামাখ্যাধামে যাত্রা করিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মের সংসার

সেখানে আত্মনাথ, তাঁহার পত্নী ও তাঁহাদের পুত্র-কন্যা সকলে মিলিয়া রাধানাথের ও ধূমাবতীর যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রাধানাথ ক্রমে তাঁহাদের সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন; বিশেষতঃ আত্মনাথের পুত্র "পরিতোষ" ও কন্যা 'শান্তার' প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। তিনি অল্পক্ষণের জন্য তাঁহাদের না দেখিলে অধীর হইতেন। ধূমাবতী প্রায়ই অধিকাংশ সময়েই বিছানায় শুইয়া থাকেন, তবে ধৃতির যত্নে ও সেবায় মাঝে মাঝে বাগানের মধ্যে রৌদ্রে আসিয়া বসিতেন। আর মুখে সেই এক বুলি "কিছু দেরী করিলে চলিত না, এত তাড়াতাড়ি কেন?"

আত্মনাথ সন্ধ্যার পর পিতার কাছে ধর্ম্ম-গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, পুনরায় নূতন করিয়া রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করেন। রাত্রে যখন ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ হইত তখন রাধানাথ, আত্মনাথ, নরনাথ, ধৃতি ধূমপ্রভা, পরিতোষ ও শান্তা সকলেই সেখানে উপস্থিত থাকিয়া পাঠ শ্রবণ করিতেন।

ধূমপ্রভা এখন ধৃতির হাতে পড়িয়া নূতন গঠনে গঠিত হইয়াছেন। তিনি এখন বিশেষ কর্ম্মিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরায়ণা। তাঁহার এখন সর্ব্বজীবে দয়া, সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার।

নরনাথও এখন আত্মনাথের ছাঁচে পড়িয়া নূতন মানুষ হইয়াছেন। তিনি এখন কর্ম্মিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ, সৎপথানুগামী, পিতার যথেষ্ট সেবা

শুশ্রূষায় রত। তবে সময় মত আশুনাথের বাগানে সুপারভাইজারের কার্য্য করেন।

রাধানাথ এখানে আসিয়া এখন নবজীবন পাইয়াছেন। তিনি প্রত্যহই উঠিয়া বাগানের গাছপালাগুলি বিশেষ করিয়া দেখেন। কোন গাছটির গোড়ার মাটি শক্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা কোদলাইয়া বা উল্টাইয়া দেন। কোন গাছের ডাল ছাঁটার প্রয়োজন, তাহা ছাঁটিয়া দেন। কোন শুকনো ডাল কাটার প্রয়োজন, সেথায় তাহা কাটিয়া দেন। কোথায় জলের প্রয়োজন, সেথায় জল দেন ও দেওয়ান। কোথায় নূতন বীজ বপনের প্রয়োজন বা নূতন গাছ রোপণের প্রয়োজন, তাহার বন্দোবস্ত করেন। যতদূর পারেন নিজের হাতে করেন; যখন না পারেন চাকরদের দ্বারা কার্য্য করান। তাহার পর স্নান আহ্নিক ও পূজা করেন। পরে আহারাদি করিয়া বাগানের একটু ফাঁকা জায়গায় রোদে বসেন। তাহার পর রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ, বৈকালে হাত-মুখ ধুইয়া কিছু জলযোগ করিয়া পরিতোষ ও শান্তাকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মপুত্রের ধারে একটু বেড়ান। সন্ধ্যার পর সকলে মিলিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ, তার পর রাত্রের আহার, তাম্রকূট ধূমপান ও শয়ন। রাধানাথের সময় একরকম সুখেই কাটিয়া যাইতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পয়সা শেষ, কর্ম্ম নিকেশ

দুই বৎসরের চেষ্টার পরও রাহুরামের কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না। যতদিন তাহার এক কপর্দ্দক ছিল ততদিন সে কলিকাতাতেই রহিল। প্রায় দেড় বৎসর কাল বিনোদিনীর ব্যারাকে জীবনে স্বর্গসুখ বা নরক-ভোগ করিল। পরে যখন সমস্ত কোম্পানির কাগজগুলি বিক্রয় হইয়া গেল, স্থাবর সম্পত্তি সকল বিক্রয় হইয়া গেল, হাতে আর অর্থ নাই, তখন ভণ্ডহাসিনী আর ভণ্ডহাসি হাসে না, তাহার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। বিনোদিনী যে প্রকৃত রায়বাঘিনী, তাহার পরিচয় ক্রমে রাহুরাম পাইতে লাগিল।

বড়দিনের কয়েক দিবস পূর্ব্বে একদিন ভণ্ডহাসিনী বলিল, "দেখ গো এবার বড়দিনে আমায় কি নূতন গহনা দিবে ?"

রাহুরাম। এবার পূজার সময় রামনারায়ণপুরের বসতবাটী বিক্রয় করিয়া সোণার নেকলেস দিয়াছি, তাহার একমাস পূর্ব্বে ইদপর্ব্বে তোমায় রতনচূড় দিয়াছি। তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে বৌদ্ধ পূর্ণিমায় তুমি বলিলে একখানি জড়োয়া অর্দ্ধচন্দ্র দিতে হইবে, তাহাও দিয়াছি। এখন আবার টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই, দুইমাস পরে মগেদের পর্ব্ব হইবে, সেই সময়ে তোমাকে একটা সোণার নিশান-টিসান যাহা হয় একটা দেওয়া যাইবে ; তবে এখন দিনকতক সবুর করতে হ'বে।

শঙ্খিনী। (সহসা উপস্থিত হইয়া) তা বাবু, ন্যায্য কথা ত ব'লতে

হবে। সোমত্ত মেয়েটা দেখ্‌তে পরীর মতন, ও যে সব ছেড়ে তোমায় নিয়ে প'ড়ে আছে, তা পূজা-পার্ব্বণে কিছু কিছু গহনাদি না দিলে চল্‌বে কেন? এই আমার বড় বোন্ শশ্বিকাকে এস্‌মাইল্ সাহেব আশ্রয় দিয়াছেন, তিনি ঈদ বখ্‌রিদ্ আদি মুসলমানদের সব পরবেই একখানি করিয়া গহনা দেন। আমাকে ডিসিল্‌ভা সাহেব অনুগ্রহ করেন, খৃষ্টানদের কোন পর্ব্বই ফাঁক যায় না, একটা না একটা গহনা দেন। মঙ্গমউ বর্ম্মিজ সাহেব শুমুনাকে দয়া করেন, তাহাদের প্রত্যেক পর্ব্বেই তাহাকে একটা না একটা নূতন গহনা দেন। আর তুমি ছোট বাবু, আমার সর্ব্বের ছোট বোনটির রক্ষক, তোমাকে ত হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বার্ম্মিজ সকল পর্ব্বেই একটী ক'রে নূতন গহনা দিতে হবে। তাহা না হইলে ছেলেমানুষের মন পড়বে কেন?

রাহুরাম। তা ত বটে। যতদিন ছিল, ততদিন দিয়েছি। এখন আর পাব কোথায়?

বিনোদিনী। (আসিয়া) তা বাপু, আমি সব কথাই শুনেছি, তোমার বাপু, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত। পুঁজি মোটে লাখখানিক টাকা, তা নিয়ে আমার বাড়ী। তোমার সাহসই ধন্নি। তা' যা হ'ক, কাপড়ের কাজে দেউলেমারা-বাপের এক মেড়ো ছোড়া ক'দিন আনাগোনা করছে। মনে ক'রেছিলাম তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, কিছুদিন তোমার আশায় থাক্‌ব, তাহাকে রাখব না। তা বাবু তোমার দেখ্‌ছি এখন ভাঁড়ে মা ভবানী। তোমায় বাপ্‌টা জেলে প'চ্‌ছে, আর তুমি আমাদের জ্বালাচ্ছ—। যাও, আজই আমাদের এখান থেকে বেরোও!

রাহুরাম। তা যাচ্ছি, তবে আমার কাপড়-চোপড়গুলো গুছাইয়া লই।

বিনোদিনী। আরে, আমার কাপড়-চোপড় গোছানর বেটা,

বেরো বেটা, এই এক কাপড়েই বেরো। বেশ্যাকে দিলে, বুঝি আবার ফেরত পায়? বেটা, কি কর্ব্ব পুলিশে ধরবে, তা নইলে তোকে ন্যাংটা ক'রে বের করে দিতুম। বেরো বেটা এক্ষুনি, জেল-খাটুনের ছেলে। তা না হ'লে ঝাঁটা মেরে বের ক'রে দেবো।

মা ও ছাঁ সকলে মিলে রাহুরামকে তেড়ে এল। তখন রাহুরাম অনন্যোপায় হইয়া এক কাপড়ে সে বাটী পরিত্যাগ করিল। সেইদিন রাত্রে বিডনষ্ট্রীটের সরকারী বাগানে রাত কাটাইয়া পরদিন রাস্তা সার করিল। শেষে না খাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আড়কাটীর লোকের সাহায্যে মরিসাসে আকের বাগানে এক চাকরী লইয়া মরিসাস যাত্রা করিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এসা দিন নেহি রহে গা

দিন থাকে না, তা সুখের দিনই হউক, আর দুঃখের দিনই হউক। দিনের পর, আবার দিন আসে, আর যায়; সুখের দিনও শেষ হয়, আর দুঃখের দিনও শেষ হয়।

'এসা দিন নেহি রহে গা'—এর চেয়ে ধ্রুব সত্যবাক্য আর হয় না। মনুষ্য, তুমি দুঃখে অধীর হইও না, এই মহাবাক্য মনে রাখিও 'এসা দিন নেহি রহে গা'। মানুষ, তুমি সুখে কর্ত্তব্য ভুলিও না, ভগবানকে ভুলিও না, কারণ—এসা দিন নেহি রহে গা।

দুঃখে কষ্টে ভোলানাথের সুদীর্ঘ চারি বৎসর কারাবাস কাটিয়া গেল। কিন্তু চারি বৎসর জেলে থাকিয়া সে ২৪ বৎসরের বয়োধিক হইয়া পড়িয়াছিল।

আদ্যনাথ ২।৩ মাস ব্যবধানে তাহাকে একখানি করিয়া চিঠি লিখিতেন এবং বাটীর সকল সংবাদই জানাইতেন। প্রায় দুই বৎসর পরে ধূমাবতীর ক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে ভোলানাথকে জানাইয়াছিলেন। ভোলানাথ শুনিয়া খানিকটা গুম খাইয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, আমি আমার অবরোধ সহ্য করিতে পারিলাম, তুমি তাহা পারিলে না; এইজন্যই শাস্ত্রে বলে, স্ত্রীলোক অবলা, একটু ধাক্কাতেই ভেঙ্গে পড়ে। রাহুরামের কথা জেলের ভিতর তিনি কিছুই জানিতেন না। কেবল শুনিয়াছিলেন, রাহুরাম বিদেশে চাকরী করিতে গিয়াছে আর প্রাণে বেঁচে আছে।

যেদিন ভোলানাথ জেল হইতে অব্যাহতি পাইবেন, সেইদিন আত্মনাথ তাঁহার আবাস ছাড়িয়া প্রেসিডেন্সি জেলের দরজায় আসিয়া উপস্থিত। ভোলানাথ বাহিরে আসিলে তাঁহাকে লইয়া একেবারে কামরূপে আসিয়া উপস্থিত। প্রথমে ভোলানাথ মনে করিয়াছিলেন, আত্মনাথের প্রতি তিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে আত্মনাথ তাঁহার প্রতি কখনই ভাল ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু আত্মনাথের ও ধৃতির ব্যবহারে তিনি একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। তিনি জানিতেন, মানুষ শয়তানই হয় বা শয়তান অপেক্ষাও যদি কেহ হিংস্র থাকে তাহা। কিন্তু কয়েক-দিন আত্মনাথের বাগানে বাস করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, মানুষ দেবদেবীও হয়, সময়ে সময়ে দেবতার চেয়েও দয়ালু হয়। মানুষ যে হিংস্রক না হইতে পারে, তাহা তিনি পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

তিনি পূর্ব্বে ভাবিতেন হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা মানুষের ধর্ম্ম ; এখন বুঝিলেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল। অহিংসা, স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, করুণা ও পরসুখে সুখী হওয়া মানুষের ধর্ম্ম ও মনুষ্য জীবনে সুখ। তিনি তাঁহার নিজের জীবন ও আত্মনাথের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিলেন, ধর্ম্মতেই মানুষের সুখ, ধর্ম্ম-জীবনই মানুষের সুখময় জীবন। অধর্ম্মে মানুষের সুখ হয় না, পাপে মানুষের শান্তি হইতে পারে না। তিনি বুঝিলেন, অর্থে মানুষের সুখ হয় না—অনেক সময় অর্থই যত অনর্থের মূল ; পাপে ত সুখের সম্ভাবনা একেবারেই নাই।

তিনি দেখিলেন ও বুঝিলেন, মানুষে চেষ্টা করিয়া অপরের মন্দ করিতে পারে না, পরের মন্দ চেষ্টা করিয়া কেহ পরের মন্দ করিতে পারে না, বরং পরের মন্দ চেষ্টায় নিজের অশুভ হয়। হিংসা ও দ্বেষ মানুষের পরম শত্রু ; হিংসা ও দ্বেষ করিয়া, মানুষ যাহার হিংসা করে বা যাহার দ্বেষ করে, তাহার অশুভ করিতে পারে না, বরং হিংসা ও দ্বেষের দ্বারা

নিজেরই ক্ষয় সাধন ও ধ্বংস আনয়ন করে। হিংসা ক্ষয়কারক দ্রাবকের ন্যায় কার্য্য করে; ইহাকে যে পোষণ করে, এ তাহাকেই ক্ষয় করে; আর যাহার প্রতি লোকে হিংসা করে তাহাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না। তিনি বুঝিলেন, ধর্ম্মই সুখ আর অধর্ম্মেই ধ্বংস। তাই একদিন বাগানে বসিয়া গুণ্ গুণ স্বরে গাহিতে লাগিলেন,

একতালা—ভীমপলশ্রী

(১)

বঁধু, কিছুতেই কিছু হয় না

অনেক করিনু, অনেক খেলিনু,

পাপকাজে কত অর্থ আহরিনু,

ফল কিবা তায়, এলাম কোথায়!

কিছুতেই কিছু হয় না।

(২)

অধরম পথে সুখ কিছু নাই,

অধরম পথে কেবলি বালাই,

এত তো করিনু, কি ফল লভিনু?

সুখ-স্বাদ পাপে মেলে না।

(৩)

জাল-জুয়াচুরি, ঠক-দাগাবাজি,—

অধর্ম্মের বোঝা; কলঙ্কের সাজি,

পাপে সুখ নাই অশান্তি সদাই,

পাপে সুখ কভু মেলে না।

(৪)

কাট গর্ত্ত তুমি অপরের তরে,
পড় তুমি নিজে তাহারি ভিতরে ;
ক'রে পর মন্দ, না পাবে আনন্দ,
পাপ পথে সুখ পাবে না।

(৫)

কর দাগাবাজি সুখ আশা করি,
উপরের জন তুলাদণ্ড ধরি
সাজা দিবে তোরে, আপনি বিচারি।
পাপে সুখ কভু হয় না।

(৬)

কিবা পাপ আছে যা' না করিয়াছি,
পাপ অর্থ তরে আত্ম সঁপিয়াছি,
আপনার জন সব ত্যজিয়াছি,
সুখ তবু কিছু হ'ল না।

(৭)

যাদের লাগিয়া পাপেতে মজিনু,
যাদের লাগিয়া অধর্ম্ম করিনু,
ঘোর পাপ পঙ্কে আকণ্ঠ ডুবিনু,
আমা পানে তারা চাহে না।

(৮)

পাপেতে অর্জ্জন সুখের কারণ,
সুখ বিনিময়ে দুঃখ অন্বেষণ,
বিভুর চরণ করহ স্মরণ,
অর্থে পরমার্থ মেলে না।

(৯)

পরমেশ পাশে ধরমের গতি,
ধর্ম্ম-পথে তব হইবে সদ্গতি,
চিতে সুখ পাবে সন্তোষ বাড়িবে,
ধর্ম্ম বিনা সুখ হয় না।

(১০)

ছাড় দাগাবাজি, প্রভু রাজি হবে
তাঁর কৃপা হ'লে সুখশান্তি পাবে
দ্বেষ, হিংসা, রোষ সদা(ই) আপশোষ
মনাগুণে মিছে দহ'না।

(১১)

ধর্ম্ম-পথে চল, সদা সত্য বল,
বিভুপদ সদা করহ সম্বল,
তাঁর দয়া হ'লে লভিবে সুফল,
প্রভু তোমা ছেড়ে রবে না।

(১২)

সকলি অসার, প্রভুপদ সার,
ধর্ম্ম-পথে পাবে সন্তোষ অপার,
ধর্ম্ম-পথ ছাড়া সুখের ফোয়ারা
মেলে না মেলে না মেলে না।

প্রত্যহ সন্ধ্যার পর যখন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হয়, তখন ভোলানাথ বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করেন এবং বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন। নিজের জীবনপ্রবাহ ও আশুনাথের জীবনপ্রবাহ দেখিয়া প্রায়ই ভাবিতেন, জীবনে তিনি একটা মস্ত ভুল করিয়াছেন। সেই একটি ভুলের জন্য তাঁহার জীবন এত বিষময় হইয়াছে। তিনি ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্মের আশ্রয় করিয়াছিলেন—এই একটি মস্ত ভুল করিয়া জীবনটী তিনি এত দুঃখময় করিয়াছেন। ভোলানাথ বুঝিলেন, তাঁহার জীবনের প্রধান ভুল—ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্মের পূজা, পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপের আশ্রয় গ্রহণ। তিনি বুঝিলেন, এইটাই তাঁর প্রধান ভুল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, যদি এ জীবন নদীর পারে আসিয়া না পৌঁছিতেন, তবে একবার ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া জীবনের সুখ-শান্তি ভোগ করিতেন। কিন্তু এখন আর তাহার উপায় নাই, এখন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে, তিনি প্রায় জীবনের পরপারে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ইচ্ছা থাকিলেও ভুল সংশোধনের সময় ও ক্ষমতা তাহার আর নাই। এ জন্মে তাহা আর হইল না, হইবার নয়। ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহার মনে বল দিন, তিনি যেন পরজন্মে নূতন জীবনে পুনর্ব্বার সেই মহাভুল না করেন। এক ভুলে তাঁহার জীবন শ্মশানময় হইয়াছে; ভগবান্ তাঁহাকে দয়া করুন, তিনি জন্ম জন্মান্তরেও যেন ফের্ এই ভুল না করেন।

ভোলানাথ ঠেকিয়া শিখিয়াছেন,—নিজে সুখী হইতে হইলে, প্রথমে জগতের সমস্ত জীবকে সুখী করিতে হইবে। সকলকে কাঁদাইয়া নিজে কেহ সুখী হইতে পারে না। পৃথিবীতে অপরকে সুখী করিতে পারিলে তবে সেই সুখ নিজ জীবনে প্রতিফলিত হয়। সেইজন্য তিনি ভগবানের কাছে আন্তরিক প্রার্থনা করিলেন—ভগবন্, আপনার কোন সৃষ্ট জীবই যেন আমার মত ভুল না করেন, জীবনে নরকের জ্বালা না ভোগ করেন। অধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন ও ধর্ম্মপথই অবলম্বন করেন, ধর্ম্মপথে থাকিয়া নিজেও সুখী হন এবং অপরকেও সুখী করেন। ভগবন্, আমার মত "পন্থার ভুল" যেন কেহ জীবনে কখনও না করেন।

উপসংহার

তাই বলি পাঠক-পাঠিকাগণ, যদি প্রকৃত সুখী হইতে চান্, ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করুন, সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করুন, ভগবানের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার আশ্রয় গ্রহণ করুন। ধর্ম্মের আশ্রয় বিনা, সত্যের আশ্রয় বিনা, ভগবানের আশ্রয় বিনা কখন সুখ মিলে না। পরকে দুঃখ দিয়া, পরকে কষ্ট দিয়া, পরকে প্রতারণা করিয়া কেহ কখনও সুখী হয় নাই, হইবে না, হইতেও পারে না। আপনার দুষ্কর্ম্ম হেতু অপরে কাঁদিবে, আর আপনি সুখের হাসি হাসিবেন, তাহা কখনও হইতে পারে না। আপনি পিশাচের হাসি হাসিতে পারেন, কিন্তু সে হাসি দেবতার হাসি নয়, মানুষের হাসি নয়; সে হাসি আপনার হৃদয়ের শান্তির পরিচায়ক নয়। আপনার হৃদয় যে পাপের পেষণে নিষ্পেষিত হইতেছে, সে হাসি তাহারই পরিচায়ক।

সর্ব্বকার্য্যে ও সকল সময়ে মনে রাখিবেন, 'উপরে ভগবান্ আছেন। তিনি সর্ব্বঅন্তর্য্যামী ও সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার নিয়ম ধর্ম্মের উপর স্থাপিত, সত্যের উপর স্থাপিত। তাঁহার অগাধ প্রেম। তিনি সেই প্রেমে সকলকে দয়া করেন। মানুষ একবার দুইবার, দশবার, সহস্রবার, লক্ষবার দোষ করিলেও তাহাকে ক্ষমা করেন; কিন্তু সর্ব্বশেষে পাপীকে তাহার কৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য সাজা দেন। তিনি সুবিচারক; মানুষের সৃষ্ট বিচারককে অসত্যের সাহায্যে ঠকাইতে পার, কিন্তু ভগবানকে নয়। সাহসে কুলায়, ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার কর, ভগবানকে দূরে ফেলিয়া দাও; কিন্তু সেই দুষ্কৃতির ফল ভোগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, ভগবানকে উড়াইয়া

দিয়া সুখে থাকিতে পারিবে না। ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ভগবানের ধর্ম্মনিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ভগবান সচ্চিদানন্দ মহাপুরুষ। তিনি পাপকে ঘৃণা করেন। অতএব পাপ করিয়া তুমি তাঁহাকে পাইবে না। আর তাঁহার কৃপাকণা বিনা সুখী হইতে পারিবে না। সকল মনুষ্যই তাঁহার সন্তান বিশেষ। একজনকে প্রতারণা করিয়া, অপরকে দুঃখ দিয়া তুমি তাঁহার কৃপাকণা লাভ করিবে, সে অভিলাষ বিড়ম্বনা মাত্র। তাহা হইবে না, তাহা হইবার নয়।

নিজের সুখের মূল ভিত্তি, জগতের অপর সকলেরই সুখের উপর স্থাপিত। অপরকে দুঃখী করিয়া, অপরকে নষ্ট করিয়া, অপরকে কষ্ট দিয়া, অপরকে দুঃখ দিয়া, কেহ কখনও নিজে সুখী হইতে পারে না। তুমি নিজে মর্ম্মর-নির্ম্মিত ত্রিতল বা চৌতল হর্ম্ম্যে বাস করিতে পার; কিন্তু তোমার নিকটস্থ আবাস-স্থানগুলি যদি পূঁতিগন্ধময় হয় এবং নীচ প্রকৃতি লোকের বাসভূমি হয়, তুমি তোমার ত্রিতল বা চৌতল বাসস্থানে সুখে বাস করিতে পারিবে না, নিকটস্থ পূঁতিগন্ধে তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে। তুমি নিজে সুখী হইতে চাহিলে নিকটস্থ লোকদিগকে তুলিতে হইবে, তাহাদিগকে সুশিক্ষার দ্বারা ও তোমার সাহায্য দ্বারা সুখী করিতে হইবে। সকলকে সুখী করিতে পারিলে, তবে নিজে সুখী হইতে পারিবে; তবে তাহাদের প্রত্যেকের সুখ তোমার উপর প্রতিফলিত হইবে।

প্রত্যেক মনুষ্য ভগবানের অংশ; প্রত্যেকের প্রতি ভ্রাতৃভাব, ভগবানের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার পরিচায়ক। প্রত্যেক নর, নারায়ণের অংশ; সেই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে নর-নারায়ণের সেবার স্থান এত উচ্চ। নরের সেবা করিলে নারায়ণের সেবা করা হয়। তাই, যখন তুমি নর-নারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবে, তখনই তুমি সুখী হইবে,

তাহার পূর্ব্বে নয়। তাহার জন্য তোমায় বনে যাইতে হইবে না,—এই সংসারে থাকিয়াই পূর্ণমাত্রায় তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পারিবে। এই কারণে অতিথিসৎকারের এত মহত্ত্ব। অতিথিসৎকার করিয়া তুমি নর-নারায়ণের সেবা করিতেছ, তোমার নিজেরও সেবা করিতেছ। সেই কারণে এখনও হিন্দুগৃহে গৃহ-স্বামিনী সকলকে খাওয়াইয়া তবে নিজে খান্; কারণ তাঁহার কাছে প্রত্যেক মনুষ্যই নারায়ণের অংশ।

তাই বলিতেছিলাম, অধর্ম্ম আশ্রয় করিও না, ঠক দাগাবাজির আশ্রয় করিও না, আর "যেন তেন প্রকারেণ" অর্থ সংগ্রহ করিও না। তাহাতে আশু সুবিধা হইতে পারে, সুখ হইবে না, হইবার নয়। ধর্ম্ম আশ্রয় কর, সুখ পাইবে, শান্তি পাইবে, মনে তৃপ্তি পাইবে; অধিক পরিমাণে অর্থ না পাইতে পার, তাহাতে দুঃখ নাই। মনে রেখ, অধর্ম্মের আশ্রয় কেবল কষ্টদায়ক, আর ধর্ম্মের আশ্রয় নিরবচ্ছিন্ন সুখদায়ক। ধর্ম্মহীন শিক্ষা ভুল পন্থা, ধর্ম্মশিক্ষা প্রকৃত সুখদায়ক পন্থা। পাঠক জীবনে পন্থা নির্ব্বাচনে মহাভুল করিও না।

মানুষ, তুমি ভগবানের অংশ, ভগবানের সৃষ্ট। তাঁহারই কাছ হইতে আসিয়াছ, আবার কার্য্য শেষে তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইবে। ফিরিবার সময় যখন নিকটে আসে তখনই তোমার মনে সন্দেহ হয়, তুমি প্রস্তুত কি না? অনেক স্থলেই তুমি দেখ, তুমি প্রস্তুত নও,—তুমি জীবনে অনেক ভুল করিয়াছ, ভগবানের কাছ হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছ। সময়ে প্রস্তুত হইয়া সাজিয়া গুজিয়া ফিরিবার ব্যাঘাত অনেক; তখন তুমি হাকু পাকু কর; তখন তুমি বুঝিতে পার, তোমার জীবনের অমূল্য অল্প সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছ, ভ্রমক্রমে ভগবানের কাছ হইতে দূর পথে চলিয়া গিয়াছ, সময়ের মধ্যে কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিবার উপায় নাই। তখন তোমার মনে হয়—ভগবান্ আর একটু সময় দিন, আমি প্রস্তুত

হই ; আমি ভুল পথ পরিত্যাগ করিয়া ঠিকপথে চলিব। কিন্তু যখন তোমার সময় শেষ, তখন তুমি আর সময় পাও না, পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলেও সময় বাড়াইয়া পাও না, তখন হঠাৎ তোমার জীবন শেষ হয়। যখন তোমার হিসাব নিকাশ হয়, তখন তুমি দুঃখের সহিত দেখিতে পাও, তোমার হিসাবে অনেকগুলি ভুলের জমা রহিয়াছে। শেষ মুহূর্ত্তে বিশেষ ব্যাকুলতা সত্ত্বেও ভুলের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না, জীবনের গতি ফিরাইতে পার না।

এই ঘটনা প্রত্যহই হইতেছে। পৃথিবীর আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত কোটি কোটি লোকে এই ভুল করিতেছে, ভুগিতেছে, মরিতেছে ; তথাপি মানুষের চৈতন্য নাই। ইহার কারণ কি? কারণ—ধর্ম্মশিক্ষার অভাব।

যখন ভারতবর্ষে ধর্ম্মশিক্ষার জোয়ার বহিয়াছিল, যখন ভারতের মনীষীরা জ্ঞানযোগে ধর্ম্মজীবনই প্রশস্ত জীবন বুঝিয়াছিলেন ও বুঝাইয়াছিলেন, তখন ভারতে লোকের দুঃখ-কষ্ট কম ছিল, লক্ষপতি না হইয়াও মানুষ সুখী হইতে পারিত। তখন মানুষ মানুষকে নিম্নস্তরের হিংস্র জন্তুর ন্যায় খাইয়া সুখী হইতে চেষ্টা করিত না ; মানুষ মানুষকে ভগবানের অংশ মনে করিয়া তাহার সেবা করিয়া সুখী হইত।

এখন সে ধর্ম্মশিক্ষা নাই ; সম্মুখে এখন সে উচ্চ আদর্শ নাই। তাই মানুষ প্রত্যহ পথভুল করিতেছে, ঠকিতেছে ও শিখিতেছে এবং প্রত্যেকে জীবনের শেষ অবস্থায় ভুল বুঝিতেছে।

প্রত্যেক মানুষ তাহার পূর্ব্বগত মনীষীদের উত্তরাধিকার-সূত্রের ওয়ারিসেন্। প্রত্যেক মনীষী যাহা করিয়া গিয়াছেন, যাহা ঠেকিয়া শিখাইয়া গিয়াছেন, তুমি সেই সমস্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের অধিকারী। তুমি তোমার সেই পূর্ব্বসম্পত্তি হইতে নিজেকে কেন বঞ্চিত করিবে? নিজে পূর্ব্বপুরাবৃত্ত পাঠে না শিখিয়া, কেন ঠেকিয়া শিখিবে, আর হায় হায় করিবে? লক্ষ

লক্ষ কোটি কোটি লোক তোমার পূর্ব্বে ঠেকিয়া যাহা শিখিয়া গিয়াছেন, তুমি তাহাদের সেই শিক্ষা নিজের ব্যবহারে আন, আর প্রাণ ভরিয়া গাও—

"ধর্ম্ম পথ ছাড়া সুখের ফোয়ারা (কভু) মেলে না, মেলে না, মেলে না।"

যদি জীবনে ভুল করিতে না চাও, ভগবানের অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বদা মনে রাখিবে। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, সুবিচারক ও করুণাময়। তুমি যাহাই কর না কেন, তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিবে না ; তোমার প্রত্যেক কার্য্য,—ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, প্রকাশ্য বা গুপ্ত—তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িতেছে। তাঁহার নিকট হইতে গোপন রাখিয়া কোন কার্য্য হইতে পারে না। তোমার প্রত্যেক কার্য্যটী তোমার হিসাবে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

এই বিশ্বাস করিয়া জীবনে কার্য্য করিবে, তবে জীবনে সুখী হইবে, তবে জীবনে শান্তি পাইবে। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।

সম্পূর্ণ

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পাবলিক প্রসিকিউটার প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব

রায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধু বাহাদুর প্রণীত

মেনকারাণী

গার্হস্থ্য উপন্যাস

যন্ত্রস্থ

সচরাচর লোকে বলেন—স্ত্রীলোক অবলা, কিন্তু গ্রন্থকার এই গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, রমণীগণ ইচ্ছা করিলে আপন আপন স্বামীকে দেবতাও গঠিতে পারেন, আবার দানবও করিতে পারেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা